সাহিত্যে প্রগতি

ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত

পুরবী পাবলিশার্স
৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

প্রকাশক—গিরীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৪৫

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

গুপ্তপ্রেশ
প্রিণ্টার—কিশোরীমোহন নন্দী
৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা

মুখবন্ধ

পাশ্চাত্য সমালোচকেরা বলেন, ভারতীয়দের ইতিহাস লিখিবার বোধ নাই। এই কথা যে অন্ততঃ এই যুগে সত্য নয় তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই এই কয় ছত্র কথা এই স্থলে সন্নিবেশিত হইল।

খৃঃ ১৯৩২-৩৩ সালে এক স্থলে লেখকের 'জন ও গণ-সাহিত্য কি', 'প্রগতি সাহিত্যের প্রয়োজন' ইত্যাদি আলোচনাকালে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ৺প্রফুল্ল কুমার সরকার এই বিষয়ে সায় দিয়া বলেন, "আপনি লিখিতে থাকুন, আমরাও পশ্চাতে আছি"। এই কথানুসারে 'জনসাহিত্য কি' শীর্ষক লেখকের একটি প্রবন্ধ তাঁহার কাছে প্রেরিত হয়। এই প্রবন্ধটি "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তৎপর, উক্ত প্রকারের লেখকের আরও প্রবন্ধ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার পর অনুমান ১৯৩৪ খৃঃ মৈমনসিংহ নিবাসী লেখকের সহকর্ম্মী ফৈজি-উল্লা সাহেব তাঁহাকে "মৈমনসিংহ জন-সাহিত্য সম্মেলনে" যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। লেখক তথায় তাঁহার তরুণ সহকর্ম্মী শ্রীস্মৃতিশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সহিত গমন করিয়া সম্মেলনে যোগদান করেন। তথায়, তৎস্থানের সম্মেলনের কর্ম্মকর্ত্তাদের কাছ হইতে শ্রুত হওয়া গেল, "গণ-সাহিত্য সম্মেলন" এই নাম দিয়া সম্মেলন আহ্বান করিতে তাঁহাদের ভয় হয়, কারণ তাহা কমুনিস্ট ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হইবে (মীরাট কমুনিস্ট মোকদ্দমা তখন চলিতেছিল), এই জন্যই "জন-সাহিত্য" সম্মেলন নামে সভা আহূত হয়। ব্যাপারটাই আমাদের বোধগম্য হইল না, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক যিনি এই সম্মেলনের নেতৃত্ব করেন তিনি সভার মধ্যস্থলে সাহিত্যের কথার পরিবর্ত্তে 'যৌবন অবতার' হিটলার কি করিতেছে এবং বাঙ্গলার জমিদারেরা দেশের কত উপকার করিয়াছে এই বিষয়েই অভিভাষণের অর্দ্ধেক সময় গ্রহন করেন।

এই সঙ্গে কারারুদ্ধ কংগ্রেস ও কৃষক কর্ম্মীদের উপর কটাক্ষপাত করেন। এতদ্বারা সম্মেলনের উদ্দেশ্য বুঝা আরও জটীল হইয়া উঠে। অনেকে ইহার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হয়। পরের দিন, প্রজা পার্টি দ্বারা নানা রকম বাদানুবাদ উত্থিত হয়। এতদ্বারা সম্মেলনের উদ্দেশ্য কিছুই বোধগম্য হইল না।

পরের দিন কার্য্যকারী সভায় সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য কি এই প্রশ্ন লেখক উত্থাপিত করিলে, উদ্যোক্তা ফৈজিউল্লা সাহেব বলিলেন, তাঁহার ইচ্ছা জনসাধারণ যে ভাষা বুঝিতে পারে সেই প্রকার ভাষায় সাহিত্য লিখিত হউক। অবশেষে সভাপতি এই নির্দ্ধারিত করিলেন : বিভিন্ন জেলায় একই দ্রব্যের বিভিন্ন নাম সংগৃহীত করিয়া তাহাই সাহিত্য মধ্যে প্রবেশ করান হউক যথা : পশ্চিম বঙ্গে বলে 'বোলতা' আর মৈমনসিংহে বলে 'বল্লা'। সাহিত্যে উভয়েরই ব্যবহার প্রচলিত হইতে থাকুক।

এই সম্মেলনের কার্য্যকারী সভার অধিবেশন একবার কলিকাতায় হইয়াছিল। ৺গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এই সভার সভ্য ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'রাঁইবেঁসে নৃত্য' সম্বন্ধের অনুসন্ধানও এই সভার তথ্য হউক। কিন্তু এই সভার আর অধিবেশন হয় নাই!

এই সব ব্যাপারে লেখক ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা কর্ম্মের ধারার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া এই বিষয়ে আর কোন উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু সংবাদ-পত্রে দৃষ্ট হয় যে, মৈমনসিংহে "জেলা জন-সাহিত্য সম্মেলনের" দ্বিতীয় অধিবেশনও হয়। "জন-সাহিত্য" আন্দোলনের এই পরিণতি দেখিয়া লেখক ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা মনস্থ করিয়াছিলেন পৃথক করিয়া 'প্রগতি সাহিত্য' সম্বন্ধে একটী আন্দোলন সৃষ্টি করিবেন। কিন্তু তৎকালের রাজনীতিক বাতাবরণে কোন সভা আহুত করা অসম্ভব হয় এবং কর্ম্মীরা বেশীর ভাগ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। তৎপর খৃঃ ১৯৩৭ সালে "নিখিল ভারতীয় প্রগতি সাহিত্যিক সঙ্ঘ" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৺ধনপত রায় (প্রেমচাঁদ) তাহার সভাপতি হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বাঙ্গলায় তাহার প্রাদেশিক শাখা সংস্থাপনের জন্য নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হন। তিনি কলিকাতায়

একটী কেন্দ্রীয় দপ্তর স্থাপন করেন এবং লেখক ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের সভ্যপদে বরণ করিয়া নেন। এই প্রচেষ্টা স্থায়ী করিবার জন্য অধ্যাপক গোস্বামী যথেষ্ট পরিশ্রম করেন, তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া লেখকের সহকর্ম্মীরা বিভিন্ন জেলায় জেলায় ইহার প্রশাখা স্থাপন করেন। এই সঙ্গে এই সঙ্ঘ হইতে "প্রগতি" নামে ইংরেজী ও বাঙ্গলায় একটী পুস্তকও প্রকাশিত হয়। লেখকের বাঙ্গলায় একটী প্রবন্ধ তাহাতে সন্নিবেশিত হয়। শেষে খৃঃ ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় প্রগতি লেখক সাহিত্য সঙ্ঘের একটী সম্মেলন হয় এবং বিখ্যাত প্রগতিশীল লেখক শ্রীযুক্ত মুলুকরাজ আনন্দ তাহার সভাপতিত্ব করেন। এই উপলক্ষে সাহিত্যের বনিয়াদী স্বার্থের একদল লোক ইহাকে মতলববাজদের কার্য্য বলিয়া কটাক্ষপাত করেন। পুনঃ, পুলিশের কড়া নজরও এই আন্দোলনের প্রতি পড়ে এবং কোন কোন কর্ম্মী কারারুদ্ধ হন। ইত্যবসরে নিখিল ভারতীয় সঙ্ঘের দুইবার অধিবেশন হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় আর অধিবেশন হয় নাই। কর্ম্মীদের কারাবরণ ও উৎসাহের অভাবে ইহার কর্ম্ম অচল হয় এবং সঙ্ঘের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। পরে বর্ত্তমান্ যুদ্ধের প্রাক্কালে এই প্রচেষ্টা এক প্রকারে "ফাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ" নামে সাময়িকভাবে পুনর্জীবিত হয়। অবশেষে এই বৎসর এই সঙ্ঘের "প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ" নামকরণ হয়। এই সব সময়ের প্রগতি সাহিত্য সম্বন্ধে লেখকের যে সব প্রবন্ধ নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এবং এই সঙ্গে কতিপয় সম্পূর্ণ নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত করিয়া এই পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। এই পুস্তক প্রকাশের জন্য গ্রন্থকার শ্রীগিরিন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। ইতি—গ্রন্থকার।

৩নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ১৪।৭।৪৫

উৎসর্গ-পত্র

বাঙ্গলায় সর্ব্বপ্রথমে "প্রগতি সাহিত্য-সঙ্ঘ" স্থাপনে অগ্রণী
এবং 'প্রগতি সাহিত্যের মর্ম্মপ্রচারে তৎপর,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব
অধ্যাপক সহযোগী স্বর্গীয় **সুরেন্দ্রনাথ**
গোস্বামীর স্মৃতি-তর্পণে ইহা উৎসর্গ
করা হইল।

গ্রন্থকার

প্রগতি সাহিত্যের সংজ্ঞা

সাহিত্যে প্রগতির ধারার সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহার অনুসন্ধানও চলিতেছে। ফলতঃ দেশের সর্ব্বত্র এক তরুণ দলের অভ্যুদয় হইয়াছে যাঁহারা সাহিত্যে প্রগতির অনুসন্ধানকারী। অন্য পক্ষে একদল পুরাতন সাহিত্যরথীও রহিয়াছেন যাঁহারা এই প্রগতির অনুসন্ধান-কারীদিগকে 'মতলববাজ দল' বলিয়া নিন্দা করেন। সাহিত্যের এই সনাতনীদের বক্তব্য যে, সাহিত্য হইতেছে শাশ্বত ও সনাতন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রূপ' ও 'রস' নামক যে দুইটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাও ইঁহাদের তূণীরে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এই জন্যই ইঁহারা বলেন রূপ, রস নিয়াই সাহিত্য, তাহাতে প্রগতি বা অ-প্রগতি আবার কি?

সনাতনী সাহিত্যিক সমালোচকেরা কিন্তু সাহিত্যকে Realism, Neo-realism, Idealism, Neo-idealism, Romanticism, Expressionism, Impressionism, Decadent period প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করেন। হালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রুষ সমাজতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সরোকিন সাহিত্য তথা মানব সংস্কৃতিকে Ideational, Sensate এবং উভয়ের মিশ্রিত Idealistic or Mixed এইভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদেরা মানবের সভ্যতার ইতিহাসকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা, বর্ব্বর যুগের শেষকালীন ও সভ্যতার উন্মেষের প্রথমাবস্থার—Heroic Age; সভ্যতার বিকাশের পরে সামাজিক যুগকে Classical Age বলা হয়; যে-সব দেশে রাষ্ট্রমধ্যে সামন্ততন্ত্রীয় প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকে Feudal Age বলা হয়। আবার যে-সব দেশে এই যুগের

অবসান হইয়া বুর্জ্জোয়া-ন্যাশনাল ষ্টেট্ বিবর্ত্তিত হইয়াছে তথায় বুর্জ্জোয়া যুগের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হয়। পুনরায় যে-রাষ্ট্রে শ্রমজীবীরা শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই দেশে প্রোলেটারীয় যুগ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হয়। রাষ্ট্রের এই বিবর্ত্তন সমাজে ও সেই লোক-সমষ্টির সংস্কৃতিতে বিশিষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। রাষ্ট্রের যে-যুগের যে-সব লক্ষণ আছে তাহার চিহ্ন সাহিত্যে পাওয়া যায়। কাজেই সাহিত্যকে যদি এই প্রকারের সমাজতাত্ত্বিক বিভাগের দ্বারা চিহ্নিত করা যায়, তাহা হইলে কোন অপরাধ হয় না। সমাজের প্রত্যেক যুগের অবস্থা তৎকালীন সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয় এবং সমাজের তৎকালীন কর্ণধারদের মনস্তত্ত্বও তাহাতে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যের লেখক তাঁহার আবেষ্টনীর বাহিরে গিয়া কিছু লেখেন না। তাঁহার লেখার মধ্যে তাঁহার শ্রেণীগত শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শ প্রতিফলিত হয়। ফলতঃ একটী যুগের সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যে তৎকালীন ক্ষমতাশালী শ্রেণী বা শাসকবর্গের মনস্তত্ত্ব ধরা পড়ে এবং প্রত্যেক শাসকবর্গের নিজেদের একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পন্থার নির্দ্দেশের সংবাদ সমকালীন সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। ফলতঃ যুগধর্ম্মানুযায়ী রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রত্যেক যুগের সাহিত্য বহন করে। সেই জন্য সাহিত্যকে যদি আমরা উপরোক্ত ভাগে বিভক্ত করি তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। আর লেখকদের যদি সাহিত্যকে উপরোক্ত নানা প্রকারের ভাগে বিভক্ত করিবার অধিকার থাকে তাহা হইলে আমাদেরও এই প্রকারের বিভক্ত করিবার পূর্ণ অধিকার আছে। ইহাতে কোন 'মতলববাজের' কর্ম্ম প্রকাশ পায় না।

এক্ষণে আমাদের এই বিশ্লেষণের অনুসরণ করা যাক। প্রথমে আমরা বর্ব্বর অবস্থার কথা বলিয়াছি। মানব সমাজের এই কালেই বীরত্বের যুগের (Heroic Age) নিদর্শন পাই। এই কালের বীরদের অলৌকিক কীর্ত্তির উল্লেখ ছাড়া সাহিত্যে আর কিছুই দেখিতে পাই না। গ্রীসের হারকুলিস, পারস্যের রোস্তম, ভারতের ভীষ্ম এই প্রকারের বীর। তাঁহাদের বীরত্বগাথা

Classical যুগের সাহিত্যেই লিপিবদ্ধ হইতে দেখা যায়। এই বীরেরা তৎকালীন যুগের আদর্শপুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইতেন। তৎপরে আসে Classical যুগ। এই যুগ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে আরম্ভ হইয়াছে। এই যুগকেও সভ্যতার বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায়ঃ গ্রীসের হোমারীয় কাল হইতেছে সেই দেশের সামন্ততন্ত্রীয় যুগ; আর পেরিক্লিসের যুগ হইতেছে এথেন্সের বুর্জ্জোয়া-ডেমোক্র্যাটিক যুগ। অন্যপক্ষে রোম যখন এটোলীয়ান লীগকে পরাজিত করিয়া গ্রীসকে বিধ্বংস করে তখনও এই পার্ব্বত্য গ্রীকেরা সভ্যতার গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করে নাই। আবার ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্রীয় যুগ হয় তো সুদূর অতীতে কোনো সময় আরম্ভ হয়, কিন্তু গুপ্ত যুগ হইতে মোগল যুগের পূর্ব্ব পর্যান্ত ইহাকে জাজ্জ্বল্যভাবে দেখিতে পাই; এবং রাজপুতনায় ইহা এখনও বর্ত্তমান আছে।

এক্ষণে দেখা যাক কি কি লক্ষণ দ্বারা আমরা সামন্ততন্ত্রীয় প্রথা বা "জায়গীরদারী"* সভ্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারি। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে নিম্নলিখিত কয়েকটী লক্ষণ দ্বারা ইহা নির্দ্ধারিত হয়ঃ

(১) জমির ভোগদখলের অধিকার রাজা হইতে স্তরে স্তরে কৃষক পর্য্যন্ত নামিয়া যায়, (Subinfeudation of land), (২) স্বামীধর্ম্ম (Nobless oblige), (৩) বৈরদেয় (Blood feud and blood bond, (৪) তালুকের উপর স্বত্বভোগ (benefice), স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান (gallantry), (৬) বীরত্বের লড়াই (chivalry) প্রভৃতি। এ যুগের-সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মিক তত্ত্ব হইতেছে "স্বামীধর্ম্ম"। ইউরোপের মধ্যযুগে দক্ষিণ ফ্রান্সের ত্রুবাদুরেরা, এবং উত্তর ফ্রান্সের ত্রুভেয়ারদের গাথা এবং ভারতবর্ষে মহাভারত থেকে রাজপুতানার চারণ গাথাতে এই স্বামীধর্ম্মকেই বীরের আদর্শ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ফ্রান্সের চারণ রোঁলা তৎকালীন রাজনৈতিক আদর্শের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাঁবেদার লোকের কর্ত্তব্য হইতেছে তার প্রভুর

* ৺প্রেমচাঁদজী Feudal Civilisation এর এই পরিভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন।

জন্যে যুদ্ধ করা (It is the duty of the liege-man to fight for his liege-lord) এই যুগের সাহিত্যে একজন অভিজাত জায়গীরদার ব্যক্তি হইতেছেন সমাজের কেন্দ্রস্থল। আর সব লোক তাঁহার সেবার জন্য নিযুক্ত হয়। এই যুগে অভিজাত শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা জগৎকে দেখা হয়। যে সাহিত্যে আমরা এই যুগের চিত্র পাই এবং যে-সাহিত্য এই দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা হয় সেই সাহিত্যকে আমরা সামন্ততন্ত্রীয় যুগের সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

এক্ষণে আমরা পরবর্ত্তী কালের বিষয় অনুসন্ধান করিব। সামন্ততন্ত্রীয় সভ্যতা ও রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া দিয়া বুর্জ্জোয়া বা ব্যবসায়ী শ্রেণী রাষ্ট্রে ও সমাজে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। এই সময় হইতে Nationalism বা 'জাতীয়তা' রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই এই যুগকে বুর্জ্জোয়া-ডেমোক্র্যাটিক যুগ বলা হয়। এই যুগে ব্যবসায়ীগণ 'মহাজনী' সভ্যতা (Capitalist Civilisation) বিস্তার করিয়া প্রাচীন সভ্যতাকে বিধ্বংস করে। এই যুগে বুর্জ্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকই হয় সমাজের কেন্দ্রস্থল। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গীতেই জগৎকে দেখা হয়। ফরাসী বিপ্লবের পরে সেই দেশের সাহিত্য এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্য ইহার প্রকৃত নিদর্শন। এই অভিজাত সভ্যতার বিপক্ষে প্রথম অভিযান দেখিতে পাই ফরাসী বিপ্লবের সময়ে লেখা বোমারখিসের 'ফিগারো' নামক নাটক। একজন অভিজাতকে সম্বোধন করিয়া ফিগারো বলিতেছেন, 'মশিয়ে· কাউণ্ট, তুমি জগতের জন্য কি করেছ ?— কেবল একজন অভিজাতের ঘরে জন্ম নেবার সুবিধেটা গ্রহণ করেছ, আর সেইজন্য সমাজের সব দ্বারই তোমার প্রবেশের জন্য বিমুক্ত। অন্যপক্ষে আমি একজন গরীব বুদ্ধিজীবী, আমি জানিনা কি উপায়ে আমি গ্রাসাচ্ছাদন করব !" এই সময়েই আবে শিয়ে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তিকা—'তৃতীয় ষ্টেট্ (মধ্যবিত্ত শ্রেণী) কি ?'—প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেন যে তৃতীয় ষ্টেট্ই (মধ্যবিত্ত শ্রেণী) সব। এতদ্বারাই বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর দর্শনশাস্ত্র ও জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী নির্দ্ধারিত হয়।

এই সময় থেকে ফ্রান্সের সাহিত্যকে 'বুর্জ্জোয়া' সাহিত্য বলা হয়। অবশ্য ইহার মধ্যেও ভাবের দিক দিয়া বিভাগ আছে*। আমেরিকায় স্বাধীনতা পাইবার পর হইতে বুর্জ্জোয়া সাহিত্য সৃষ্ট হয়। আর ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীতে সভ্যতা ধীরে ধীরে ক্রমবিকশিত হওয়ার ফলে প্রাচীন সভ্যতা ও 'মহাজনী' সভ্যতা সমাজে একীভূত হইয়াছে। সেই জন্যেই এই দুই দেশের সাহিত্যে একটা বিপ্লবের দ্বারা বিভাগ সৃষ্টি হয় নাই। যে সব দেশ বা রাষ্ট্র, রাজা বা অভিজাত দ্বারা শাসিত সে সব দেশে যে একটা খাঁটি বুর্জ্জোয়া সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছে তাহা বলা যায় না, যদিও তথায় একটা জনসাহিত্যের সৃষ্টি নিশ্চয়ই হইয়াছে।

তৎপরে আসে প্রোলেটারীয় যুগ। এই যুগে শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহ রাষ্ট্রের পরিচালনা করিবে এবং প্রোলেটারীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা জগৎ নিরীক্ষিত হইবে। যে-সাহিত্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয় এবং এই শ্রেণীর আদর্শের নির্দ্দেশ থাকে, তাহাকে প্রোলেটারীয় সাহিত্য বলা যায়। এই শ্রেণীর সাহিত্য কেবল একমাত্র রুষেই বিকাশ পাইতেছে।

অবশ্য এইখানে ইহাও বক্তব্য যে এই সব বিভাগীয় সাহিত্যকে একটী নির্দ্দিষ্ট বাঁধাধরা সর্ত্তের (category) মধ্যে ফেলা যায় না। আজকাল পৃথিবীর অনেক স্থলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জীবনী লইয়া সাহিত্য লেখা হইতেছে এবং এই সাহিত্যকে 'জন' (people's) সাহিত্যও বলা যাইতে পারে কিন্তু খাঁটি বুর্জ্জোয়া সাহিত্য বলা যাইতে পারে না। অন্যদিকে বিগত ১৯১৪ সালের যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানী এবং অন্যান্য দেশে সোস্যালিস্টগণ প্রোলেটারীয়েট-জীবনী ও আদর্শ নিয়া সাহিত্য লিখিতে আরম্ভ করেন এবং তাহাদের জীবনের সর্ব্ব বিষয় নিয়া পৃথক আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই সময় থেকেই তাঁহাদের দ্বারা Proletarian Literature ও Proletarian Culture এই দুইটী কথার সৃষ্টি হয়। কিন্তু 'মহাজনী' সভ্যতার আওতা হইতে শ্রমজীবী-সংস্কৃতি

* K. T. Butler—'History of the French Revolution' p. 276-286 Vol. II.

ও শ্রমজীবী-সাহিত্য গড়িয়া ওঠা সম্ভবপর নয়। সেই জন্য এই সাহিত্যকে আমরা গণশ্রেণীর (masses) সাহিত্য বা গণ-সাহিত্য বলিতে পারি, কিন্তু প্রোলেটারীয় সাহিত্য বলা সমীচীন হইবে না। অতি প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহা ওই সামন্ততন্ত্রীয় যুগের অন্তর্গত বলিতে হইবে। বর্ত্তমানে বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্য এখনও জমীদারের ফটক পার হয় নাই। প্রাচীন সভ্যতার আওতা হইতে ভারতে একটা বুর্জ্জোয়া শ্রেণী সম্পূর্ণভাবে বিবর্ত্তিত হয় নাই বা রাষ্ট্রে ও সমাজে তাহার আধিপত্যও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাজেই একটা যথার্থ বুর্জ্জোয়া সাহিত্যের উদয় এখন সম্ভবপর নয়। ইহার মধ্যে, যে সকল তরুণ তরুণীদের কার্য্যকলাপ নিয়া গল্প বা পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে তাহাও বিলাতীর নকল মাত্র। তবে বাংলার গ্রামের পরাণ মণ্ডল ও পাঁচু শেখ অতি দীন ও অলক্ষিত ভাবে বাংলা সাহিত্যের এককোণে দাঁড়াইয়াছে বটে ; কিন্তু তাঁহারা এখনও উপেক্ষার বস্তুই হইয়া আছেন। অন্য পক্ষে রামদীন ও রহিম হিন্দী সাহিত্যের পুরোপুরি একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালায় প্রসাদজী ও প্রেমচাঁদজীর মত গণের জীবনী সম্বন্ধে শক্তিশালী লেখক উদয় হয় নাই।

কেবল কতকগুলি ভাবদ্বারাই সমাজ ও তাহার সাহিত্য সৃষ্ট হয় না। রূপ ও রস যুগে যুগে এবং জাতিতে জাতিতে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যানুযায়ী (Historical Materialism) সমাজপটে যে প্রকারের পরিবর্ত্তন দেখা যায় সাহিত্যেও তাহার প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। আর যে আদর্শ সমাজকে আরও অগ্রগমনশীলতার দিক নির্দ্দেশ করে তাহাকে 'প্রগতিশীল' বলা হয়। প্রগতি আপেক্ষিক বস্তু। সামন্ততন্ত্রীয় সভ্যতা হইতে বুর্জ্জোয়া সভ্যতা আপেক্ষিকভাবে অগ্রসর বলিয়া এই সভ্যতাকে 'প্রগতিশীল' বলা হয়। আবার যাহারা সমাজতন্ত্রবাদকে মানবের পক্ষে আরও প্রগতিশীল বলিয়া মনে করেন তাঁহারা প্রোলেটারীয় সভ্যতা ও সাহিত্যকে আরও

প্রগতিশীল বলিয়া মনে করেন। শেষ কথা এই যে একটী অনুষ্ঠান (phenomenon) প্রণিধানের বস্তু যে, বর্ত্তমানে ভারতীয় সাহিত্যে বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ অপেক্ষা প্রোলেটারীয় শ্রেণীর বিকাশের সংবাদ বেশী পাওয়া যাইতেছে।

সাহিত্য ও সমাজ

(১)

আজকাল সাহিত্যে প্রগতি চাই বলিয়া কথা উঠিয়াছে; এবং 'প্রগতি সাহিত্য' নামে একটা সাহিত্য গড়িবারও চেষ্টা হইতেছে। এইজন্য সাহিত্যে প্রগতি কি, তাহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন, কারণ সাধারণ সাহিত্যসেবীর কাছে ইহার কোন অর্থ বোধগম্য হয় না।

আমাদের দেশের সাহিত্যিকেরা সাধারণতঃ সনাতনপন্থী, অর্থাৎ জীবনের সর্ব্ব ক্ষেত্রেই এই দেশের লোকের যে প্রকারের মনোবৃত্তি, এই ক্ষেত্রেও তাহাই দেখা যায়। ইহার অর্থ, অতীতকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া তাহাকেই সাহিত্য চর্চ্চার পরম লক্ষ্য মনে করা হয়। অতীতে সাহিত্যিকেরা যে-রূপ দিয়েছেন, যে গণ্ডী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে ভাবধারা নির্দ্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার বাহিরে যে সাহিত্য রস যাইতে পারে এই চিন্তা এখন এ দেশের সাহিত্যিকদের মনে সাধারণতঃ উদয় হয় নাই। এদেশে সাধারণের নিকট এখনও সাহিত্যের অর্থ, কাব্য, নাটক ও অলঙ্কার! কিন্তু পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট অগ্রগামী জাতিদের মধ্যে 'লিটেরাটুর' (Literatur) অর্থে স্বীয় মাতৃভাষায় লিখিত যে কোন বিষয়ের পুস্তক নির্দ্দেশ করা হয়; এইজন্য বৈজ্ঞানিক পুস্তক-সমূহও বৈজ্ঞানিক 'লিটেরাটুর' বলিয়া গৃহীত হয়। অন্যদিকে, আমরা যাহাকে সাহিত্য বলি, তাহাকে 'হ্যুমানিসম্, (Humanism) অর্থাৎ ক্লাসিকাল ভাষায় লিখিত পুস্তকসমূহের পাঠ মধ্যে গণ্য করা হয়। তৎপরে জীবন্ত সাহিত্যকে ঐ সব দেশে নানা স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা:—আইডিয়ালিসম্, রোমান্টিসিসম্, রিয়ালিস্‌ম্। এতদ্ব্যতীত, প্রগতিশীল লেখকেরা আবার সাহিত্যের মধ্যে কৃষ্টির মাপকাঠি অনুসন্ধানের জন্য তাহাকেও প্রাচীন

আট

যুগ, সামন্ততান্ত্রিক যুগ, বুর্জ্জোয়া যুগ, প্রলেটারীয় যুগ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন।

কিন্তু আমাদের দেশে, প্রথমোক্ত বিভাগটাই গণ্য। হয় তো শেষোক্তটি এখনও গবেষণার বস্তু হয় নাই। অতীতের ভাবধারা ও বর্ত্তমানের জাতীয়তাবাদের উন্মাদনার মধ্যে থাকিয়া ভাবুকেরা সবই একাকার দেখিতেছেন। এই সব বিষয়কে বোধগম্য করিতে হইলে সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গবেষণা প্রয়োজন।

সাহিত্য কাহাকে বলে এবং তন্মধ্যে আমরা কি দেখি, ইহাই আমাদের অনুসন্ধানের বস্তু। (একটা লোকের চিন্তা, ভাবধারা ও পারিপার্শ্বিক জগতের ঘটনাসমূহ (phenomena) পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহা যখন ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তখন তাহাকে 'সাহিত্য' বলা হয়। সাহিত্যে সম্পূর্ণ স্বকপোল কল্পিত কিছু নাই, মানবের চিন্তার ধারা তাহার বহির্জগতের অবস্থা সাপেক্ষ।) ভাবের পশ্চাতে থাকে অর্থনৈতিক উপাদান। মানব সমষ্টির আর্থিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামাজিক আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন ঘটে, সেই সঙ্গে তাহার ভাবরাজ্যেও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামাজিক রূপান্তর দ্বারা কৃষ্টির যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহার নজীর হয় ইতিহাসে, না হয় সাহিত্যে দেখিতে পাই। সাহিত্যে তৎকালীন সামাজিক চিত্র প্রতিভাত হয়, সেইজন্য সাহিত্যে আমরা সমাজতত্ত্বের মাপকাঠি দ্বারা প্রত্যেক যুগের কৃষ্টির পরিচয় পাইতে পারি। এইজন্য সাহিত্যে সনাতনধারা বা অখণ্ডবস্তু বলিয়া কিছু নাই। (জাতীয় জীবনের প্রত্যেক যুগের চিত্ত আমরা সাহিত্য-মধ্যে অঙ্কিত হইতে দেখি।) এই কারণে আইডিয়ালিসম্, রোমান্টিসিসম্ প্রভৃতিতে ভাগ করিলে সাহিত্যের পর্য্যাপ্ত বিশ্লেষণ হয় না, কারণ এই সব বিভাগের পশ্চাতেও ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই জন্যই ইহা সুনিশ্চিত যে, যেমন লোকসমাজ সাহিত্যও তদ্রূপ হইবে। সাহিত্যের মধ্যেই সমাজতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।) সাহিত্য আবার একটা বড় কাজ করে, তাহা হইতেছে ভাবপ্রচার। ইহাই সাহিত্যের 'active

role'। এই কারণেই সকলে স্বীয় চিন্তার ধারাকে মাতৃভাষায় লিখিয়া জনসমাজে প্রচার করিবার চেষ্টাকালীন সেই বিষয়ে একটা সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তাই যে সমাজে যত সংঘর্ষ সেই সমাজে ততই সাহিত্যের নানামুখী বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সাহিত্যে একটা সুরই বরাবর বাজে, বুঝিতে হইবে যে সেই সমাজ মৃতপ্রায়, তাহা অভিব্যক্তি বা আবর্ত্তনের বাহিরে গিয়া স্থাণুবৎ হইয়াছে।

সমাজে যেরূপ সনাতন ধারা নাই সাহিত্যেও সেইরূপ কোন সনাতন ধারা নাই। সাহিত্য একটা নির্দ্দিষ্ট যুগ বা সামাজিক গণ্ডী বা চিন্তা ধারার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। যে স্থলে তাহা হয় তথায় সেই মৃতপ্রায় জাতির নিদর্শন মৃতপ্রায় সাহিত্যকে আবর্জ্জনা স্তূপের মধ্যে ফেলা হয়। জাতীয় জীবনের নূতনাবস্থার প্রমাণ স্বরূপই নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠে।

ভারতের সাহিত্যের যুগ ও ক্ষেত্র অতি প্রশস্ত, অধ্যাপক ভিণ্টারনিৎস্ তাঁহার "ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে বলেন যে ইহা ঋগ্‌বেদ হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার সময় তিন হাজার বৎসরের উপর। কাজেই ইহার মধ্যে নানা যুগের ও নানা ভাবের লীলাখেলা দেখা যাইবে। আপাততঃ সংস্কৃতের সন্তান বাঙ্গলা ভাষা ছাড়িয়া দিয়া আমরা কেবল বেদের ভাষাপ্রসূত সংস্কৃত ভাষা ও তাহার পালি এবং প্রাকৃত রূপে যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিব।

ব্লুমফিল্ড প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলেন, ঋগ্‌বেদ ধনী ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাদির কথাই উল্লেখ করে। ইহা দানস্তুতি, দশরাজার যুদ্ধ, ইন্দ্রের সম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, গজপৃষ্ঠে পাত্র পরিবেষ্টিত রাজা প্রভৃতি উচ্চস্তরের ক্রিয়াকলাপের গানে পরিপূর্ণ। ইহাতে আর আছে "মহাকুল" ও "মঘবন্" প্রভৃতিদের উল্লেখ! ইহাতেই দৃষ্ট হয় যে, বেদের মন্ত্রভাগ সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের স্তুতিতেই পরিপূর্ণ। যজুর্ব্বেদও তদ্রূপ; ইহাতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণদ্বয়ের উন্নতিকল্পে যজ্ঞাদি করিবার ব্যবস্থা আছে এবং তাহাদের জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করাও উল্লিখিত আছে। পরে যখন বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ঘোষিত হয় এবং সাধারণ ভাষায় ধর্ম্মপুস্তকসমূহ লিখিত হইতে থাকে, সেই সময় প্রাকৃত ও পালি ভাষায় জৈন ও বৌদ্ধাচার্য্যেরা জনসাধারণের কিঞ্চিৎ সংবাদ দিয়াছেন। এই সব পুস্তকে, সনাতনী প্রথা ভাঙ্গিয়া সংস্কারকগণ যখন শূদ্র ও পতিতদের আহ্বান করেন, তখনকার চিত্র আমরা জনসাধারণের ভাষায় (জাতক, অবদান ও অঙ্গাদি পুস্তক) পাই। এই সব পুস্তকে আমরা জনসাধারণের সংবাদ পাই, তৎকালীন ভারতীয় সামাজিক জীবনও এই সব পুস্তকে প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু যখন শেষ মৌর্য্য সম্রাটকে হত্যা করিয়া তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণাধিপত্য স্থাপন করে তখন সেই যুগের শাসকশ্রেণীর স্বার্থপ্রণোদিত শ্রেণী লক্ষণদৃষ্ট 'মানবধর্ম্মশাস্ত্র' বা মনুসংহিতার নূতন সঙ্কলন হয়। সেই সময় হইতে আমরা সংস্কৃত ভাষায় আর এক সামাজিক চিত্র দেখিতে পাই। ব্রাহ্মণাধিপত্যের যুগ হইতে নূতন সংস্কৃতের আদর হয়; এই আদর গুপ্তযুগে চরম শিখরে আরোহণ করে। ঐতিহাসিকেরা বলেন, প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার চরম উৎকর্ষ ১০০-৭০০ খৃষ্টীয় শতক মধ্যেই হয়। এই সময়েই সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধ অশ্বঘোষ নাটক রচনা করেন, তৎপরে ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, পরে রাজশেখর, ভারবী, মাঘ, ভট্টনারায়ণ, আরও পরে শ্রীহর্ষ, জয়দেব ও শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের উদয় হয়। শেষোক্তদের সময় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তখন ভারতে মুসলমান আক্রমণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকে তুরস্কের নামোল্লেখ আছে।

এই যে, ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিরচিত বিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্য,—যাহা লইয়া আজও আমরা গৌরব বোধ করি এবং যাহার বিশিষ্টাংশ সামন্ততান্ত্রিক যুগেই লিখিত তাহার স্বরূপকে বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাই নিরূপিত হইবে: বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রাধান্য, কুল ও বংশের মহিমা, স্বা[illegible], সামন্তরাজাদের অস্তিত্ব, বাজারে বাজারে শিক্ষিতা গণিকার প্রাদুর্ভাব, গোলাম শ্রেণীর অস্তিত্ব, রাজাদের অন্তপুরে কঞ্চুকী ও প্রহরী, অবগুণ্ঠনের প্রচলন, স্ত্রীলোক আইনের অধিকার হইতে বঞ্চিত (যদিচ বৈদিক যুগের পরে অনেক মনীষী স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমানাধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিতেন [যাস্কের-টীকাকার

এগার

দুর্গাচার্য্য]) সামাজিক আদবকায়দার বাহুল্য ইত্যাদি। এই সব পুস্তকে সামন্ত-তান্ত্রীক যুগ পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়, সেই জন্য তাহাতে জনের ও গণের সংবাদ পাওয়া যায় না, কেবল রাজা, রাণী, সেনাপতি, মন্ত্রী, রাজকন্যা ও তাঁহার প্রণয়ী।

এই প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক যুগের ইতিহাসে একটা ঘটনা দ্রষ্টব্য যে, ভাস হইতে হর্ষবর্দ্ধন পর্য্যন্ত সকলেই একছাঁচে নিজেদের নাটক রচনা করিয়াছেন। গল্পের বেশী বাহুল্য নেই। যাহা আছে, ঐতিহাসিকেরা বলেন তাহা, সকলেই গুণাঢ্যের পৈশাচী-প্রাকৃত ভাষায় লিখিত "বৃহৎ কথা" হইতে "plagiarize" করিয়া লিখিয়াছেন। এইসব পুস্তক একটা যুগের ও একটা শ্রেণীর বিষয় ক্রমাগত বর্ণনা করিয়াছে বলিয়া, সব পুস্তকই এক ছাঁচে ঢালা।

এই যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা একদিকে ব্রাহ্মণাধিপত্য ও বর্ণাশ্রমের মাহাত্ম্য (কালিদাস, ভবভূতি দ্রষ্টব্য) ও বড় বড় ক্ষত্রিয় রাজাদের গুণকীর্ত্তনে ব্যস্ত থাকায় দেখি যে, ব্রাহ্মণ লেখকগণ সাধারণকে ধাঁ ধাঁ লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, হিন্দু-সমাজ ব্যবস্থা সনাতন ও চিরকালই ব্রাহ্মণ্যবাদ মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু অন্য লেখকদের কাছ হইতে আমরা এই সংবাদ পাই যে, "লোকায়তবাদ", নাস্তিকতা, বাস্তবিকতা পূর্ণ সুখভোগবাদ প্রচারিত ও গৃহীত হইতেছে। এই মতের বিশ্বাসীর দল ছিল ধনকুবের "নাগরক"গণ। প্রাচীন হিন্দুর সুখসমৃদ্ধির কালে যখন নানা সমুদ্র বিচরণ করিয়া হিন্দুর অর্ণবপোতগুলি নানাদেশ হইতে 'সুক্তার বদলে মুক্তা, জিরের বদলে হীরে' লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, তখন এই অর্ণবপোতদের মালিকগণের মধ্যে "নাগরক" শ্রেণী উদ্ভূত হয়। বাৎসায়ণ বলেন, এই নাগরকগণই লোকায়ত ধর্ম্মের অনুরাগী হয়। "বনে দুইটা ময়ুরের অনুসন্ধানাপেক্ষা হাতে একটা পাখী থাকা ভাল" ইহাই হইতেছে লোকায়তদের মত। আসল কথা, দেশে ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সামন্ততন্ত্রীয় আভিজাত্যের পার্শ্বে একটা বুর্জ্জোয়া শ্রেণী বিবর্ত্তিত হয়। এই শ্রেণীর নাগরকগণ পাশ্চাত্য দেশের হালফ্যাসানের ধনকুবেরগণের ন্যায় জীবন যাপন করিত। প্যারিস সহরে যে type'কে "boulevardier" বলা

হয়, প্রাচীন ভারতের নাগরকগণ তাহাদেরই প্রতিমূর্ত্তি! ভাস ও মৃচ্ছকটিকের নাটকের চারুদত্ত তাহারই একজন প্রতীক, যদিচ ধনহীন। এক কথায়, সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থিত অভিজাত শ্রেণীর লোক যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের গুণকীর্ত্তন করিত, ধনকুবের নাগরকগণ realist হইয়া নাস্তিকতা ও ভোগবাদ মতের পোষকতা করিত। এই জন্যই তাহারা বৃহস্পতি ও চার্ব্বাকের লোকায়ত মতের অনুরাগী হয়। আবার, উত্তর বৈদিক যুগে যে সব ধর্ম্মসম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছিল, তাহাদের ধর্ম্মপুস্তক সমূহে আমরা গণের সন্ধান পাই। বৌদ্ধ 'অবদান' ও 'জাতক'সমূহ আমাদের তৎকালীন সমাজের আলোকচিত্র প্রদর্শন করে। এতদ্বারা দৃষ্ট হয় যে, গণেরা সাম্যবাদী বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী হয়।

যখন ভারতীয় সমাজ এই ভাবে চলিতেছে, তখন আমরা হিন্দু সমৃদ্ধির শেষাশেষি তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ভারতে দেখিতে পাই। তান্ত্রিকধর্ম্ম সামাজিক হিসাবে বর্ণাশ্রমের বিপক্ষে যায় নাই। সেই জন্য আমরা সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে তান্ত্রিকতার সব অলৌকিক গল্পের অবতারণা হইতে দেখি। রাজশেখরের 'বিদ্ধশাল ভঞ্জিকা' হইতে ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মালতীমাধব নাটকে কাপালিক অঘোর ঘণ্টা ও তাহার শিষ্যা কপালকুণ্ডলার বীভৎস ব্যাপার বর্ণিত আছে। "কাপালিক দেবীর নিকট স্ত্রীরত্ন উপহার দিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলা তাহারই আহরণের ইচ্ছা করিতেছিলেন" (ভবভূতি, কবিকথা ২ খণ্ড পৃঃ ৪৭৮)। ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক পুস্তকসমূহে একটি বিশিষ্ট সামাজিক সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সতবাহনদের রাজত্বের অবসানের পরে, মধ্য ভারতের 'ভারশীব'ও 'ভাকাটাকা' রাজাদের উত্থান হয়। বিষ্ণুপুরাণে ইহাদের 'নবনাগ' ও 'বিন্ধ্যশক্তি' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই রাজাদের যে-সব তাম্র-শাসনসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে (Corpus Inscriptionum Indicarum vol III) তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, ইহাদের সময়ে শৈব ধর্ম্ম বেশী প্রসার লাভ করে, আর ইহারা অশ্বমেধাদি নানাবিধ যাগযজ্ঞের পুনরুত্থান করে। এই

সময়ে বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠার সংবাদ খুবই কম পাওয়া যায়। লেখমালা দৃষ্টে ইহা বোধগম্য হয় যে, ইহাদের শাসনকালে ও পরবর্ত্তী গুপ্তদের আড়ম্বরপূর্ণ শাসনকালে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মসমূহের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ড যুক্ত ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ধর্ম্মের উদ্ভব হয়। এই প্রচেষ্টারই চিত্র আমরা কালীদাস ও ভবভূতি প্রভৃতিতে এবং পুরাণসমূহে পাই। কিন্তু শিলালেখ সমূহে ইহাও দৃষ্ট হয় যে সতবাহনযুগেই অনেক শক, পারদ ও যবন (গ্রীক) ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হইয়া ব্রাহ্মণ্যক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। আবার পাণিনীর "শূদ্রানাম্ অনিরবুসিতানাম" সূত্রের ব্যাখ্যায় পতঞ্জলী তাঁহার মহাভাষ্যে বলিয়াছেন শক, যবনেরাও আর্য্যাবর্ত্তে বাস করে। স্বভাবতঃই সামাজিক প্রশ্ন উঠিবে, ইহাদের স্থান ভারতীয় সমাজের কোথায় হইবে? কৌমগত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম তাহাদের স্থান দিতে চায় না, অথচ তাহারা হইতেছে "হিন্দু"। এই সময়েই তন্ত্রের উদ্ভব হয়। ভারশীব ও ভাকাটাকাদের শৈবধর্ম্ম অনুরাগ, এবং তন্ত্রোক্ত সংবাদ যে বিন্ধ্যপর্ব্বতের তিন পার্শ্বের স্থানে (অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা, বিষ্ণুক্রান্তা—মহানির্ব্বাণতন্ত্র, প্রথমোল্লাস) ৬৪ খানি করিয়া প্রত্যেক স্থানে তন্ত্রগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল, এই সংবাদ দ্বারা একটা সমাজতান্ত্রিক নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। পুনঃ, এই তন্ত্রের 'চক্রে' (ধর্ম্মোপাসনাক্ষেত্রে) ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, যবন ভেদ নাই, (মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১৮৮, ২১৮)। আবার চক্রে অনুষ্ঠিত শৈব বিবাহ ব্রাহ্ম বিবাহের ন্যায় শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। পুনঃ, এই বিবাহ বিধবার সহিত করণীয় (মহানির্ব্বাণ ৯।২৭৭) আবার অসবর্ণ বিবাহও চলিতে পারে (ঐ ২৭৭)। পুনঃ, "মহাচীনাচার" তন্ত্রে দৃষ্ট হয় যে ছুৎছাৎ আচার বিচারের বালাই তান্ত্রিকদের নাই। অশুচি বস্ত্র পরিধান করিয়া, আহারের পরেও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় (বৃহৎ তন্ত্রসার, বীরতন্ত্র)। এই সবের অর্থ, গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদীয় "আচার" সঙ্কলিত কৌমগত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বাহিরে এমন ধর্ম্মমত বাহির হইল যাহাতে তদানীন্তনের ম্লেচ্ছ, শক ও যবনও স্থান পায়।

এই প্রকারে পুষ্যমিত্র অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ার বিপক্ষে যুগধর্ম্মানুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া একদল কৌমের বাহিরের লোকদের নিজেদের গণ্ডীর ভিতর

আকর্ষণ করেন। কিন্তু পুরাণ ও স্মৃতি সমূহে এই প্রতিক্রিয়ার কোন সংবাদই নাই; যদিচ সামন্ততান্ত্রিকযুগের ছাপ ব্রাহ্মণ্যবাদীয় তন্ত্রে আছে। অন্যদিকে বৌদ্ধতন্ত্রেও জাতির বা বর্ণের বালাই নেই, তান্ত্রিক অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিবার প্রযত্ন করিতেন, এবং আলকেমীতে পারদর্শীতাকে ধর্ম্মে সিদ্ধি রূপে প্রচার করিতেন (B. N. Datta—Mystic Tales of Lama Taranatha দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সাম্যবাদীয় বৌদ্ধদের মহাষানী শাখাতে তৎকালীন সামন্ততান্ত্রীক বাতাবরণের ছাপ বিশেষভাবে পড়ে। তাঁহাদের ভিক্ষু সংঘে যেমন পদভেদ জনিত স্তরভেদ সাধুদের মধ্যে উদ্ভূত হয়, ধর্ম্মেও তদ্রূপ আরাধ্যদের মধ্যে স্তর ভেদ দৃষ্ট হয়। ফলতঃ একই সামন্ততান্ত্রিক বাতাবরণে বিবর্ত্তিত বর্ণাশ্রমীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ ও মহাযানী বৌদ্ধবাদ একই ধারায় প্রবাহিত হইয়া শেষে তন্ত্রের ভিতর দিয়ে একীভূত হইয়া যায়। এই জন্যই পরে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারত হইতে অন্তর্হিত হয়।

ইহার পর, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিক প্রভাবের সময়ে আমরা মাঘের 'শিশুপালবধ', শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিতম' ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', ধোয়ীর 'পবনদূত' বিরচিত হইত দেখি। উত্তর ভারতে হিন্দুর রাজনীতিক পতনের প্রাক্কালেই এই তিন পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। কাব্য হিসাবে এই পুস্তকগুলি উচ্চদরের হইলেও ইহাতে পতনোন্মুখ হিন্দুর সামাজিক চিত্র বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই কয়টী পুস্তকে আমরা প্রথমোক্ত যুগের কবিদের থেকে ভিন্ন সুর বাজিতে দেখি! ইহাতে বীররস অপেক্ষা আদিরস ও কামকলার চিত্রের সংবাদ পাই। পুস্তকগুলি পাঠ করিলে বেশই বুঝা যায় যে, হিন্দুর জাতীয় জীবনে ও নৈতিক আদর্শে ঘুণ ধরিয়াছে। মাঘে—যাদব ও যাদবীদের প্রভাসে মদোন্মত্ত বিহার, নৈষধে—দময়ন্তীর বিবাহে বরযাত্রীদের কদর্য্য রসিকতা এবং বাসরগৃহে বরকন্যার কদর্য্য আলাপের সহিত ভাসের পুস্তকসমূহের বীররসের বর্ণনা, কালিদাসের রঘুর দিগ্‌বিজয়ে এবং ভবভূতিতে (মহাবীর চরিত) রামের সহিত পরশুরামের, পরে রাবণসৈন্যের সহিত যুদ্ধের বর্ণনার কি প্রভেদ! এতৎব্যতিরেকে, এই উভয় দলের লেখকদের

লেখার মধ্যে Moral toneএর কি প্রভেদ (কালিদাসের কয়খানি পুস্তক অতি কুরুচিপূর্ণ। কিন্তু বর্ত্তমানে কথা উঠিয়াছে উহা তাঁহার রচিত কিনা ? হিন্দীতে শ্রীপ্রসাদজীর "স্কন্দগুপ্ত" নাটকের মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য) !

এই প্রকারে সংস্কৃত সাহিত্যে বিভিন্নযুগের বাতাবরণে রস ও রূপেরই কত প্রভেদ ! শেষে একটি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিব। তাহা হইতেছে পূর্ব্বোক্ত "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটক। ইহা ধর্ম্মাত্মক পুস্তক, রূপকভাবে লিখিত এবং ইহাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় যখন বৌদ্ধশাসন অন্তহিত হইয়া ব্রাহ্মণ্যবাদীয় শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা একটা বাঙ্গালী national-Chauvinist (আক্রমণশীল জাতীয়তা) ভাব সৃষ্ট হইয়াছে (এই ভাব দশম শতাব্দীর ভবদেব ভট্টেও দৃষ্ট হয়) তখন এই নাটক লিখিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ৺জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের অনুবাদ হইতে উদ্ধৃতাংশটি পাঠ করিলেই তাহা বোধগম্য হবে।

"অহংকার—(সক্রোধে) আরে, আমরা দেখচি তুরস্ক দেশে এসেছি ; তা না হলে অতিথি ব্রাহ্মণকেও গৃহস্থেরা পাদপ্রক্ষালনের জল দেয় না" (পৃঃ ২১)

* * * *

"অহংকার—অত্যুত্তম রাজ্য এক গৌড় তার নাম
তাহারি গো রাঢ় দেশ ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম ;
সে গ্রামে করেন বাস শ্রেষ্ঠ মোর পিতা,

* * * *

তার মাঝে সর্ব্বোত্তম জানিবে আমারে
প্রজ্ঞাশীল বুদ্ধিধৈর্য্যে বিনয় আচারে" (পৃঃ ২২)

ইহা বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণাধিপত্যের যুগের অর্থাৎ ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় সেন রাজাদের সমসাময়িক কালের জাঁকের কথা ! ইহা পুষ্যমিত্র প্রতিষ্ঠিত Brahmanical Imperialism-রূপ (ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সাম্রাজ্যবাদীয় মনস্তত্ত্ব) ব্যবস্থা বাঙ্গলায় সংস্থাপিত হইবার পর, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণদের জাঁকের বড়াই। তারপর,

তুরস্কের শেল বাঙ্গলায় পড়ে, তখন এই দেশের লোকে গৌড় রাজ্যের জাঁক করেনা, করে কেবল নিজের বর্ণের ও বংশের! তৎপর আসে দেবীবরের মেলবন্ধনের পালা, আর রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতত্ত্বে' সতীদাহ ও আচারের কড়াকড়ির ব্যবস্থা।

রঘুনন্দন আজ নানাপ্রকারের গালাগালির পাত্র হইয়াছেন, কিন্তু ইহাও দেখা প্রয়োজন যে এই ব্যবস্থার পশ্চাতে কি অর্থনীতিক ব্যাখ্যা ছিল? "অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব" ব্রাহ্মণ ও জমিদার, উচ্চশ্রেণী প্রভৃতি নানা বনিয়াদী স্বার্থের প্রতীক মাত্র।

(এই প্রকারে আমরা দেখি যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও শ্রেণীসংগ্রামের ছাপ রহিয়াছে এবং অর্থনীতিক ও সামাজিক বিবর্ত্তনের সঙ্গে ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।)

এইবার আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যের কিঞ্চিৎ সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করিব। বাঙ্গলা সাহিত্য প্রায় ১০০০ বৎসরের। গৌড় প্রাকৃত ভাষা নানা অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া বর্ত্তমানের বাঙ্গলা ভাষার আকার পরিগ্রহণ করিয়াছে। ঐতিহাসি-কেরা বাঙ্গলার সঠিক ইতিহাস খৃঃ ৭ম শতকের শশাঙ্ক হইতে আরম্ভ করেন। হালে আবিষ্কৃত একজন বৌদ্ধ বাঙ্গালীদ্বারা বিরচিত "আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প" পুস্তকে লিখিত আছে যে শশাঙ্ক ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। তৎপরে, অরাজকতার জন্য প্রজারা "ভদ্র" নামক একজন শূদ্রকে রাজপদে বরণ করেন। ইহার পর একটি 'সাধারণ-তন্ত্র' (Republic) স্থাপিত হয়। বাঙ্গলা আবার "মাৎস্যন্যায়" দ্বারা জর্জ্জরিত হইলে প্রকৃতিপুঞ্জ গোপাল নামক একজন নায়ককে রাজপদে বরণ করেন। উপরোক্ত পুস্তক গোপালের জাতি সম্বন্ধে বলিতেছে যে ইনি "দাসজীবিন" অর্থাৎ, ইনি অতি নীচ শ্রেণীর শূদ্র। এই গোপালই বিখ্যাত পাল বংশের স্থাপয়িতা। এই সময়ে বাঙ্গলার রাজারা কিছুকালের জন্য উত্তর ভারতে সার্ব্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহারা "পঞ্চগৌড়েশ্বর" আখ্যা পান। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে এহেন প্রবল পাল-যুগের কোন নিদর্শন নাই। আছে কেবল ছড়া বা গীতিতে। তাহারও অতি যৎসামান্য রক্ষিত হইয়াছ বা আবিষ্কৃত

হইয়াছে। পরের যুগের ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্য্যের ও গুণগরিমার চিহ্ন একেবারে মুছিয়া দিয়াছে! এখন "ধান ভানতে মহীপালের গীত"-এর পরিবর্ত্তে শিবের গীত গাওয়া হয়। চৈতন্য চরিতামৃতে দুঃখের সহিত বলা হইয়াছে,

"জোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত,
শুনে সব লোকে আনন্দিত।"

৺পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত এই যে বাংলায় বৌদ্ধ কৃষ্টির সমস্ত চিহ্নই ব্রাহ্মণেরা বিলুপ্ত বা রূপান্তরিত করিয়াছে! হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাংলায় বৌদ্ধরাষ্ট্রিক প্রাধান্যের যে সব প্রতিভূ ছিল তাহার কোন চিহ্ন আজ নাই। ইহা হইতেছে ভীষণ শ্রেণী-সংগ্রামের একটী নির্ম্মম দৃষ্টান্ত। দশম শতাব্দীতে এই সংগ্রাম ধর্ম্মসংগ্রামরূপে প্রকাশ পায়। বাংলার ছড়া

"আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে···
সাজতে সাজতে পড়ল সাড়া
সাড়া গেল বামুন পাড়া"

সেই সংগ্রামের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিতেছে। এই সময়ের ইতিহাসে বৌদ্ধ দলন দেখিতে পাওয়া যায়। রাঢ় দেশের শূরেরা এবং পূর্ব্ববঙ্গের বর্ম্মণেরা বিদেশাগত এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী। তাহারা বাঙ্গালীর গলায় লৌহশৃঙ্খল পরাইতে আরম্ভ করে। পরে কর্ণাটাগত সেনেরা তাহা সম্পূর্ণ করে। এই সময় হইতে একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদিগের অত্যাচার, অন্যদিকে বৌদ্ধ বাঙ্গালীদের বিক্ষোভ—এই দুই অবস্থা সম্মিলিত হইয়া মুসলমান-তুর্কীদের দ্বারা বাঙ্গলা বিজয় সহজ করিয়া দেয়। এই যুগে বাঙ্গলা সাহিত্যের যাহা কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, "সূর্য্যের পাঁচালী", "শূণ্য-পুরাণ" ইত্যাদি—তাহাতে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী গণশ্রেণীর সংবাদ পাই। এই সময়ের ধর্ম্মপূজা সংক্রান্ত 'ধর্ম্ম-মঙ্গল"ই বাঙ্গলার Epic (মহাকাব্য) বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। ইহাতে ধর্ম্মঠাকুরের ভক্ত লাউসেনের যুদ্ধ বিবরণ আছে। ইহাতে আমরা সংবাদ পাই যে সম্রাট ধর্ম্মপালের শ্যালিকা পুত্র কামরূপ-বিজয়ী লাউসেনের দক্ষিণ হস্ত ছিল কালুডোম। এই মহাকাব্যে দেখি ডোম সেনাপতি, মেটে

(বাগদী জাতির একটী শাখা) জাতীয় ইন্দ্র গৌড়ের সহর কোটাল, একজন চণ্ডাল ঢেকুরের সহর কোটাল (বোধ হয় এই পদ এই জাতীয় লোকেরাই গ্রহণ করিত, সেই জন্য আজও এই জাতি পশ্চিম বঙ্গে 'কোটাল' নামে পরিচিত), আর ঢেকুরের সামন্ত ইছাই ঘোষ সম্ভবতঃ গোয়ালা। আর্য্যমঞ্জুশ্রী কথিত পাল রাজাদের জাতি এবং তাহাদের সামন্ত ও কর্ম্মচারীদের জাতি দেখিয়া তৎকালীন বাংলার সমাজের স্বরূপ কিঞ্চিৎ বোঝা যায়। আজ যাঁহারা অধঃপতিত সেই সময়ে তাঁহারাই উচ্চবর্ণের এবং শাসকশ্রেণীর লোক ছিলেন। এই যে বাংলার সামাজিক পট সেন যুগ হইতে, পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার গ্রহণ করিয়াছে সেই নির্ম্মমতার কোন স্মৃতিই বাংলা সাহিত্যে নাই। তৎপরে ব্রাহ্মণ যুগে আমরা উচ্চশ্রেণীর শৈব ধর্ম্ম ও গণশ্রেণীদের ধর্ম্মের সংগ্রাম 'মনসার ভাসান' বা 'মনসা-মঙ্গল' গ্রন্থে দেখিতে পাই।

ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, বাঙ্গলার পালেরা মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন এবং মহাযানের তান্ত্রিক শাখা এবং ব্রাহ্মণ্য শৈব-তান্ত্রিকদের সহিত অনেক মিল ছিল। ঐতিহাসিকদের অনুমান যে মহাযান ধর্ম্ম তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত এত নৈকট্য সম্পাদন করিয়াছিল যে শেষে উভয়ে একীভূত হইয়া যায় (শঙ্করাচার্য্যের "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" অপবাদ তাহাই ইঙ্গিত করে)। এই জন্যই বাংলার অভিজাতবর্গ হয় মহাযানী না হয় তান্ত্রিক ছিল। লক্ষ্মণ সেনের আদেশে পণ্ডিত হলায়ুধ লিখিত—"ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" নামক পুস্তকে স্বীকৃত হইয়াছে যে বারেন্দ্র ও রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা সব তান্ত্রিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। বৈদিক আচার দেশে অনুসৃত হইত না। অন্যদিকে নিম্নস্তরের জণসাধারণ হীনযান, সহজযান, নাথ ধর্ম্ম ও অন্যান্য পন্থাবলম্বী ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচলনের (লক্ষ্মণ সেনাদেশে পশুপতি লিখিত "মৎস-সুক্ত" দ্রষ্টব্য) সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় যে উচ্চ শ্রেণীরা হয় তান্ত্রিক না হয় শাক্ত এবং তাহাদের সহিত গণসাধারণের ধর্ম্মের সংঘর্ষ হইতেছে। মনসা পূজার পুস্তকে তাহা ভালভাবে দেখা যায়। মহেন-জো-দাড়োতে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয় যে ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বেও সাধারণ লোকে অশ্বত্থ গাছ ও নানা প্রকারের জন্তু ও লিঙ্গ-

পূজা (Phallic Worship) করিত ; এই ধর্ম্ম আজও পর্য্যন্ত অন্তঃসলিলার ন্যায় ভারতে চলিতেছে। ইহারই উপর বৈদিক ধর্ম্ম আরোপিত হয়। কিন্তু বাঙ্গলার অভিজাত ব্রাহ্মণ্যবাদের সহিত ইহার ঠিক রফা হয় নাই ; তাই মনসার ভাসানে দেখি ধনী চাঁদ সওদাগর বলিতেছেন :

"যে হাতেতে পূজি আমি দেব শূলপাণি
সে হাতে পূজিব আমি কাণি চ্যাঙ্গমুড়ি!"

এই সব পাঁচালীর মধ্য দিয়া আমরা গণশ্রেণীর সংবাদ পাই। এই সময়ের সেন রাজাদের যুগেও গৌড়ের সুলতানদের সময়ে ব্রাহ্মণ দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্য পরিস্ফুট হইতে দেখি না। ঐতিহাসিকেরা বলেন, মুসলমান রাজারা বাঙ্গলা সাহিত্যের স্রষ্টা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা গৌড়-প্রাকৃতকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। গৌড়ের মুসলমান রাজাদের শাসনকালের চিত্র আমরা বিজয় গুপ্তের "পদ্মপুরাণ" ও নারায়ণ দেবের "পদ্মপুরাণ" গ্রন্থে পাই। প্রথমোক্ততে তৎকালীন মুসলমান শাসনকালে হিন্দুর অবস্থা এবং দ্বিতীয়টীতে হিন্দুসমাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। নারায়ণ দেব পূর্ব্ব-মৈমনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে এই অংশ এবং শ্রীহট্ট প্রদেশে স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব ছিল। উত্তর-বঙ্গেও "কামাটপুর" নামে হিন্দুরাজত্ব ছিল। কেহ কেহ* অনুমান করেন ইনি রাজা গণেশের পুত্র যদু ওরফে জেলালুদ্দিনের রাজ্যকালে জন্মিয়াছিলেন। জেলালুদ্দিনের বা অন্য মুসলমান রাজার দ্বারা হিন্দুর প্রতি অত্যাচারের চিত্র নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়। নারায়ণ দেব যে তৎকালীন সমাজের বর্ণনা করিয়াছেন তাহার নায়ক ছিল চাঁদসদাগর। বাঙ্গলার প্রাচীন সমৃদ্ধির প্রতীক এই কাল্পনিক বীর পশ্চিম-বঙ্গের ও পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দুর ও মুসলমানের জনশ্রুতিতে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। চম্পা নগরের এই সাহু অর্থাৎ ধনী বণিকের কথা বাঙ্গলায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। সে সময়ে হিন্দুবণিকেরা সমুদ্র গমন করিয়া বাণিজ্য করিতেন এবং লাভের বর্ণনা :

* রঙ্গপুর জেলার সৈয়দপুর ষ্টেশনের কাছে এক মাটির ঢিপিকে স্থানীয় মুসলমানেরা চাঁদ সদাগরের জাহাজের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রদর্শন করান।

"হরিদ্রার বদলে পাইলাম কাঁচা সোনা।
* * *
পোস্তের বদলে পাইলাম মাণিক্যের গুঁড়ি"

বলিয়া পুঁথিতে উল্লিখিত আছে। আজকালকার পক্ষে এই পুস্তকের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সংবাদ যে তৎকালে বাঙ্গলার হিন্দুর মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। এই বিবাহকে 'সাঙ্গা' বলিত, এক্ষণে উক্ত জেলার মুসলমানদের বিধবা-বিবাহকে এই নামে অভিহিত করা হয়। পশ্চিমে হিন্দি-ভাষীদের মধ্যে ইহাকে 'সাগাই' বলা হয়। এই পুস্তকে বীর বলিতেছে*—

"গন্ধবণিক আমি সাবধানে শুন তুমি
'সাঙ্গা' কেমন আমি নাহি জানি।
তোরা ত বৈশ্যের ঝি অসম্ভব আছে কি
'সাঙ্গা' তোদের আছে পূর্ব্বাপর ॥"

পুনঃ, বেহুলাকে পুনঃ স্বামী গ্রহণ করিবার অনুরোধও বিভিন্ন লোক দ্বারা করা হইয়াছে।

এতদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় যে তৎকালে স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্রে বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। এই প্রথা পশ্চিমের হিন্দি-ভাষী শূদ্রদের মধ্যে আজও প্রচলিত আছে। কিন্তু একটা খটকা উঠে, গন্ধবণিক নিজেকে কি প্রকারে বৈশ্য হইতে পৃথক করিতেছে? স্মৃতি অনুসারে গন্ধবণিকও বৈশ্য বর্ণের অন্তর্গত; যাঁহারা ব্যবসায় বৃত্তিধারণ করেন তাঁহারাই বৈশ্য বা বেণিয়া। অবশ্য বৈদিকযুগে বৈশ্য বা বিশ্ অর্থে কৃষক ছিল। গ্রন্থকার কি বৈশ্য অর্থে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ী জাতিকে লক্ষ্য করিতেছেন? বোধ হয় এই স্থলে বর্ণাপেক্ষা শ্রেণী বিভাগ দ্বারা ব্যবসায়ী জাতিরা চিহ্নিত হইতেছেন কারণ

"উজানী নগরে ঘর সাহরাজা নৃপবর,
তার কন্যা বিপুলা সুন্দরী"।

* শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার—'কবি নারায়ণ দেবের সময় ও সমাজ.' মাতৃভূমি আশ্বিন ১৩৫১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত পুস্তকে শেষোক্ত এই দুই পদ নাই। কিন্তু বিধবার পুনঃ বিবাহের ইঙ্গিত তথায়ও আছে।

পুনঃ, চাঁদ সদাগর

"গন্ধবণিক সে যে চম্পকেতে ঘর।
রাজা হইয়া প্রজা পালে সুখে চন্দ্রধর।"

এতদ্বারা ধনকুবের গন্ধবণিকদের উচ্চশ্রেণীর অভিজাতদের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। সেই জন্যই অনুমিত হয় যে তৎকালে অভিজাতদের মধ্যে বিধবা বিবাহ ছিল না, কেবল নিম্নস্তরের বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে তাহা আবদ্ধ ছিল। আজও নমশূদ্র ও দুলে প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ অপ্রচলিত নহে (নমশূদ্র বিধবা কন্যার বিবাহ লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছেন)। পশ্চিমেও তথাকথিত উচ্চজাতিদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই।
বোধহয় সমস্ত বাঙ্গলা মুসলমানাধীনে আসিলে এবং সর্ব্বত্র বাঙ্গলার নব-ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রচলিত হইলে বিধবা বিবাহ উঠিয়া যায়। সকলেই ব্রাহ্মণ্যআচার আজ পর্য্যন্ত নকল করিয়া আসিতেছেন। সেই জন্য জনসাধারণের মধ্যে তাহা আর আদৃত হয় না। এই কবিতায় আর একটি দ্রষ্টব্য যে নারায়ণদেব নিজের পরিচয়ে বলিতেছেন,

"মদকুল্য গোত্র হৈল গাঞন গুণাকর।
ক্ষত্রকুলে জন্ম সংকায়স্থের ঘর।"

উপরোক্ত গন্ধবণিকের ও কায়স্থের পক্ষে স্বাধীন হিন্দু-রাষ্ট্রের ব্যবস্থা আজ পরস্পর বিসম্বাদী ও আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের বৈষ্ণব সাহিত্যান্তর্গত "প্রেম-বিলাস" গ্রন্থে (পৃঃ ২৬২) কায়স্থদের "ক্ষত্রিয় কায়স্থ" বলা হইয়াছে। এই সব সাহিত্যিক প্রমাণ দ্বারা এই তথ্যই নিশ্চিতরূপ বুঝা যায় যে শ্রেণী-সংগ্রাম বর্ণ বা জাতি-সংগ্রামরূপে ভারতের সমাজে কার্য্য করিতেছে, তদ্দ্বারা সামাজিক শ্রেণী বা জাতিদেরও বিভিন্ন যুগে পদমর্য্যাদার পরিবর্ত্তন হইতেছে।
তুর্কি-মুসলমান শাসনের প্রাক্কালে বাঙ্গলার সামাজিক অবস্থা আমরা "আদ্যের গম্ভীরার" উদ্ভব থেকে কিঞ্চিৎ অবগত হই। সেই সময়ে সদ্ধর্ম্মী বা বৌদ্ধদের অবস্থা বিষয়ে শ্রীহরিদাস পালিত বলিতেছেন,—"স্বামীদেহারাগুলি

যখন মুসলমানগণ ভাঙ্গিয়া দিল, তাহাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল, তখন ধর্ম্মপূজার জন্য অস্থায়ী দেহারা নির্ম্মাণ করিতে হইত। এবং পূজান্তে "দেহারাভঙ্গ" বলিয়া মুসলমান-প্রীত্যর্থে হিন্দু দেবদেবীকে মুসলমান হইবার কথা শুনাইয়া মুসলমানদের সন্তোষবিধান করিবার উদ্দেশ্যেই 'দেহারা ভঙ্গে' হিন্দুদের প্রতি অযথা আক্রমণ-সূচক গীত হইত। ("আদ্যের গম্ভীরা" পৃঃ ১১৮-১১৯)। বিভিন্ন গানেই ইহা ব্যক্ত হইয়াছে,—

মৃত্তিকার গড় ভঙ্গের শেষের গান :—

"ভাঙ্গিতে নারিল মৃত্তিকার সহিধর।
স্থান বেড়িয়া যে বসিল পেকাম্বর॥
কাজিমোল্লা কিতাব পড়ে বসি।
তা দেখাকরা খোদার মনো খুসি॥" (পৃঃ ১২০)

বড়জানানি :—

"পশ্চিম মুখে খোনকার করন্তি সেবা।
দুই পায়ে কলু খোনকারের হাতে চোক দাই।

*   *   *

জগন্নাথ আসি আগুলি বসিল।
সুরা চুরি কর্য্যাছিল হাত কাটা গেল॥
এক ব্রাহ্মণ ভাই পলাইয়া যায়।
ধরিয়া আনিয়া তারে নেবাজ করায়॥
আর ব্রাহ্মণ পালায় গুড়ি গুড়ি।
মাথায় তুলিয়া দিল হেড়ার চুবড়ি॥" (পৃঃ ১২১)

শূণ্য-পুরাণের "নিরঞ্জনের রুষ্মা" এই প্রকার অবস্থার আর একটি প্রমাণ। এই সব সাহিত্যিক প্রমাণ দ্বারা বোধগম্য হয় যে বৌদ্ধগণ মুসলমানের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যবাদীর ন্যায় নিপীড়িত হইলে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়া মুসলমানের প্রীতিভাজন হইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। ইহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মীয় অভিজাত শ্রেণীর সহিত সাধারণ বৌদ্ধের সঙ্ঘর্ষেরই ফল! আবার এই যুগে বৌদ্ধধর্ম্ম

কি প্রকারে বাঙ্গলার বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া যায়, তাঁহার দৃষ্টান্ত আমরা এই পদে পাই

"আপনি ত্যজিলেন প্রাণ দেব নিরঞ্জন।
বাম উরুভাগে হইল ধর্ম্মের শাসন।
বিষ্ণু হৈল কাষ্ঠ তাতে ব্রহ্মা হুতাশন।
বাম উরু ভাগে পোড়া গেল নিরঞ্জন।"

(দেবকীনন্দন শীতলামঙ্গল)।

অন্যদিকে হিন্দুর 'সত্যনারায়ণ' পূজাকে 'সত্যপীর' নামে পূজা করিয়া হিন্দু প্রচ্ছন্নভাবে নিজের ধর্ম্মকর্ম্ম চালায়।

ইহার পর আছে মোগল-শাসনের প্রাক্কালে কবিকঙ্কণের চণ্ডী। মোগল-শাসনের প্রচলন সঙ্গে বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে সামন্ত-তন্ত্রের যুগ শেষ হইয়া যায়। মোগলেরা ভারতে কেন্দ্রীভূত শাসন-প্রণালী প্রচলন করেন। এই সময় হইতে বাঙ্গলায় যাঁহারা 'জমিদার' আখ্যা পাইতেন তাঁহারা দুর্গবাসী সামন্তরাজাও নন বা Manor নিবাসী ব্যারণও নন। তাঁহারা কেবল খাজনা আদায় করিবার চুক্তিবদ্ধ কর্ম্মচারী (ফ্রান্সের Farmer General-এর ন্যায়)। পরবর্ত্তীকালের সাহিত্য আলোচনা কালে এই কথাটি আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। কবিকঙ্কণের চণ্ডী তৎকালীন বাঙ্গলার একটী realistic (বাস্তব) চিত্র প্রদান করিয়াছে। তাহাতে নিখুঁত ভাবে পশ্চিম বঙ্গের সামাজিক চিত্র পাওয়া যায়। বিভিন্ন জাতির পেষা, সামাজিকপদ এবং রীতি প্রভৃতি যাহা এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত আজকালকার কোন মিল নাই। কবি বলিতেছেন, "বর্ণ-দ্বিজগণ মঠপতি"। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে বর্ত্তমানের বর্ণ-দ্বিজগণ পুরাতন বৌদ্ধ পুরোহিত ছিলেন। পুনঃ, কবি বলিতেছেন,

"শরাক আইসিয়া বসে, জীবজন্তু নাই হিংসে,
সর্ব্বস্থানে তারা নিরামিস।
পাইয়া প্রধান বাড়ী, বুনে তসরের যাড়ী,
দেখি বীর হৈলা হরিস"॥

আজ কিন্তু শরাক তাঁতি বলিয়া হিন্দু জাতির কোন পরিচয় নাই। তবে শুনা যায় উড়িষ্যায় নাকি তাঁহাদের অস্তিত্ব আছে। ইঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া প্রতীত হয়। পুনঃ,

নগরে অনেক যোগী, বসিলা ভিক্ষার ভোগী;
কেহ বুনে বসন কম্বল।"

আজ এই যোগী বা জুগি সম্প্রদায় এই বৃত্তি অবলম্বন করেন না। তাঁহারাও নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "নাথ" নাম গ্রহণ করিয়াছেন। আবার,

"বিষম করাল, রাঘব ঘোষাল,
করবাল মারে বীরের অঙ্গে"।

এই স্থলে ব্রাহ্মণ সৈনিকের সংবাদ পাওয়া গেল, বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণেও এই সংবাদ আছে। পুনঃ, বাগদী, হাড়ী ও ডোম জাতির লোকেরা পাইক হইত। আবার, "আসরী নিবসে পুরে, আপনার বৃত্তি করে"। অনুমিত হয় যে এই বৃত্তি কৃষিকর্ম্ম। আজ কিন্তু এই জাতি নিজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বাঙ্গলা তাঁহাদের "বিমাতৃদেশ" বলিতেছেন! কবি আর একটি জাতির সংবাদ দিতেছেন: "কায়স্থরা ভব্যজন নগরের শোভা" বলিতেছেন এবং এই জাতীয় ভাঁড়ু দত্তকে বীরের মন্ত্রী পদপ্রার্থী রূপে কবি বর্ণনা করিয়াছেন। পুনঃ, গোয়ালাদের বিষয় কবি বলিয়াছেন—গোপ দুই প্রকার: বণিক গোপ ও পল্লব গোপ। কিন্তু আজ চারি প্রকারের গোপ দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ, তেলী ছিল তিন প্রকার: "কেহ চাষী, কেহ ঘনা, কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল"। কিন্তু আজ পশ্চিম বঙ্গে তেলী অদৃশ্য! তাঁহারা নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিলি হইয়াছেন যদিচ একদল এখনও কৃষিকর্ম্ম করেন। আর ঘনারা এক্ষণে "কলু" নামে পরিচিত। অন্যপক্ষে, পূর্ব্ব-বঙ্গে বা বাঙ্গলার অন্যত্র "তেলী" নামে একটী জাতি গভর্ণমেন্টের তফসীল ভুক্ত জাতির তালিকা মধ্যে দৃষ্ট হয়। শেষে একটা বড় সামাজিক সংবাদ-যাহা ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদেরা বাদ দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেছে যে বাঙ্গলার হিন্দু সমাজে "রাজপুত্র" বা "রাজপুত" বলিয়া একটী

জাতি ছিল। কবিকঙ্কন কালকেতুর মুখ দিয়া ভাডুদত্তকে গালাগালি দেওয়াইতেছেন :

"হয়্যা তুই রাজপুত, বলাসি কায়স্থ সুত
নীচ হয়্যা উচ্চ অভিলাষ।"

এতদ্বারা আমরা এই সংবাদ পাই যে বাঙ্গলায় 'রাজপুত্র' বা 'রাজপুত' নামে একটী জাতি ছিল। 'সেখ শুভোদয়া' ও 'বল্লালচরিত' গ্রন্থে 'রাজপুত্র' জাতির উল্লেখ আছে। কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ন্যায় রাজপুতকে অনুলোমজাত "বর্ণ-সঙ্কর" জাতি বলা হইয়াছে। কোন অজ্ঞাত কারণে এই জাতি বাঙ্গলায় সম্মান পায় নাই। পূর্ব্বোক্ত নারায়ণদেবে "জাতমরা রাজপুত" উক্তি আছে। এই যুগেই বৃহস্পতি বলিতেছেন

"রাজপুত্র সহদান আর গ্রহণ সম্বন্ধ যে জন করে।
নিশীথে নলিনী নাশ পায় যেমতি তেমতি তার কুল হরে"

('বঙ্গজ কায়স্থ কারিকা'—৺নগেন্দ্র বসুর রাজন্য কাণ্ড, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৮) : পুনঃ, নুলাপঞ্চানন বলিয়া গিয়াছেন,

"রাজপুত ক্ষত্র হতে বদ্ধ পরিকর।
আদি শুদ্ধ ক্ষত্র নাই, বর্ণের সঙ্কর"

—('গোষ্ঠীকথা'—সম্বন্ধনির্ণয় পৃঃ ৭৩৮—৭৩৯)।

মিথিলা বা উত্তর বিহারেও 'রাজপুত' আদৃত নয়। তথাকার ক্ষত্রিয় বর্ণের লোকেরা নিজেদের 'ছত্রি' বলেন।

এক্ষণে কথা উঠে বাঙ্গলার সমাজে এই জাতি কোথায় গেল! আজ যাহারা 'রাজপুত' বলিয়া বাঙ্গলায় পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহারা পশ্চিমা জাত ঔপনিবেশিক, তাঁহাদের অনেক গুষ্ঠির সহিত পশ্চিমের আদান প্রদান আজিও চলে এবং তাঁহারা মিতাক্ষরা আইন দ্বারা শাসিত। কিন্তু উত্তর-ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাঙ্গলায়ও একটা "রাজপুত্র" জাতির উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া এই সব সাহিত্যিক সাক্ষ্য দ্বারা অনুমিত হয়। পরে, সপ্তদশ শতাব্দীর 'প্রেম-বিলাসে' 'ব্রহ্ম ক্ষেত্রি' (সেন রাজবংশের জাতি) জাতিরও

উল্লেখ আছে। এই সব সামাজিক জাতি বাঙ্গলার হিন্দু সমাজ-শরীর হইতে গেল কোথায়? যখন রঘুনন্দন বলিলেন, বাঙ্গলায় কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র আছেন, তখন এই জাতি উদ্ভূত বংশ সমূহের সামাজিক পদ-মর্য্যাদা কি ছিল এবং পরে কি হইল? আমরা স্পষ্টই দেখি 'প্রেম-বিলাস' রঘুনন্দনের বহু পরে রচিত হয়। কুলজী গ্রন্থ হইতেই ইহার উত্তর বাহির করিতে হবে।

দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কুলজীসার গ্রন্থে লিখিত আছেঃ—"এতে সপ্ত-বিংশতি কায়স্থাঃ বংশহেতুঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। এতদ্ভিন্না রাজপুত্রাঃ ন কায়স্থাঃ কদাচন"॥ (৺নগেন্দ্র বসুর রাজন্য কাণ্ড ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৪)। এই শ্লোকের যে অর্থই বৈয়াকরণিকেরা করুন, ইহার সরল অর্থ—কায়স্থদের মধ্যে কেবল সাতাইস ঘর কায়স্থ, বাকি সব রাজপুত! (লেখকের কাছে নগেন্দ্র বাবু এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছিলেন)। লেখককে দুইজন বিশিষ্ট লোক বলিয়াছেন, বীরভূম জেলায় 'রাজপুত' নামধারী কতকগুলি বংশ আছে, তাঁহারা উপবীতধারী নন, পূর্ব্বে তাঁহাদের সহিত কায়স্থেরা বিবাহ করিতেন না, এক্ষণে তাঁহারা মৌলিক শ্রেণীর কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন! পুনঃ, সিংহ উপাধিধারী পশ্চিমাগত রাজপুত জাতীয় বংশ সমূহ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র কায়স্থ সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। কায়স্থ কুল পঞ্জিকাসমূহ (মালাধর ঘটকের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কারিকা দ্রষ্টব্য) এবং জনশ্রুতি তাহার সমর্থন করে। এক্ষণে সাহিত্যের মধ্য হইতে দুই চারিটী কথা দ্বারা আমাদের সামাজিক চিত্রের পুনরাঙ্কন করিতে হইবে। টডের "রাজস্থান" বাঙ্গলার পাঠকদের এই ধারণা উৎপাদন করিয়াছে যে "রাজপুত" বলিলে রাজপুতানা বা নিকটস্থ মধ্যদেশের "সিংহ" উপাধিধারী গোঁপদাড়ীওয়ালা একজন ব্যক্তি (নধর কান্তি বাঙ্গালী রাজপুত হওয়া এদেশের লোকের মনে বোধ হয় বিসদৃশ ঠেকে)। হর্ষবর্দ্ধনের পরে যখন উত্তর-ভারতে সর্ব্বত্র "রাজপুত" জাতির উদ্ভব হয়, বাঙ্গলা তখন যে সেই বিবর্ত্তনের বাহিরে ছিল, তাহারই বা প্রমাণ কি? সব রাজপুত "ছত্রিশকুল" অন্তর্গত নহে। তৎপর, পাল রাজাদের সামন্তদের মধ্যেও "সিংহ" উপাধিধারী নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুনশ্চ, রাজপুতানার রাজপুতদের মধ্যে

সাধারণতঃ উপবীত ধারণ করা প্রথা নাই (লেখকের কোন পূর্ণবয়স্ক রাজপুত বন্ধু বলেন, তাঁহার এখনও উপনয়ন ক্রিয়া হয় নাই)। তদ্রূপ বৈশ্যদেরও উপবীত ধারণ করার প্রথা নাই। তবে আজকাল এই সব জাতির মধ্যে পৈতা পরার প্রথা প্রচলিত হইতেছে। বাঙ্গলার উপবীতের অভাবে যখন রঘুনন্দন বাঙ্গলার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের শূদ্র মধ্যে গণিলেন, তখন তিনি কেবল কতকগুলি পুরাতন স্মৃতি পুস্তকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তব সমাজতত্ত্বকে তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলায় এক সময়ে ব্রাহ্মণদের সর্ব্বদা উপবীত ধারণ করার প্রথা ছিল না। এই বিষয় ৺দীনেশ চন্দ্র সেন বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণদের গলায় উপবীত সর্ব্বদা থাকার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না, অনেক সময় বস্ত্রাদির ন্যায় উহা টাঙ্গাইয়া রাখা হইত, বাহিরে যাইবার সময় তাহা ব্যবহারের প্রয়োজন হইত। এই রীতি মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোন কোন পরিবার যে উপবীত-বিরহিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ বহুদিনের প্রবাদবাক্যে রহিয়াছে—'পৈতা ছাড়ি পৈতা লয় বৈদিকে দেয় পাতি' (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—হিন্দু—বৌদ্ধ যুগ, পৃঃ ৬৪) এই সব ভাব দৃষ্ট হইয়াছে। রঘুনন্দন শ্রেণী স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কাল্পনিক সমাজ ব্যবস্থা প্রদান করেন।

এই সব উক্তিদ্বারা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে বাঙ্গলার একটা রাজপুত বা রাজপুত্র নামে জাতি ছিল। বোধ হয় তাহারা সমাজে শক্তিশালী হইতে পারেনি। আর, পৌরাণিক গল্পের উপর ভিত্তি করিয়া পণ্ডিতেরা তাহাদের অনুলোমজাত বর্ণ-সঙ্কর বলিয়া দোষযুক্ত করেন। পরে, তাহারা কায়স্থ জাতির মধ্যে মিশিয়া যায়। বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহার কোন চিহ্নই নাই। বল্লাল-চরিতোক্ত ক্ষত্রিয় বংশগুলিই বা গেল কোথায়? হিন্দু-রাজত্বের পতনের পর, হিন্দু শাসক শ্রেণীর অন্তর্গত জাতিগুলির অনেক পদমর্য্যাদার পরিবর্ত্তন হয়। এই যুগের সাহিত্যে আমরা বাঙ্গালীকে সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে দেখিতে পাই। "মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে আমরা ব্রাহ্মণ পাইক, কর্ম্মকার পাইক, চামার পাইক, নট পাইক, বিশ্বাস পাইক ও বাঙ্গাল পাইকদের বিবরণ দেখি (বঙ্গভাষা ও

সাহিত্য, পৃঃ ৪৩২) কিন্তু এই সঙ্গে সাহিত্যে বাঙ্গালী সিপাহীর যে বর্ণনা আছে তাহাতে তাহাকে অরিন্দম ও দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া চিত্রিত করা হয় নাই। মাধবের চণ্ডীতে উক্ত আছে,

"যতেক ব্রাহ্মণ পাইক পৈতা করি করে।
দন্তে তৃণ করি তারা সন্ধ্যামন্ত্র পড়ে"।

মুসলমানদের লিখিত ফার্সী ইতিহাসে বাঙ্গালী পাইকের নিন্দা আছে। কথিত আছে তাহাদের অকর্ম্মণ্যতা দেখিয়া বাদশাহ্ হুসেন সাহ্ তাহাদের পল্টন সমূহ ভাঙ্গিয়া দেন। অবশ্য ইহা এক তরফের কথা। এতদ্বারা আমাদের ইহাই বোধগম্য হয় যে, স্বাধীনতার অভাবে বাঙ্গালার সৈনিকের কী মানসিক অবনতি হইয়াছিল। গ্রীসের পতন পর সে দেশের সৈনিকেরও এই অবস্থা হইয়াছিল। পালযুগের দেবপাল দেবের ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলের (রাজসাহী জেলা) সামন্ত বলবর্ম্মা সর্ব্বদাই শত্রুকে যুদ্ধ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। (নালন্দা তাম্র লিপি—Ep-Ind-vol. 17)। পুনঃ, দেবপালের অনুজ কামরূপ বিজয়ী জয়পাল ও ধর্ম্মপালের মন্ত্রী কেদার মিশ্র ও তাহার পূর্ব্বজ দর্ভপাণি মিশ্রের যুগ বাঙ্গলায় তখন অন্তর্হিত হইয়াছিল। আবার, পালযুগের শেষে ঢেক্করীর মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের পূর্ব্বজ ধবল ঘোষ—যাঁহার বীরত্ব গাথা সূতেরা গাহিত (সূতো জগতি গীত মহাপ্রতাপ—Inscriptions of Bengal vol. ৩ No. 17), সেই প্রকারের বীর-গাথার যুগ আর বাঙ্গলায় ছিলনা। পরাধীনতার যুগে সাহিত্যিকেরা অন্যরস ও রূপ অঙ্কিত করিতে থাকেন।

মোগল যুগের পূর্ব্বের ও সমসাময়িক কুলগ্রন্থ সমূহ সাহিত্য মধ্যে গণ্য না হইলেও তন্মধ্যে অনেক সামাজিক সংবাদ পাওয়া যায়। দেবীবরের 'মেল-বন্ধনের' পুস্তকে দৃষ্ট হয় যে, 'জাত মারামারি' অন্ততঃ ব্রাহ্মণদের মধ্যে অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহার ফলে হিন্দুসমাজ বিপর্য্যস্তও হইয়াছিল। পুনঃ, রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণদের স্বহস্তে লাঙ্গল পরিচালনা করিতে দেখিয়া সেই দেশকে গালাগালি দিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখনকার সামাজিক অবস্থার চিত্র আমরা নিম্ন পুঁথিতে পাই :

"কাজীর বেটা জাফর আলী নবাই বান্দারে।
নন্দবন্দ্যোস্থতা ঘরে আফিং বিহরে" ॥

("দোষচন্দ্র—প্রকাশ" কুমুদবন্ধু মল্লিকের 'নদীয়া কাহিনীতে' উদ্ধৃত)

ইহার উল্টাদিক ঃ

"কাশীশ্বরসুত হরিহর ফুলিয়ার মুখৈটী।
ভাল বিভা হৈল তোমায় জুনিখানের বেটী" ॥

"কুলতত্ত্ব প্রকাশিণী"—৺নগেন্দ্র বসুর ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮২ উদ্ধৃত)

পুনঃ, "বৃহস্পতিজ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে ত্বকচ্ছেদ দোষঘটে।"

কবীন্দ্রের দোষতত্ত্ব প্রকাশ—ব্রাহ্মণকাণ্ডে উদ্ধৃত, পৃঃ ৮০

এতদ্বারা এই সূচিত হয় যে এই ব্রাহ্মণ এক সময়ে মুসলমান হইয়াছিলেন। দেবীবর ঘটক ১৪৮০ খৃঃ মেলবন্ধন করিয়া জাতে ঠেকোদের পারস্পারিক বিবাহের সুবিধা করিয়া দেন।

যাঁহারা হিন্দুসমাজ সনাতন বলেন এবং বর্ত্তমানের সামাজিক বাতাবরণ বেদে আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পান, আর সর্ব্ব অনুষ্ঠানই 'ব্যাদে আছে' বলিয়া দাবী করেন, এবং বলেন হিন্দুসমাজ অপরিবর্ত্তনীয় আদর্শে পরিচালিত হইতেছে, তজ্জন্য সুগোচিত যে কোন সংস্কার প্রচেষ্টার পরিপন্থী হইয়া তাঁহারা 'ধর্ম্ম ও সমাজ গেল' বলিয়া চিৎকার করেন, তাঁহাদের অবগতির জন্যই সাহিত্য হইতে এই সব ঘটনা এই স্থলে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। হিন্দুসমাজ অপরিবর্ত্তনীয়ও নহে এবং সমাজও একস্থানে স্থানুবৎ নিশ্চল হইয়া থাকে না।

এক্ষণে মোগল যুগে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক। মুকুন্দরামের সময়ে বাঙ্গলার সামন্ত-সংঘের সহিত মোগলদের বাঙ্গলার আধিপত্য লইয়া ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। এই যুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমান সামন্তেরা একযোগে মোগলের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পিতাকে "আকবর নামা" পুস্তকে বলা হইয়াছে "Srihari, the other self of Daud Khan" (শ্রীহরি হইতেছে দাউদ খাঁর আর একটী আত্মা)। এই সংযোগকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য মানসিংহ রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের উত্থান করান! তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা লাঙ্গল

ধরিতেন তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিলেন। মোগল যুগের বেশীর ভাগ জমিদারই রাঢ়ী ব্রাহ্মণ (কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 'নবাবী আমলের বাঙ্গলা' দ্রষ্টব্য)। পশ্চিম বঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণ মানসিংহের কাছ হইতে ব্রহ্মস্ব জমি প্রাপ্ত হন (কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—'মধ্যযুগের বাঙ্গলা')। ইঁহারা ভুলিয়া গেলেন যে মানসিংহ মোগলের পক্ষ হইয়া বাঙ্গলার গলায় পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাইতে আসিতেছিলেন। তাই মুকুন্দরামে আমরা দেখি তিনি তাহার পুস্তকে লিখিয়াছেন: "ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ, গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ।" হিন্দু সামন্তরা পরাজিত হইবার পর কায়স্থ জাতির পূর্ব্ব মর্য্যাদা আর রহিল না। পশ্চিমাগত 'রাজপুত' এক্ষণে বাঙ্গলায় বসবাস করিয়া উচ্চমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে মানসিংহের দুইটি বাঙ্গালী স্ত্রী ছিলেন; প্রথমটি কুচবিহারের চিলারায়ের কন্যা, দ্বিতীয়টি অপর কোন রায়ের কন্যা ('আকবর নামা' ও সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় যদুনাথ সরকারের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বে কেহ অনুমান করিয়াছিলেন ইনি হয়ত কেদার রায়ের কন্যা (খৃঃ ১৯০৫-৬ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা দ্রষ্টব্য)।

বাঙ্গলার এই রাজনীতিক ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা মুকুন্দরামে আমরা পাই না। আমরা ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারের কথা পাই; আর পাই রাজা ও জমিদারদের কর্ম্মচারীদের দ্বারা প্রজাপীড়নের কথা। আর সর্ব্বহারা গরীবদের সংবাদ আমরা বারমাস "অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা" দ্বারা বোধগম্য করি! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও বাঙ্গলায় তখন সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান হইয়াছিল, তবুও প্রাচীনযুগ হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিতেরা যে খাত কাটিয়া দিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া কবিকঙ্কণের চণ্ডীও প্রবাহিত হয়। সেই জন্য যেমন একদিকে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের বিপক্ষাচরণ করিয়া চণ্ডীর মহিমা বাড়াইবার জন্য একজন অস্পৃশ্য ব্যাধকে রাজা সাজাইয়াছেন, তেমনই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবধারা ধরিয়া কলিঙ্গ রাজাকেও খাড়া করিয়াছেন, আর কালকেতু হইয়াছে তাঁহার সামন্ত! পুনঃ, গোঁড়া বর্ণাশ্রমীয় হিন্দুসমাজের শ্রেণী লক্ষণও দেখাইয়াছেন, যথা:—

"হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচজাতি।
কি কারণে মোর গৃহে আসিবে পার্ব্বতী॥"

আবার শ্রেণী-লক্ষণ যে জাতি-লক্ষণের আকারে ভীষণ রূপধারণ করিয়াছিল তাহা আমরা কালকেতুর পুরোহিত অনুসন্ধানের সংবাদে পাই ঃ—

"পুরোধ আমার কেবা হইবে ব্রাহ্মণ।
নীচ কি উত্তম হয় পাল্যে মহাধন॥"

কবিকঙ্কণ এত realist ছিলেন যে চণ্ডীর কাছে পশুদের আক্ষেপের মধ্যদিয়া তৎকালের বাঙ্গলার রাজনীতিক-সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীনের মোহে পড়িয়া ব্যাধ কালকেতুকে সামন্তরাজা সাজাইয়াছেন এবং তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর পরামর্শে প্রাণের ভয়ে ধানের মরাইয়ের মধ্যে লুকাইতে বাধ্য করাইয়াছেন। যে সময়ে বাঙ্গলায় চাঁদরায়, কেদাররায়, সত্রাজিত, লক্ষণমাণিক্য, প্রতাপাদিত্য ও তাঁহার সেনাপতিদ্বয় শঙ্কর ও কালী স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন এবং ইহাঁদের অনেকেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সেই কালে কালকেতুকে একজন অদম্য বাঙ্গালীবীর না সাজাইবার ফলে এই শেষের চিত্র কি তৎকালের বাঙ্গালী যোদ্ধার realistic ছবি হইয়াছে? অন্যদিকে কবিকঙ্কণের পুরোবর্ত্তী মাধবাচায্যের চণ্ডীতে কবি কালকেতুকে অন্যভাবে চিত্রিত করিয়াছেন: ফুল্লরা যখন কালকেতুকে কলিঙ্গরাজের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিতে নিষেধ করিল, তখন কালকেতু বলিতেছেন ঃ

"শুনিয়া সে বীরবর, কোপে কাঁপে থর থর,
শুন রামা আমার উত্তর।…
বলিদিব কলিঙ্গরায় তুষিব চণ্ডিকামায়,
আপনি ধরিব ছত্রদণ্ড"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯)।

তৎপরে ভাগ্য বিপর্য্যয়ে কালকেতু বন্দী হইয়া কলিঙ্গের রাজসভায় প্রবেশ করে, তখন—"রাজসভা দেখি বীর প্রণাম না করে।" এই কাহিনী সেই বৈদিক

যুগের পর পুরুরাজের সহিত আলেকজাণ্ডারের সাক্ষাতের দৃশ্য আমাদের স্মৃতিপটে উদিত করিয়া দেয়! এই পার্থক্য কোথা হইতে আসে? উভয় কবির অবিদিত মনের পর্দ্দায় কোন সামাজিক ছবি লুক্কাইত ছিল তাহা আমরা জানি না, তবে মাধবাচার্য্যের চণ্ডী ১৫৭৯ খৃঃ প্রণীত হয়। কবি তাহাতে আত্মপরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন:

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাববর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার" ॥

সেই সময়ে সপ্তগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যখন বাঙ্গলার হাওয়ায় মোগলের বিরুদ্ধে চারিদিকে প্রবল যুদ্ধ চলিতেছিল, যখন "মোগলমারী" যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দু, হাড়ীজাতীয় সৈনিকেরাও পাঠানদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রণে কৃতিত্ব দেখাইতেছিল, যে যুগে প্রবাদানুসারে মানসিংহের দম্ভপূর্ণ পত্রের প্রত্যুত্তরে কেদার রায় বলিয়াছিলেন, "তথাপি সিংহ পশুরেব নান্য," আবার সে যুগে এই ব্যক্তিরই দূতকে প্রতাপাদিত্য সদর্পে বলিয়াছিলেন,

"কহ গিয়ে অরে চর, মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥
লইলাম তরবার কহ গিয়া তারে,
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে।"

বাঙ্গলার সেই 'ঝটিকা ও অশনিপাতের' যুগেই মাধবের বীর পরাজিত বাঙ্গালীর প্রতীক হইয়াছিলেন। তাই তিনি কয়েদী হইলেও গর্ব্ব ও আত্মসম্মান ত্যাগ করেন নি। কেদার ও প্রতাপের শেষ মুহূর্ত্তের সহিত তুলনা করুন। আর পরবর্ত্তী কালের মুকুন্দরাম—তিনি দুই হাত তুলিয়া উপরোক্ত মোগল রাজকর্ম্মচারীকে বলিতেছেন, "ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজে"...। এই উক্তির পশ্চাতে কি তৎকালের রাঢ়ী ব্রাহ্মণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইতেছে, আর কালকেতুকে ভীরু সাজাইয়া কি তদানীন্তনের বাঙ্গালীর defeatist mentality-র পরিচয় প্রদান করা হইতেছেনা? কিন্তু কেবল সামন্ততন্ত্রীয় গল্পে 'চণ্ডী' কাব্য পর্য্যবসিত না হইয়া সমাজের সর্ব্বপ্রকারের লোকের চিত্র

অঙ্কন করার জন্য এই কাজকে পূর্ব্বাপেক্ষা আপেক্ষিক প্রগতিশীল বলা যায়। মুকুন্দরামের সময় হইতে এবং সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত একটি বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহার প্রতিপাদ্য হইতেছে ধর্ম্মতত্ত্ব, যদিচ মধ্যে মধ্যে তৎসময়ের সামাজিক সংবাদ ইহার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সাহিত্যের মধ্যে বিশিষ্ট লক্ষণীয় অনুষ্টান যে ব্রজভাষায় হিন্দী বৈষ্ণব কবিতা সমূহের ন্যায় ইহাতে ক্রন্দনের ও হা হুতাশের রোল বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সদ্য স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হিন্দুর অবিদিত মনে যে হতাশা ও ক্রন্দনের ভাব লুক্কায়িত ছিল, তাহাই ইহার 'মাথুরে' প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সাহিত্যের আলোচ্য বস্তু দেখিয়া ইহাকে প্রগতিশীল সাহিত্য বলা যায় না, যদিচ প্রগতিপূর্ণ কবিতা ('বৈষ্ণব বন্দনা' ; দুঃখী কৃষ্ণদাসের পদ) ইহাতে আছে।

মুকুন্দরামের পরে, বড় কবি হইতেছেন ভারতচন্দ্র। সাহিত্যিকেরা বলেন, তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দর' একটি পুরাতন পুস্তকের নূতন সঙ্কলন। ইহাতেও আমরা সেই প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের ছাপ দেখিতে পাই। তাহাতে তৎকালীন মুসলমান দরবারী ছাপ অঙ্কিত আছে। ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্যকে বড় করিয়া দেখাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সেই সময়ের ঐতিহাসিক সংবাদও যৎকিঞ্চিৎ দিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সেই যুগের হিন্দুর defeatist mentalityও বাদ যায় নাই ; তাই কবি বলিতেছেন :

পাতসাহি ঠাটে, কবে কেবা আঁটে

* * *

বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া,

প্রতাপাদিত্য হারে"।

লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, এই যুগের সাহিত্যিকেরা বাঙ্গলা ভাষায় একটা স্বতন্ত্র সাহিত্য রচনা করিলেও সেই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যবাদের পাশমুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কার বাংলায় চালাইতে ছিলেন। তাই ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের সহিত মোগলদের যুদ্ধে

সৈন্যেরা "মুচড়িয়া গোঁপে শূলশেললোফে" আর "রবি-চন্দ্র-বাণ' ব্যবহার করিতেছেন। আর একজন সাহিত্যিক সংস্কৃতে (নিখিলনাথ রায়ের 'প্রতাপাদিত্য চরিত' দ্রষ্টব্য) প্রতাপাদিত্যের জীবনী রচনাকালে চন্দ্রবাণ, বায়ুবাণ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন, এই কালের মাণিক গাঙ্গুলী তাঁহার ধর্ম্মপুরাণে লাউ সেনের কীর্ত্তি গাহিতে গিয়া সংস্কৃত মহাভারতের ঢং তাহাতে ঢুকাইয়াছেন। এতদ্বারা একদিকে যেমন চিন্তাশক্তির অনুর্ব্বরতার পরিচয় প্রদানকরে, অন্যদিকে সনাতন ধারাকে অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টাও এই সব ব্রাহ্মণ লেখকদের মধ্যে ছিল বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহাদের এই প্রকারের দৃষ্টিভঙ্গী জন্যই ওসওয়াল্ড স্পেংলারের উক্তি, যে গ্রীক, হিন্দু প্রভৃতি প্রাচীনেরা Space and time অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ পথে আসে। ৮

ভারতচন্দ্রের পর, ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাব বাঙ্গলায় বিস্তারিত হয়। ক্রমে এই কোম্পানী ভারতের শাসনতন্ত্র হস্তে গ্রহণ করে এবং ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়া এই দেশের বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত করে। এই যুগে ইহাদের দ্বারা ভারতে সর্ব্বপ্রথম একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভূত হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের শাসনের যুগ এখনও চলিতেছে। এই শাসনাধীনে প্রথমে বাংলাতেই বুর্জ্জোয়া শ্রেণী বিবর্ত্তিত হয়। বাঙ্গলার সমাজের সর্ব্ব বিষয়ে কৃতিত্ব এই শ্রেণী দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত দোষ জন্য উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকেরা সর্ব্ববিষয়ে সামন্ততান্ত্রিক যুগের মোহ কাটাইতে পারে নাই। তাই এই যুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের নায়কেরা কেহ হন ভূস্বামী; তিনি কেল্লার মধ্যে থাকেন এবং তাঁহার অন্তপুঃরের স্ত্রীলোকেরা কক্ষ, গবাক্ষ ও আম্রবাগানে 'সখী-সংবাদ' করিতেছেন; না হয় তিনি একজন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত জমিদার যিনি বলেন, "আমার কাছে পুলিশ ম্যাজিষ্টর কি? আমিই জজ ম্যাজিষ্টর"। এই সাহিত্যের লেখকেরা ভুলিয়া যান যে বর্ত্তমানকালের বুর্জ্জোয়া অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী বা মোগল আমলের ভূস্বামীর স্থান আর নাই।

আর, আজকালকার জমিদারেরা ইংরেজের জন্য প্রজার কাছে খাজনা আদায়কারী এজেণ্ট মাত্র।

এই প্রকারের বাঙ্গলা সাহিত্যে একটা কাল-ব্যতিক্রম (anachronism) থাকিয়া গিয়াছে। আমরা আছি একযুগে, কিন্তু সাহিত্যের চিত্র হইয়াছে অন্য এক যুগের! ইহা সত্য বটে যে, ভারতীয় সমাজ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিক ভিত্তিতে এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু ইংরেজ শাসনের জন্য এবং কলকারখানার জন্য যে মধ্যশ্রেণী বা বুর্জ্জোয়া শ্রেণী সর্ব্বত্র উদ্ভূত হইয়াছে এবং যাহারা ভারত শাসনে ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহাদের অস্তিত্বের চিহ্ন এই সাহিত্যে কোথায়? তৎপর, আজকাল যে ভারতের সর্ব্বত্র শ্রমিক ও কৃষক জাগরণ হইতেছে, এবং তাহারাই স্বরাজ-শাসনের ভার লইবার অধিকারী বলিয়া দাবী করিতেছে তাহারও নিদর্শন সাহিত্যে কৈ? ইহার বদলে আমরা দেখি যে, হঠাৎ মাথায় টিকি ও একহাতে মনু ও রঘুনন্দন, অন্য হাতে কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তিপত্র নিয়া লোকসমাজে আবির্ভূত হইয়াছেন "বিপ্রদাস"! সমগ্র ভারতে আজ গণশক্তির জাগরণ, সর্ব্বত্র কায়েমী স্বার্থ (Vested interest) উঠাইয়া দিবার কথা ও আন্দোলন চলিতেছে, সাম্য-স্থাপনের কথা উঠিতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ও জমিদারের উচ্চ আদর্শ দেখাইবার জন্য এই Commercial-industrial যুগে বিপ্রদাসের আক্রমণের রাজনীতিক চালবাজী ওয়াকিবহাল মহলে ঢাকা থাকে নাই। আমরা জানি বনিয়াদী বা কায়েমীস্বার্থ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য বড় বড় অধ্যাপক দিয়া প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন, সেই জন্য এই যুগে বিপ্রদাস একাধারে ব্রাহ্মণ ও জমিদাররূপে আবির্ভূত হইয়া এই দুই বনিয়াদী স্বার্থের পক্ষে ওকালতী করাতে আমরা আশ্চর্য্য হই নাই, যদিচ ইহাও বাঙ্গলা সাহিত্যের কাল ব্যতিক্রমতার আর একটী প্রমাণ। আমরা বিপ্রদাসকে শ্রেণী-সংগ্রামেরই প্রতীক বলিয়া গণ্য করি। সাহিত্যকে এইরূপ ব্যবহার করার উপায় ফ্যাশিস্ট দেশসমূহেও গৃহীত হইয়াছে। এই জন্য এই প্রকারের সাহিত্য প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া গণ্য হয়।

এইরূপ আমরা দেখি যে, বুর্জ্জোয়া যুগে বাংলায় একটা বুর্জ্জোয়া সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে না। তবে আজকালকার অনেক লেখক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নায়ক ও নায়িকাকে কেন্দ্র করিয়া নভেল নাটক লিখিতেছেন। কিন্তু কেবল মধ্যশ্রেণীর নায়ক ও নায়িকার গল্প নিয়া একটা বুর্জ্জোয়া সাহিত্য গড়িয়া উঠে না। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী ও আমেরিকার সাহিত্যকে যেমন আমরা সম্পূর্ণরূপে বুর্জ্জোয়া সাহিত্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি, সেই প্রকারে সামন্ত-তন্ত্রীয় যুগের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক ও তাহার কৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠে তাহাকেই বুর্জ্জোয়া সাহিত্য বলে। রোমাঁ রোলাঁর ও জোলার পুস্তক সমূহে, আমেরিকার এমারসন, হুইটিয়ার, লংফেলো, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রভৃতি এই সাহিত্যিক যুগের প্রতীক। সমাজ সম্পূর্ণরূপে মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থোদ্দেশে চালিত হইলে সেই সমাজের সাহিত্যও নিজের নূতন খাত সৃষ্টি করে।

অবশ্য বাঙ্গলার সমাজ এখনও সম্পূর্ণভাবে "বুর্জ্জোয়াত্ব" প্রাপ্ত হয় নাই। সেই জন্য আমরা একটা খাঁটি বুর্জ্জোয়া সাহিত্য এখনও উদ্ভূত হইতে দেখি না। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাহিনী নিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহা এখনও প্রাচীনের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। বুর্জ্জোয়া সাহিত্যে সাধারণতঃ আধুনিক লোকের চরিত্র অঙ্কিত হয়। তাহারা প্রাচীনের মোহ কাটাইয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশলে জগতের ধনসম্পদ ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত! এই জন্য প্রাচীন আইন, বিধিনিষেধ, সমাজ-বন্ধনচ্ছিন্ন করিয়া সমাজকে নূতন ছাঁচে গড়িতে চায়! দৃষ্টান্তস্বরূপঃ আমেরিকা, ফ্রান্স, কেমালের তুর্কি প্রভৃতি। কিন্তু আমাদের হালের সাহিত্যে সামাজিক আবর্ত্তনের সেই সুর কোথায়? তাই "পণ রক্ষার" মধ্যে দেখি যে, নায়ক যৌবনে সমাজ সংস্কার কর্ম্মে উৎসাহ প্রকাশ করিলেও যখন তাঁহার "তেতালা বাড়ী হইল" তখন কোন মতে পারিবারিক পূর্ব্ব ইতিহাসের এই অধ্যায়কে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্য তাঁহার রোখ চাপিয়া উঠিল। নিজের মেয়েটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন এই তাঁর জেদ...শিক্ষিত সৎপাত্র না হইলেও চলে, কন্যার চিরজীবনের

সুখ বলিদান দিয়াও তিনি সমাজ-দেবতার প্রসাদ লাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। আবার 'হালদার গোষ্ঠী' পুস্তকে পড়ি—"বড় ঘরের দাবী কি সামান্য দাবী! তাহার যে নিষ্ঠুর হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তরুণী স্ত্রীর কিংবা কোনো দুঃখী কৈবর্ত্তের সুখ দুঃখের কতটুকুই বা মূল্য?" ইহাতে আমরা সেই পুরাতন সামন্তযুগেরই প্রতিধ্বনি শুনি। আবার, "চোখের বালি"র মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঘরের কথা পাই, "এডিপুস কমপ্লেক্স" তথায় বিরাজ করিতেছে। তাহার অনুসরণ ও পশ্চাৎ অনুসরণের পর, victim (বলি) বিনোদিনী বলিতেছে, "ছি ছি, এ কথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখন হইতে পারে না! ছি, ছি, এ কথা তুমি মুখে আনিও না।" আবার সে বলিতেছে, "ছি, ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে! তোমার ঔদার্য্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি ওকাজ করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না।" এই পুস্তকে এডিপুসের victim স্ত্রীলোক হইল কাশীবাসিনী আর পুরুষ গোঁফে চাড়া দিয়া সমাজে মাননীয় হইয়া রহিল। এই নভেলেও পুরুষ-প্রাধান্যযুক্ত সমাজের (androcentric theory of society) ছবি প্রদত্ত হইয়াছে, যদিচ এই পুস্তকের যুগেই নরতাত্ত্বিক ও জীবতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিকগণ স্ত্রীলোক ও পুরুষের সমানাধিকারের তথ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এই প্রকারে দেখি যে, আমাদের হালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকেরা মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর জীবন অঙ্কিত করিতে যাইয়া সনাতনী খাতে নিমজ্জিত হইতেছেন। এখনও এক ভাবে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে প্রাচীন "অবধূত গীতা" ও শঙ্করাচার্য্যের স্তোত্র বা "নরকস্য দ্বারং নারী" প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তবে উপস্থিত যুগে যে এক প্রকার নূতন সাহিত্যের উদয় হইয়াছে তাহা কতকটা বুর্জ্জোয়া সাহিত্যের অভিমুখে যাইতেছে মনে হয়। কিন্তু ইহা যেন কেবল "এডিপুস কমপ্লেক্সের" অনুসরণ করিয়াই পরিশ্রান্ত হইতেছে। ইহাতে সমাজকে

আধুনিক ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার কোন আদর্শ ই প্রদত্ত হইতেছে না। ইহাতে 'জনের' সন্ধান বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না—'গণের' তো নয়ই। কেবল পাওয়া যায় যৌন-সম্বন্ধের কাহিনী। কিন্তু যৌন সম্বন্ধই সমাজের একমাত্র অনুষ্ঠান নয়। এই সাহিত্যে সমাজের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির আলোচনা হইতেছে না। অনুমান হয় এক প্রকারের ইউরোপীয় ভাবধারা বাঙ্গালী সমাজে আরোপিত করিয়া একটা অস্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা গঠন করা হইতেছে। যৌন সম্বন্ধের শুধু বিচার করিলেই পুরুষ ও নারীর সব প্রশ্নের সমাধা হয় না। আবার নারীর ক্রমাগত স্বামী বা প্রণয়ী পরিবর্ত্তন করাই তাহার সামাজিক 'শেষ প্রশ্ন' নয়। অন্যপক্ষে কৌমগত বৈদিক বা উপনিষদের যুগের আদর্শ এই যুগের স্ত্রীলোকের সমস্যা বিষয়ের 'শেষ উত্তর' নহে। প্রথমোক্ত আদর্শটি কোন সমাজের আদর্শ তাহা অজ্ঞাত, অন্ততঃ সাম্যবাদী গণশ্রেণী সমাজে তাহা নয় ইহা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। এই জন্য এই সাহিত্যকে পূর্ণভাবে বুর্জ্জোয়া সাহিত্য বলা যাইতে পারে না। খুব সম্প্রতি একটী নূতন ধরণের সাহিত্য উদিত হইতেছে—তাহা গণশ্রেণীর জীবনের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া লিখিত হইতেছে। এই বিষয়ে দু'একটী সুন্দর পুস্তিকাও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে একটু realistic ছাপ আছে, কিন্তু ইহাকে গণসাহিত্য বলা যায় না। পুস্তকে গণশ্রেণীর জীবন সম্বন্ধে লিখিলেই তাহা গণ সাহিত্য হয় না।

গণশ্রেণীর দুঃখ ও দারিদ্র্য, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কথা, হৃদয়ের বেদনা ও সুখেচ্ছার কথা নিয়া এবং তাহাকে সমাজের কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার দৃষ্টিকোণ নিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে তাহাকে গণ সাহিত্য বলা যায়। ভারতে অর্থ-নীতিক কারণে একটা গণ-আন্দোলন চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যেও একটা কাল-ব্যতিক্রম আছে। যে দিন গণ-শ্রেণীর লোক সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিবে, সেইদিন একটা গণসাহিত্য উদ্ভূত হইবে।

আমাদের সাহিত্যের পরিস্থিতির কথা যৎসামান্যভাবে এই স্থলে আলোচনা করা গেল। মোটের উপর দেখি যে আমাদের সাহিত্যে একদিকে সনাতনী

খাত প্রবাহিত হইতেছে, অন্যদিকে বৈদেশিক ভাব আসিতেছে। ইহার কারণ আমাদের সাহিত্যে realism-এর অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে। আমরা space and time-কে ঠিক ভাবে ধরিয়া চলিতেছি না। তাই একদল নূতন শ্রেণীর লেখকের প্রয়োজন, যাঁহারা বিভিন্ন স্তরের যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন ও তাহার পরিবেশন করিবেন এবং সাহিত্যকে কাল-ব্যতিক্রমের অসামঞ্জস্যের কবল হইতে রক্ষা করিবেন। সাহিত্যে প্রগতি আনিতে হইলেই এগুলির বিশেষ প্রয়োজন। যাহাতে সমাজ যথার্থই অগ্রগতিশীল হয় তাহাই প্রগতি লেখকদের লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্য ও সমাজ

(২)

পলাসীর যুদ্ধের পর, ইংরেজ শাসনের যুগ আরম্ভ হয়। এই যুগের রাজ-নীতিক-অর্থনীতিক কারণ বশতঃ দেশজ সভ্যতার ক্ষেত্রে বিদেশীয় তৎকালীন কৃষ্টি রোপিত হয়। এতদ্বারা ভারতীয় মনে 'দ্বন্দ্বভাবের' (antithesis) উদয় হয় এবং পরিণাম স্বরূপ একটা 'সম্মিলন' (Thesis) সৃষ্টি করিবারও প্রচেষ্টা হয়। এই কর্ম্মের জন্যই সমাজ শরীর মধ্য হইতে রামমোহন রায় ও তাঁহার দ্বারা স্থাপিত "ব্রহ্মসভা" রূপ প্রতিষ্ঠানের উদয় হয়। রামমোহন ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন এবং তদ্বারা তিনি বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত বলিয়া কথিত হয়। এই অনুপ্রেরণা দ্বারা তিনি পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতিপাদ্য "ব্রাহ্মধর্ম্ম" এবং জীবনের কর্ম্ম দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে তিনি সামন্ততান্ত্রিক অতীতকে ভুলেন নি এবং তাহার সহিত সম্বন্ধও বিচ্ছিন্ন করেন নি। তৎপর, "ব্রহ্মসভা" "ব্রাহ্মসমাজে" পরিণত হয়; এই সময়ে ইংরেজী শিক্ষিত একদল তরুণও দেশে উদিত হয়। ইহারা হালফ্যাসানের ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচিত হন এবং তৎকালীন ইংরেজী Unitarianism নামক ধর্ম্মমতবাদের সহিত পরিচিত হইতে থাকেন। ইংরেজী এই দলের সহিত পূর্ব্ব হইতেই রামমোহনের যোগ স্থাপন ছিল। ক্যালভিনের দলপ্রসূত এবং "পিউরিটান" নামে পরিচিত ইংরেজ সামাজিক দল হইতেই এই দলের উদ্ভব হয়। এই জন্য এই দলের আদর্শ ছিল "বুর্জ্জোয়া ডেমোক্রাসী"। এই মতের প্রভাব তৎকালীন এক দল শিক্ষিত বাঙ্গালী তরুণদের উপর প্রসারিত হয়। এই প্রকারের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুক্তিবাদী তরুণদের নিয়া ৺অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত "আত্মীয় সভা" স্থাপিত

করেন। পরে মতানৈক্য বশতঃ ৺কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে এই দলের অধিকাংশ যুবক পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহির্গত হইয়া 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত করেন। সেই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজের জীবন নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই সময়ে হ্যামিল্টনের মনস্তত্ত্বের Intuition মত, ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ও তৎকালীন প্রগতিশীল ইংরেজ ভাবুকদের রাজনীতিক ও সামাজিক মতবাদসমূহ বাঙ্গলার শিক্ষিত যুবকদের মনে বিশেষ ভাবে অঙ্কিত হইতে থাকে। এই ক্রিয়াস্বরূপ ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা যে সাহিত্য সৃষ্ট হয় তাহা অতীতের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়। ব্রাহ্মসমাজ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ধর্ম্মমত ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ ত্যাগ করিয়া নূতনরূপে নিজের জীবন গঠিত করিতে থাকে। কেশবচন্দ্র সেনের "নবসংহিতা" তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ব্রাহ্মসমাজকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলে ইহাই উপলব্ধি হইবে যে ইহা ভিক্টোরীয় যুগের একটি ইংরেজী বুর্জ্জোয়া প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় সংস্করণ মাত্র! ব্রাহ্মসমাজদ্বারা যে সাহিত্য সৃষ্ট হয় এই জন্যই তাহাতে আমরা সামন্ততান্ত্রিক যুগীয় গল্পের অবতারণা পাই না। তাহা দ্বন্দ্বপূর্ণ (polemical) প্রচারকর্ম্মের উদ্দেশ্যে লিখিত বলিয়া, তন্মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের কাহিনী পাওয়া যায়। পুনঃ, মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকসমূহদ্বারা ব্রাহ্মসমাজ সংগঠিত বলিয়া আমরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনের চিত্র ইহাতে পাই। ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর "যুগান্তর" নামক নভেল ইহার একটী দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এতদ্বারা ইহা বলা যায় না যে ব্রাহ্ম সাহিত্য বুর্জ্জোয়া সাহিত্য। বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী ইহাতে নাই, যদিচ ইহা মধ্যবিত্তশ্রেণীর ব্রাহ্মসমাজ প্রসূত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংস্কারকের জীবনীর চিত্র সম্বলিত সাহিত্য। ব্রাহ্মসমাজের ছাপ ইহাতে আছে। তত্রাচ, ইহা প্রাচীনখাত হইতে বহির্গত হইয়া, সমাজের সম্মুখে নূতন আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছে বলিয়া ইহাকে আপেক্ষিক প্রগতিশীল বলা যায়।

এই যুগে অন্যান্য লেখকেরাও উদ্ভূত হন। তাঁহারা স্বদেশপ্রেমিক সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। রঙ্গলালের "পদ্মিণী" উপাখ্যান, অন্যান্যদের লিখিত "পুরুবিক্রম" নাটক, "বঙ্গাধিপ পরাজয়", প্রভৃতি নাটকে তুর্কি-মুসলমানদ্বারা

হিন্দুর পরাজয় কাহিনী চিত্রিত করিয়া স্বদেশপ্রেমের বন্যা বহাইয়াছিলেন। এই সঙ্গে আরব দ্বারা সিন্ধুদেশ আক্রমণ, আলেকজাণ্ডার দ্বারা ভারত-আক্রমণ উপলক্ষ করিয়া নানা স্বদেশপ্রেম পূর্ণ গানও রচিত হয়। পুনঃ, বর্ত্তমান অবস্থা উল্লেখ করিয়া "ভারত-বিলাপ" নাটক লিখিত হয় (পুলিশ ইহার অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল)। কিন্তু তৎকালীন শিক্ষিত হিন্দুর মনস্তত্ত্বে, প্রকাশ্য ভাবে ইংরেজ শাসনের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার সাহস হয় নাই বলিয়া অর্থাৎ নবোত্থিত হিন্দু বুর্জ্জোয়া সমাজ ইংরেজ শাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় নাই বলিয়া, তাহারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পুরাতন ও বিস্মৃত যুগের বিদেশী মুসলমান বিজেতৃ বর্গের বিপক্ষে নিজেদের স্বদেশপ্রেমের ফোয়ারা ছাড়িয়া দিলেন। এই সূত্র ধরিয়াই পরে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" এবং বঙ্কিম চন্দ্রের "আনন্দমঠ" লিখিত হয়। ইঁহারা ভারতবর্ষ অর্থে "হিন্দু-ভারত"ই বুঝিয়াছিলেন, তাহার বাহিরে ইহাঁদের রাজনীতিক কল্পনা যাইতে পারে নাই। ইঁহারা প্রাচীন কালের বিদেশী মুসলমান ও দেশজ এবং হিন্দুর জ্ঞাতি মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাননি। একটা 'নেশান' যে নানাপ্রকারের রাজনীতিক, জাতিতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক ঘাতপ্রতিঘাতের সংজাত ফলস্বরূপ তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই। অবশ্য, এই জ্ঞান তৎকালীন ইউরোপেও বিশেষভাবে ছিল না, এখনও অনেকের মধ্যে নাই! "যেমন গুরু, তেমন শিষ্য"-রূপ ফল জনিত জ্ঞানদ্বারা তৎকালের হিন্দু লেখকেরা 'একজাতিত্ব' অর্থে একরক্ত ও একধর্ম্ম ও আচার সম্বলিত লোকসমষ্টিকে বুঝিতেন (এখনও অনেকে তাই বুঝেন)। অবশ্য এই যুগে "হালী" নামে বিখ্যাত মুসলমান কবিও নেশনের এই প্রকারের অর্থ বুঝিয়াছিলেন। যাহাই হউক, এইসব লেখক ইংরেজের বিপক্ষে কিছু বলিবার সাহস না থাকায় স্বদেশপ্রেমের বন্যার স্রোতে মুসলমানকে স্বদেশের শত্রু কল্পনা করিয়া, তাহার প্রতি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম আসলে "স্বধর্ম্মীপ্রেমে" পর্য্যবসিত হয় এবং ভবিষ্যতে ইহার পরিণাম শুভ হয় নাই। এই সময়ের শেষভাগে দীনবন্ধু মিত্রের "নীল-দর্পন" লিখিত হইয়া নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী লোক সমাজের চক্ষুগোচর করা হয়। ইহাতে

সামন্ততন্ত্রিক গতানুগতিক ধারা নাই, আছে বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত নভেলাকারে লিখিত কাহিনী। এই পুস্তক আমেরিকার হ্যারিয়েট স্টো-র "Uncle Tom's Cabin" নামক নিগ্রো গোলামদের করুণ জীবনের কাহিনী-পূর্ণ পুস্তকের তুল্য মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়াছে। এইজন্য এই পুস্তক 'প্রগতিশীল' বলিয়া গণ্য। পুনঃ "সধবার একাদশী" তৎকালীন কলিকাতার ধনী গৃহের অপদার্থ পুত্রের চিত্র, নিমচাঁদের ন্যায় শিক্ষিত অকর্ম্মণ্য ও মদ্যপের চিত্র অঙ্কণ করিয়া, দীনবন্ধু তৎকালের সমাজের একাংশের একটী চিত্র লোকের চক্ষুগোচর করিয়াছেন। আবার নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের "বেল্লিক-বাজার" নামক নাটকে তৎকালীন ডাক্তার, উকিল, ধনী আর দু'কড়ির ন্যায় মদ্যপের জীবন অঙ্কণ করিয়া সমাজের একটী অন্তঃস্বলিলা ধারা লোকের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। "গিরীশচন্দ্র, বর্ণিত বিষয়বস্তু তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া স্থানে স্থানে স্বল্পবিস্তর ত্যাগ করিয়া চরিত্রানুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন" (শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত 'গিরীশচন্দ্রের মন ও শিল্প'); 'বেল্লিক-বাজার'এ যে দু'কড়ি সেনের কথা আছে, সেই ব্যক্তি বাস্তবিক কলিকাতার একজন মদ্যপ ছিল। 'গিরিশচন্দ্র', দু'কড়ি সেনের জীবনের ঘটনা চৌদ্দ আনা বাদ দিয়া দুই আনা হিসাবে তাহাকে 'বেল্লিক-বাজারে'-এ অঙ্কিত করিয়াছেন। এই প্রকার "প্রফুল্ল" নাটকে তিনি তৎকালীন সামাজিক ঘটনার একটী চিত্র দিয়াছেন। যখন ইংরেজী সাম্রাজ্যবাদ ভারতে নিজের গভর্ণমেণ্ট চালু করিবার জন্য স্বীয় দেশানুযায়ী নানাপ্রকারের শিক্ষা বাঙ্গালীকে প্রদান করিয়া এতৎদেশীয় সমাজে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উদ্ভব করায়, সেই সময়ে "ওকালতী" একটী বিশিষ্ট বৃত্তি রূপে গণ্য হয়। কিন্তু এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অনেকে কি প্রকারে আইনের ফাঁকী দিয়া জুয়াচোর হইতে শিক্ষালাভ করেন, কি প্রকারে আইনের জুয়াচুরী দ্বারা আত্মীয়দের প্রবঞ্চনা করেন গিরীশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" নাটক সেই সময়ের একটী সামাজিক চিত্র প্রদান করে। এই বিষয়ে গিরীশচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, "না, সব চরিত্রই আমার নিজের চোখে দেখা। যোগেশ-চরিত্র সত্য ঘটনা। আমার কাছে ঐরূপ একজন ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আসতো। দু'চার

আনা নিয়ে চলে যেত। তাহার জীবনের ঘটনা অনেকটা ঐরূপ ঘটেছিল (ঐ পৃঃ ১৩)।"

এই সময়ের তারকচন্দ্র গাঙ্গুলীর "স্বর্ণলতা" সমাজের আর একটী চিত্র প্রকাশ করে। এই সব নভেল মধ্যবিত্তশ্রেণীর ও সাধারণের জীবনী অবলম্বনে রচিত হয়। এই গুলিতে realistic ছাপ আছে। এইগুলি সাময়িকভাবে প্রগতিশীল সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইবে।

ইহার পর আসে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীন চন্দ্র সেনের কবিতা পুস্তক সমূহ। ইহাতে অনেক জাতীয়তাবাদী কবিতা আছে। কিন্তু পুস্তকগুলির প্রতিপাদ্য প্রাচীন কাহিনী এবং নূতন তথ্য সমূহ নাই। এইজন্য ইহাকে প্রগতিশীল বলা যায় না। অপর পক্ষে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের "আত্মোৎসর্গ চরিত্রাবলী", "জীবনোচ্ছ্বাস", ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি ও আর্নিটার জীবনী সমূহ দেশের তরুণদের সম্মুখে নূতন আলোক প্রদর্শন করে। এই-গুলির রস ও রূপ অন্য প্রকারের এবং অসাম্প্রদায়িক ও সামন্ততান্ত্রিক ভাববিমুক্ত বলিয়া ইহা প্রগতিশীল সাহিত্য মধ্যে গণ্য হয়।

ইহার পর, বড় সাহিত্যিক হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার প্রতিভা জীবনের নানাক্ষেত্রে বিকশিত হইয়াছে। "রাজা ও রাণী"তে যেমন তিনি সামন্ততান্ত্রিক গল্পের অবতারণা করিয়াছেন এবং সেই যুগানুযায়ী রস ও রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্রূপ "গল্পগুচ্ছ" পুস্তকের গুটিকয়েক কাহিনী জনসাধারণের জীবনী অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। এইগুলি অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল বলিয়া গণ্য হইবে। অন্যপক্ষে "রক্ত-করবী"তে তিনি পুঁজীবাদের ভীষণ শোষণ চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইতে বহির্গত হইবার উপায় তিনি দেখাইতে পারেন নি। এই স্থলে তিনি গণ্ডীবদ্ধ হইয়াছিলেন। তদ্রূপ "গোরাতে" তিনি প্রগতি প্রদর্শন করিতে পারেন নি। এইজন্য বলিতে হইবে যে, তাঁহার সাহিত্য বুর্জোয়া সাহিত্য মধ্যে গণ্য নয়।

তৎপরের বড় সাহিত্যিক ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার বেশীরভাগ নভেল গরীব মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনী ও অভিজ্ঞতাবলম্বনে রচিত হয়। ইঁহার

বৈশিষ্ট হইতেছে, স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করা, তাহাদের তরফের কথা কিছু শুনান; আর গরীব মধ্যবিত্তশ্রেণীর (Petty bourgeoisie) মধ্যে যে মনস্তত্বের বিকাশ চলিতেছে তাহা উদ্ঘাটন করা। এই জন্য এইসব পুস্তকে আমরা পূর্ব্বের সাহিত্যশ্রেণী অপেক্ষা নূতন সুর ও একটী নূতন স্তরের মনস্তত্ত্বের সহিত পরিচিত হই। কিন্তু তাঁহার শেষের "বিপ্রদাস" পুস্তকে সেই প্রগতির সুর আমরা শুনিতে পাই না। কেহ কেহ অনুমান করেন তাঁহার নবশ্রেণী লক্ষণ ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহার পর, এক্ষণে একদল নূতন সাহিত্যিক শ্রেণী উত্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা 'জন' ও 'গণে'র সংবাদ সাহিত্যের মধ্যে দিবার চেষ্টা করিতেছেন। মধ্যবিত্তশ্রেণীর নায়ক, নায়িকা, কৃষক ও মজুরের জীবন এই সাহিত্যের প্রতিপাদ্য। ইহা বর্জ্জোয়া সাহিত্য নয়, কিন্তু আপেক্ষিক প্রগতিশীল।

সাহিত্যে সমাজ-চিত্র

(১)

আজও এদেশে এরূপ একটা ধারণা আছে যে সাহিত্য কেবল অলঙ্কার ও কাব্যের ব্যাপার ; উহা কেবল কবি বা লেখকের হৃদয়োচ্ছ্বাসের সহিত জড়িত। লেখক কেবল Art for art's sake গল্পে মানব চরিত্র ফুটাইয়া তোলেন। সাহিত্যের সহিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক কারণ ঘটিত রাজনৈতিক, সামাজিক কার্য্যকারণের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু তাঁহারা এই কথা স্বীকার করিতে চাহেন না যে, সাহিত্য ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার (Dialectical Materialism) অধীন ; এবং তজ্জন্য সাহিত্যে সমকালীন সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়। আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতেই সাহিত্যের স্বরূপ কি, উহার লক্ষণ কি—এগুলি সম্পর্কে সকলের ধারণা বোধ হয় এক নয়। সাহিত্যে যে সমাজের চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়—এই বিষয়ে এখন দ্বি-মত নাই। এইজন্যই কোনও একটী দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, দেশের লোকের রাজনৈতিক, সামাজিক ও কৃষ্টিগত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমূহ সম্বন্ধে তথ্যাদি জানিতে হইলে আলোচ্য দেশের অধিবাসীদের সাহিত্যপাঠে উহা অন্ততঃ কথঞ্চিৎ অবগত হওয়া যায়। সুতরাং যে-জাতির কোন যুগের লিখিত ইতিহাস থাকে না তাহাদের সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই যুগের ইতিহাসের সংবাদ পরিষ্কার করা সম্ভব হয়। হোমারের "ইলিয়াডে" গ্রীকদের বর্ব্বর যুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ইতিহাসের সন্ধান মিলে ; আমাদের প্রাচীন বর্ব্বর যুগের কৌমাবস্থার সংবাদ বেদে পাওয়া যায়, মহাভারতে সামন্ততান্ত্রিক যুগের চিত্র চিত্রিত হইতে দেখা যায় এবং হালের সোভিয়েট রুষের সাহিত্যে তথাকার বর্ত্তমান প্রলেটারিয়েট (Proletariate) সমাজের ছবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এইখানেই বোধ হয় কাহারও মনে খটকা

বাঁধে! কেহ কেহ হয়তো আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিবেন যে সমাজের আবার বর্ব্বর ও সভ্য অবস্থা কি, কৌমগত ও সামন্ততান্ত্রিক যুগ কি? সমাজ তো অখণ্ড; ইহার মধ্যে কৌমাবস্থার (Tribal stage) সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং প্রলেটারিয়েট সমাজ কি? এই অখণ্ড সমাজের ধারা ও সনাতন, তাহার আবার বিভিন্ন যুগই বা কি?

মানব সভ্যতা বিভিন্নযুগের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়। তাহার উন্নতি কখন বিবর্ত্তন, কখন আবর্ত্তন দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। সমাজ কখনও স্থাণুবৎ স্থিতিশীল নহে; কাজে কাজেই সনাতন ধারা বলিয়া কোন অনুষ্ঠান সমাজ-তত্ত্বের মধ্যে স্থান পায় না। ইহা ভিন্ন সমাজও অখণ্ড নহে। যাহারা Social-Unitarian, অর্থাৎ সামাজিক একত্ববাদীয় মত পোষণ করেন তাহাদের নিকট এই সকল তত্ত্ব অত্যন্ত অপ্রিয়। কিন্তু জাতিতত্ত্ব বলে যে, মানবজাতির অর্থ-নীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সামাজিক পরিবর্ত্তনও সংঘটিত হয়। যে আদিম মানব বনের ফলমূল ও নদীর শামুক, গুগলী আহরণ করিয়া উদর পূর্ণ করিত এবং গিরি-গহ্বরে অবস্থান করিত, তাহাদেরই বংশধরেরা যখন জগতে "সপ্তাশ্চর্য্য" নির্ম্মাণ করে তখন উভয়ের অর্থনীতিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যে ভারতের অতি প্রাচীন-কালের মৃত দেহকে জালায় ভরিয়া সমাহিত করা হইত, সেই দেশের লোক যখন তাজমহল সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করে, তখন উভয় লোক সমষ্টির মধ্যে যে অর্থনীতিক তারতম্য ঘটিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার আর কোন উপায় নাই। অর্থনীতিক তারতম্য ঘটিলে যে সামাজিক, তজ্জন্য কৃষ্টিগত বিভিন্নতা উপস্থিত হয়—ইহা জাতিতত্ত্ব ও সামাজতত্ত্ববিদগণ স্বীকার করেন। সুতরাং সনাতন পদ্ধতি ও ধারা বলিয়াও কোন সামাজিক সূত্র নাই, এবং থাকিতে পারে না। সমাজ-তত্ত্ব বলে, মানবসমাজের মধ্যে আর্থিক উন্নতি, তজ্জন্য কৃষ্টির উৎকর্ষ সমাজের একটা লোকসমষ্টির ভোগের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়, অর্থাৎ যে লোকসমষ্টি রাষ্ট্রের পরিচালকরূপে বিদ্যমান থাকে তাহারাই সেই ক্ষমতার জন্য সমাজের শীর্ষদেশে অবস্থিত থাকে এবং সর্ব্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধির ভোগ দখল

করিতে থাকে। এই জন্য বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি হয় এবং এই বিভিন্ন স্তর অর্থনীতিক অবস্থার বৈষম্য ও বিভিন্নতা হেতু রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকার অধিকারসমূহ ভোগ করে,—তজ্জন্য সমাজেও বৈষম্য এবং তারতম্যের সৃষ্টি হয়। কাজেই বলিতে হয় যে, সমাজ একটি অখণ্ড বস্তু নহে; ইহাতে নানাপ্রকার স্তরভেদ রহিয়াছে—আবার ইহার মধ্যে চক্রভেদও আছে। এই সকল কারণ বশতঃ সমাজের কোন একটি লোকসমষ্টি বা একটি স্তর অথবা তাহার একটি চক্র বা মণ্ডলী, রাষ্ট্রের অন্তর্গত গোটা সমাজের প্রতীক বা প্রতিনিধি নহে।

এইরূপে বিভক্ত সমাজের কৃষ্টিগত আদর্শ এবং ফলও এক নহে। কৃষ্টি উহার স্রষ্টার মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করে। সমাজ যখন শিক্ষাদীক্ষা, চর্চ্চা ও আদর্শে এক নহে তখন কৃষ্টিও এক হইতে পারে না। যে-বস্তুকে আমরা একটা দেশের পরিচায়ক হিসাবে গণ্য করি তাহার বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করিলেই পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যাইবে যে উহা যুগ ও স্তরভেদ দোষে দুষ্ট। এই কারণেই সমাজের প্রত্যেক স্তরের কৃষ্টি ভিন্ন এবং তাহার প্রতীকও বিভিন্ন। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সাহিত্যে সমাজের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। কিন্তু সমাজ যখন এক অবিভক্ত অখণ্ড বস্তু নহে, বরং স্তরভেদে বিভক্ত তখন সাহিত্যেও অনুরূপ প্রতিবিম্বই প্রতিফলিত হইতে দেখা যাইবে। এইজন্য সাহিত্য সমাজের এক অখণ্ডরূপের পরিচয় প্রদান করে না; সাহিত্যে সমাজের স্তর বা শ্রেণীগত মনস্তত্ত্বই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সমাজ শ্রেণীভেদে বিভক্ত হইয়া একটি বিশিষ্ট-শ্রেণী দ্বারা শাসিত হয় এবং কৃষ্টি সেই শ্রেণীরই স্বরূপ প্রদর্শন করে। সেইজন্য সাহিত্য একটা দেশের গোটা সমাজের প্রতীক না হইয়া একটী বিশেষ শ্রেণীর প্রতিভূ স্বরূপ হয়। অতএব সাহিত্যকে "শ্রেণীগত সাহিত্য" (Class literature) বলা হয়। অর্থাৎ সাহিত্য সেই শ্রেণীর কৃষ্টি, আদর্শ ও মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করে, যে শ্রেণী রাষ্ট্রের শাসকরূপে অধিষ্ঠিত থাকে। এখানে প্রশ্ন উঠে—এরূপ হয় কেন? ইহার

কারণ এই যে, লেখক সমাজগত ভাবে যে-স্তর বা শ্রেণীর মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন এবং যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাহারই ভাবধারা ও আদর্শকে সনাতন বা শাশ্বত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের লেখনীমুখে সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলেখ্যই ফুটিয়া উঠিবে, তাঁহাদের রচনাবলীর মধ্যে ঐ শ্রেণীরই ভাব ও আদর্শ বিজ্ঞাপিত হইবে। লেখকের লেখা তাঁহার জাতীয় কৃষ্টির একাংশ মাত্র; কিন্তু কৃষ্টি আপেক্ষিক— তাহা যুগ ও শ্রেণীর প্রভাবে প্রভাবিত। এইজন্য সাহিত্যিকের রচনা যুগ ও শ্রেণীগত আদর্শের সহিত এক ও অভিন্ন (identified) হইয়া থাকে।

এতদ্দারা পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে সাহিত্য শ্রেণীগত; ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে শ্রেণীগত আদর্শই প্রকাশ পায় এবং তাহা সমাজের সমস্ত লোকের মনোগত ভাবসমূহের পরিচায়ক নহে। ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন হইল হোমারের ইলিয়াড (Iliad) ও ওডিসী (Odyssey); তাহাতে গ্রীকজাতির আদিম যুগের কৌমগত অবস্থার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং তাহাতে অর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সামন্ততান্ত্রিক যুগের আচার ব্যবহার, অনুষ্ঠানসমূহ প্রতিবিম্বিত হইতে দেখা যায়। হোমারে একদিকে যেমন আদিম সমাজের আলেখ্য দেখা যায় না, তেমনি গরীব ও অধস্তন শ্রেণীর লোকদের চিত্রও তাহাতে দেখা যায় না। অবশ্য যুদ্ধের কয়েদী, গোলাম অথবা ক্রীতদাসের সংবাদ হোমারে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের সমাজের ও মনস্তত্ত্বের প্রতীক ইলিয়াড্ বা ওডিসী নয়। এই দুই মহাকাব্য সামন্ততান্ত্রিক যুগের বীরগণের সমাজের ও তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ এবং আদর্শের আলেখ্য প্রকাশ করে। ইহাতে অন্যান্য শ্রেণীর সুখদুঃখের সংবাদ পাওয়া যায় না। এইরূপে ওডিসীর আদর্শে লিখিত রোমান ভার্জ্জিলের ইলিয়াড্ মহাকাব্য ও টেরেন্স প্রভৃতির কবিতায় রোমের শাসক-শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়; তাহাতে রোমান সাম্রাজ্যের "জন" বা "গণে"র কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে পালেষ্টিনের ইহুদী জাতির সুখ-সমৃদ্ধির সময়ে 'গণে'র প্রতিনিধিত্ব করিয়া ইজিখিয়েল, জেরেমিয়া, মালেখি প্রভৃতি কয়েকজন পয়গম্বর বড় সোরগোল

উপস্থিত করেন। তৎকালীন ইহুদী সমাজের শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিচয় এই সকল পয়গম্বরদের লেখনী ও বচনের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়া অবশেষে বাইবেলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ইউরোপের মধ্যযুগে যখন সভ্যতা আবার মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল তখন দেখা যায় যে পশ্চিম ইউরোপের রাজদণ্ড উত্তরাগত অসভ্য জার্ম্মাণ জাতীয় ফ্রাঙ্কদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। তাহারা "পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য" নাম দিয়া প্রাচীন রোমের উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত। এই-জন্য পশ্চিম ইউরোপের নেতৃত্ব তাহাদের হাতে দিলেও তাহাদের আদর্শে পরিচালিত হইত। ইহারা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজনীতি পরিচালনা করিত।

এই যুগের সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক লক্ষণসমূহ—যেমন স্বামিধর্ম্ম (noblesse oblige), বীরধর্ম্ম (chivalry) ও সমাজের শ্রেণীভেদ, বৈরী (blood-feud) প্রভৃতি বিশেষভাবে চিত্রিত হইতে দেখা যায়। এই সামন্ততান্ত্রিক যুগের বড় সাহিত্যিক দল ছিল দক্ষিণ ফ্রান্সের চারণদল (Troubadours); ইহাদের মধ্যে নরমাণ্ডীর ডিউক ও ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় রবার্টের চারণ রোঁলা (Rolland) ছিল অগ্রণী। রোলাঁর মুখ দিয়া সামন্ততন্ত্রকে সমাজের আদর্শ বলিয়া জাহির করা হয়। তিনি বলিতেন—"বশ্যতা স্বীকারকারী প্রজার কর্ত্তব্য হইতেছে তাহার মনিবের জন্য যুদ্ধ করা" (It is the duty of the liegeman to fight for his liegelord)। এই স্বামিধর্ম্ম ও স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ছিল সামন্ততান্ত্রিকযুগীয় রাষ্ট্রের লোকের আদর্শ। কিন্তু Troubadours-দের মুখ দিয়া তৎকালীন "জন" (Third Estate) ও "গণ" (Serfs) শ্রেণীদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। তখনকার ইউরোপীয় সমাজের অধিকাংশ লোকই ছিল নিম্ন-শ্রেণীর—তাহারা হয় গোলাম, না হয় অর্দ্ধ-গোলাম ; সার্ফ, না হয় স্বাধীনতা-প্রাপ্ত গোলাম বা সার্ফের পুত্র জনশ্রেণীর বুর্জ্জোয়া। ইহারা কেহই রাষ্ট্রের অধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক ছিল না। তৎকালীন সমাজে অভিজাতশাসনের যুগ—

তাহাদিগকে লইয়াই সমাজ; কৃষ্টিও তাহাদিগের কীর্ত্তিকলাপেরই পরিচায়ক ছিল। সদ্যজাত "জন" ও সংখ্যাগরিষ্ঠ "গণে"র সন্ধান মধ্যযুগীয় সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

অর্থনীতিক কারণ বশতঃ যখন সামন্ততন্ত্র ভাঙ্গিয়া যথেচ্ছাচারী রাজাদের (National Monarch) দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে তখন ইংরেজ ও ফরাসী সাহিত্যে তাহার প্রতিবিম্বস্বরূপ অভিজাতদের বীরত্ব জাতীয় কীর্ত্তিকলাপের একাংশ বলিয়া পড়া হইয়া থাকে। সেক্সপীয়রের বিজয়ী নর্ম্মানদের সন্তান-সন্ততিগণকে অভিজাতরূপে বর্ণিত ও পরিচিত হইতে দেখা যায়, এবং তাহাদের বীরত্ব ও কীর্ত্তিকলাপ ইংরাজের কীর্ত্তিকলাপের পরিচায়ক বলিয়াই পঠিত হয়। সেক্সপীয়র যখন Henry V নামক নাটকে একজন ফরাসী অভিজাতের মুখ দিয়া ইংরেজ আক্রমণকারীদের—"Oh, ye Bastard Frenchmen, Oh, ye traitors" বলিয়া গালি দেওয়াইতেছেন তখন ইংলণ্ডবিজয়ী ফরাসী ও নর্ম্মান ব্যারণদের ইংলণ্ডের স্বার্থের সহিত অভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট বংশধরদেরই ফ্রান্সের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া ভর্ৎসিত ও তিরস্কৃত করিয়াছেন। সেই সময় ফ্রান্স অর্থে অন্ধকার যুগে অসভ্য জার্ম্মানজাতীয় ফ্রাঙ্ক কৌমের (tribe) লোকদের বংশধরগণ এবং ইংলণ্ড বলিলে তাহার বিজেতাদের বংশধরগণকে বুঝাইত। সেক্সপীয়রে একটা দেশের রাজনীতিক ক্রমবিকাশের সেই যুগের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় যখন ইউরোপে National Monarch (জাতীয় রাজা) প্রথা বিবর্ত্তিত হইতেছে। তখন ইংলণ্ডের রাজা ফরাসী রাজার একজন সামন্ত এবং Plantagenet বংশীয় হইলেও তিনি আর ফরাসী নহে, তিনি ইংরেজদের রাজা ও তাঁহার সমশ্রেণীয় (peers) অভিজাতগণও আর ফরাসী বংশোদ্ভব নহে, তাঁহারা ইংরেজ। এই সকল লোকদের স্বার্থই ইংলণ্ডের স্বার্থ।

এই চিত্র দ্বারা সেক্সপীয়র দেখাইলেন যে, বিদেশাগত বিজেতাদের সন্তানেরা আর ইংলণ্ডের পর নয়, তাহারা এখন খাঁটি ইংরেজ। "Mary I" নাটকে কবি স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের মুখ দিয়া তাঁহার স্ত্রী ইংলণ্ডের রাণী প্রথম

বাহার

মেরীকে ভর্ৎসনা করাইতেছেন যে, রাণীর অ্যাডমিরাল Lord Effingham স্পেনীয় নৌ-বেড়ার উপর গুলি বর্ষণ করিয়াছিল। প্রত্যুত্তরে রাণী বলেন—"He is an Englishman"। ইতিহাসাভিজ্ঞেরা অবগত আছেন যে, স্পেনের রাজা ফিলিপ ইংলণ্ডের রোমান ক্যাথলিকদের সহায়তায় সেই দেশ জয় করিয়া তথায় ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। কিন্তু অ্যাডমিরাল এফিংহাম রোমান ক্যাথলিক হইয়াও রোমান ক্যাথলিক স্পেনীয়দের সহিত যোগদান করেন নাই। কারণ তিনি প্রথমেও একজন ইংরেজ—শেষেও একজন ইংরেজ! এই দৃষ্টান্ত দ্বারা কবি দেখাইয়াছেন যে, পশ্চিম ইউরোপে ও অন্ততঃ ইংলণ্ডে অন্ধকার যুগ (Dark Age) ও সামন্ততান্ত্রিক যুগের (Feudal Age) সমাজ আর নাই এবং সে আদর্শও আর এখন নাই! এই সব যুগে জনসাধারণ ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য দ্বারাই আপনাদের পরিচয় প্রদান করিত। এক মূলজাতীয় (Race); এক ভাষাভাষী হইলেও লোক তখন ধর্ম্মের বিভিন্নতা হেতু একে অন্যকে পর ভাবিত; কিন্তু ইংলণ্ডে সেই মনোবৃত্তি ও সেই আদর্শ তখন অন্তর্হিত হইয়াছে। এইজন্যই ক্যাথলিক এফিংহাম ক্যাথলিক স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং দ্বিতীয় ফিলিপ ইংলণ্ডের রাণীর স্বামী হইলেও ইংলিশ চ্যানেল (English Channel) দিয়া যাইবার সময় ইংলণ্ডের রাজকীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। এইজন্যই এফিংহাম ফিলিপের কোন খাতির না রাখিয়া তাহার পতাকার উপর গুলি চালাইয়াছিল। এই নাটকে এবং এই চিত্রে কবি ইংলণ্ডের রাজনীতিক-সমাজনীতির সেই অবস্থায়ই প্রদর্শন করিয়াছেন যখন ধর্ম্ম রাজনীতিক জীবনে পরস্পরকে আর বিচ্ছিন্ন করে না। তখন একটা জাতীয় রাজার (National Monarch) অধীনে সকলে একত্রিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অভিজাতেরা সমস্বার্থে একত্র হইয়াছে। অবশ্য সেক্সপীয়রে "জন" ও "গণের" সমাজ এবং মনস্তত্ত্ব প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না; কেবল অভিজাতবর্গের মুখ দিয়া তাহাদিগকে "Villain, Knave" প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক যুগের কায়দা মাফিক বিবিধ

বিশেষণে বিশেষিত হইতে দেখা যায়। ইংলণ্ডে তখনও অভিজাতশাসনের যুগ চলিতেছিল। কিন্তু ইহার বহুপূর্ব্বে নর্ম্মান শাসনকালে Chaucer-এর Canterbury Tales ও Black Deathএর সমসাময়িকযুগে লিখিত "Piers Ploughman"-এ জনের ও গণের উল্লেখ দেখা যায়। তাহা এ্যাংলো স্যাক্সন জাতীয় লোকদের অর্থাৎ জনসাধারণ হইতে উদ্ভূত লেখকদের দ্বারা লিখিত বলিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের কিঞ্চিৎ বিবরণও পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু ইহা 'জন' ও 'গণে'র সাহিত্য নহে, কারণ তাহাদের আদর্শ ও মনস্তত্ত্ব ইহাতে প্রকাশমান নহে।

এই প্রকারে ফ্রান্সেও জাতীয় রাজার (National Monarch) যুগে কর্ণেই, রাসিন প্রভৃতির লেখায় তৎকালীন অভিজাত সমাজের চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎকালে ফ্রান্সের রাষ্ট্রে "জাতীয় রাজা" বিবর্ত্তিত হইলেও সামন্ততান্ত্রিক যুগের অভিজাতদের বংশধরেরা তখনও পুরাদমে রাষ্ট্র-শাসন পরিচালনা ও সমাজে নেতৃত্ব করিতেছে। তখনকার ফ্রান্স সামন্ততান্ত্রিক যুগের ছায়ায় ও অবস্থাতে অবস্থিত রহিয়াছে। সুতরাং অপরাপর শ্রেণীসমূহের কোন সংবাদ তৎকালীন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই প্রকার সমাজ-পদ্ধতির বিরুদ্ধে নবোত্থিত বুর্জ্জোয়া, অর্থাৎ ব্যবসায়ী মধ্যবিত্তশ্রেণী যে প্রতিবাদ উত্থাপন করে তাহা বিশ্বকোষ রচয়িতাদের (Encyclopaedist) গবেষণা, রুশোর "মানবের মৌলিক অধিকার" প্রভৃতির মধ্য দিয়া ফুটিয়াছে। চিন্তাক্ষেত্রের এই বিপ্লব পরে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে পরিণত হইয়া সামন্ততান্ত্রিক ফ্রান্সের সর্ব্ব শেষ নিদর্শন পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলে! ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বের দুইখানা পুস্তকে তৎকালীন ফরাসী মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাদরী (Abbe) সিয়ের (Sieyes) "Esque ce que la tiers etat" (তৃতীয় শ্রেণী কি?) নামক পুস্তিকায় সুস্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে, "ফরাসী অভিজাতবর্গ যদি ৫০,০০০ পালক মাথায় ফ্রাঙ্ক ঘোড়-সওয়ারদের বংশধর বলিয়া গর্ব্ব করে তাহা হইলে তাহারা জার্ম্মানীতে ফিরিয়া যাউক, আমরা তাহাদিগকে চাই না, তৃতীয় শ্রেণীই সব!"

চুঃ৫ল

আবার বোমার্কের "ফিগারোর বিবাহ" নামক নাটকে নাট্যকার, ফিগারো নামে এক দরিদ্র মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষিত লোকের মুখ দিয়া বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। ফিগারো বলিতেছে, "মসিঁয় কাউন্ট, তুমি জগতে কি করিয়াছ যে সমাজের সমস্ত দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত হয়, তুমি তো কেবল কাউন্টের ঘরে জন্মগ্রহণ করিবার অসুবিধা ভোগ করিয়াছ। আর আমি একজন গরীব বুদ্ধিজীবী লোক; কি করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিব তাহার কোন উপায় পাইতেছি না।" অভিজাত-শাসনের যুগে পতিত বুর্জ্জোয়াদের অবস্থা সকল পুস্তকে সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত আছে। বিপ্লবের পর বুর্জ্জোয়াশ্রেণী যখন রাষ্ট্রের কর্ণধার হয় তখন হইতে ফরাসী সাহিত্য নূতন রূপ ধারণ করে। রাজনীতিক সাম্যের সুর সাহিত্যের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। বাল্‌জাক্ ও ডুমাতে অভিজাত এবং বুর্জ্জোয়া শ্রেণীদ্বয়ের সংঘর্ষ সুপরিস্ফুট করা হইয়াছে। Three Musketeers উপন্যাসে রাজা ও সামন্তদের দরবারের কলুষিত জীবন সুস্পষ্টরূপেই অঙ্কিত করা হইয়াছে। ডুমাতে জনৈক নাইট্ তাহার পরিচিত এক উচ্চ সম্ভ্রান্তবংশীয়া কুমারীকে মঁসিনিয়রের (রাজার ভাই) প্রাসাদে দেখিয়া অবাক-বিস্ময়ে বলিয়া উঠে—"Montalais, Montalais, you are here! What makes you come here in this giddy court life!" (মন্তালে, তুমি এখানে! এই মাথা বিগড়ান স্থানে তুমি কিসের জন্য আসিয়াছ!) আবার সেই পুস্তকের অন্যত্র জঘন্য কলুষিত চরিত্রের রাজা His Most Christian Majesty চতুর্দ্দশ লুই কি ভাবে উদ্যানে এক দরবারী কুমারীকে ফুসলাইয়া নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল সেই দৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর ফ্রান্সের মধ্যবিত্তশ্রেণী যখন অভিজাতদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া নিজেদের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া একটা Nopoleonic Legend (নেপোলিয়নের উপাখ্যান) সৃষ্টি করে, নেপোলিয়নের প্রতি তখনকার বুর্জ্জোয়াদের ধারণা বালজাক, ডুমা, ভিক্টর হুগো প্রভৃতির রচনায় সুপরিস্ফুট হয়; 'লে মিজারেবল্‌স্" পুস্তকে হুগোর

অমর লেখনী-প্রসূত ওয়াটারলুর যুদ্ধের (Battle of Waterloo) বর্ণনায় নেপোলিয়নের প্রতি এই সময়ের ফরাসী স্বদেশপ্রেমিকদের মনে কিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় তাহা বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী বিপ্লবের ফল-প্রসূত সাম্য ও মৈত্রীভাব কি প্রকারে বুর্জোয়া উন্নতমনা ফরাসী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকেও পাইয়া বসিয়াছিল তাহা থিয়োফিল গতিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমেরিকায় পরিভ্রমণকালে শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃক জনৈক কৃষ্ণকায়ের হত্যাকাণ্ড দেখিয়া সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পান—"ও একটা নিগ্রো মাত্র!" স্পেনে ষাঁড়ের লড়াইয়ে একজনের মৃত্যু ঘটিলে উক্ত প্রকারের লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তর পান—"ও একটা ইহুদী মাত্র!" এরূপ মনোভাবে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "ওখানে বলিল,—ও একটা নিগ্রো মাত্র; এখানে বলিল—ও একটা ইহুদী মাত্র; কিন্তু মানুষকে কেহই সম্মান করিল না!" এই সকল লেখায় মানবের সামাজিক ও অর্থনীতিক সাম্য সম্বন্ধে কোন প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অধস্তন ও পতিত-জাতি সমূহের মনোগত ভাব এই বুর্জ্জোয়া সাহিত্যের মধ্যে ধরা পড়ে না!

এইরূপে দেখা যায় যে সাহিত্য সমাজের সমুদয় লোকের প্রতীক হইয়া স্বরূপ প্রকাশ করে না। সাহিত্যে লেখকদের শ্রেণীগত মনোবৃত্তি ও আদর্শই প্রকাশিত হয়। অভিজাত-সাহিত্যে অভিজাতদের Divine Right of Kings and Barons (রাজা ও উচ্চ সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকদের বিধিদত্ত অধিকার) ঘোষণা করা হইয়াছে, এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে স্বামিধর্ম্মের নামে দোহাই পাড়িয়া মনিবের নিকট একান্ত অনুগত থাকিবার জন্য উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, আবার বুর্জ্জোয়া সাহিত্যে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের প্রতি গালাগালি ও বিদ্রূপবাক্য বর্ষণ করা হইয়াছে! কিন্তু নিজেদের নিম্নশ্রেণীর কৃষক ও শ্রমজীবীদের প্রতি সাম্যভাব ও ব্যবহার প্রদর্শন করা হয় নাই। "তৃতীয় শ্রেণীই সব"—ইহাই ছিল ফরাসী বুর্জ্জোয়া, বিপ্লবের মূলমন্ত্র। রোমের সময় হইতে ফরাসী বাবোফের এবং স্যোসালিস্ট শ্রমিকদের শাসনযন্ত্র

(Government) কবায়ত্ত করিবার প্রচেষ্টা আজও পর্য্যন্ত অর্থাৎ কিকিরো (Cicero) হইতে হালের ফ্যাসিস্ট লেখক পর্য্যন্ত কেহই কৃষক ও শ্রমিকদের উত্থান আদৌ পছন্দ করে নাই! এই কারণেই বলিতে হয় যে সাহিত্যে শ্রেণী-চৈতন্যের (class-consciousness) টনটনে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়!

ফরাসীদেশে কিন্তু বুর্জ্জোয়া সভ্যতার ফলে কালক্রমে সর্ব্বহারা শ্রমিক-শ্রেণীর অভ্যুদয় হয়। তাহাদের প্রতিনিধিগণ এক নূতন দর্শন ও আদর্শ গড়িয়া তোলেন। বিগত আশী বৎসর ফ্রান্স বুর্জ্জোয়া ও প্রলেটারিয়েট শ্রেণীদ্বয়ের সংঘর্ষস্থল হইয়া আছে। একদিকে রাজনীতিতে যেমন তাহার নজীর পাওয়া যায় অন্যদিকে সাহিত্যেও তদ্রূপ নজীরের বড় একটা অভাব দৃষ্ট হয় না। দর্শন পুস্তক সমূহ উহার সাক্ষ্য প্রদান করে; গল্প সাহিত্যেও তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বুর্জ্জোয়াশ্রেণী যেমন রোমাঁ রোলাঁকে (Romain Rolland) উদ্ভূত করিয়াছে, নিম্ন-শ্রেণীও তেমনি আনাটোল ফ্রান্সকে বিবর্ত্তিত করিয়াছে। প্রথমোক্ত লেখক যেমন বুর্জ্জোয়া সমাজের মনস্তত্ত্ব প্রতিফলিত করিয়াছেন, শেষোক্ত লেখকও তদ্রূপ কৃষক-জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কিছু পূর্ব্বে উভয়ের মাঝামাঝি হইতে এমিল জোলা বুর্জ্জোয়া সমাজের কলুষের জন্য দুঃখ ও বেদনায় উহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন! ইউরোপীয় সভ্যতার Hub (কেন্দ্র) প্যারী যে কতখানি কলুষিত ও অধঃপতিত হইয়াছে এবং উহাকে ধ্বংস না করিলে যে ফ্রান্সের মঙ্গল নাই—একথা তিনি তাঁহার "La Debacle" নামক পুস্তকের শেসভাগে বর্ণনা করিয়াছেন। ১৮৭০ খৃঃ তৃতীয় নেপোলিয়নের সিডানে আত্মসমর্পণের পর প্রুশীয়েরা যখন প্যারী অবরোধ করে এবং ভিতরে প্রলেটারিয়েট কমুনার্ডদের যখন বুর্জ্জোয়ারা হত্যা করিতেছিল সেই সময় জনৈকা ফরাসী মহিলা প্যারীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চাহেন; তিনি সহর প্রাকারের বহির্দ্দেশে গুস্থার নামে একজন প্রুশীয় কর্ম্মচারীকে দেখিতে পান। উক্ত গুস্থার আবার ফরাসী রমণীটির পিসতুতো ভাই! ভিতরে প্রবেশ করিবার

জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলে গুস্তার কৌতূহলী হইয়া উক্ত মহিলাটিকে প্যারীর দিকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখান যে, সোণার প্যারী দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে! লেখক এখানে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন যে প্যারী পুড়িয়া গেলে নূতন ফ্রান্সের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু সেই নবীন ফ্রান্সের কোন রূপ তিনি বর্ণনা করেন নাই। ১৮৭০-৭১ খৃঃ ফ্রান্সের এই ভীষণ পরাজয়ের পর জাতীয় হতাশ ভাবের উদয় হয়। এই হতাশ ভাবের প্রতীক হয় Decadents নামক লেখক ও কবির দল। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে ল্যাটিন জাতিসমূহও বিশেষতঃ ফরাসী জাতি ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইবে! কিন্তু ফ্রান্স পুনঃ সমৃদ্ধিশালী হইলে এই অবসাদের প্রতিক্রিয়া আসে; ফলে ফ্রান্সের আত্ম-প্রত্যয় ফিরিয়া আসে। বের্গসোঁ (Bergson) এই নূতন ভাবের প্রতীক হন। এই দলকে Neo-realist বলা হইত। Varhaeren এই নবভাবের কবি ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে শ্রমশিল্পের উন্নতির যুগে উক্ত দল সহর ও উহার ভীড়, কল কারখানা এবং 'আধুনিক জীবনের' (Modern life) প্রশংসা করেন।

সাহিত্যে যে শ্রেণী-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রুষ সাহিত্য। নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর হইতে রুশিয়ায় ফরাসী-বিপ্লব প্রসূত উনবিংশ শতাব্দীর নূতন জ্ঞান ও ভাবাদর্শের প্রচার চলিতে থাকে। বর্ব্বর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ভাঙ্গিয়া শতাব্দীর আদর্শ ও সভ্যতানুযায়ী নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টার মূলে যে বিভিন্ন প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং তাহাতে নানাশ্রেণীর নানা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, সাহিত্যে ইহার বিশিষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া যায়। অভিজাতদের দ্বারা সংঘটিত December Revolution প্রচেষ্টা উক্ত দলের লেখক ডস্টয়ভস্কি বর্ণনা করিয়াছেন; মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের মনস্তত্ত্ব টুর্গেনিভ Father and Son নামক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন; অভিজাত সমাজের পরিচয় টলষ্টয় দিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদী প্যান-শ্লাভিস্টদের মনোভাব ও আদর্শ আলিনিস্কি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রুশ-বিপ্লবের পূর্ব্বে অভিজাত বুর্জ্জোয়া, কৃষক ও শ্রমিকদের

পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং রাষ্ট্র করায়ত্ত করিবার জন্য স্ব স্ব মত ও আদর্শ ঘোষণা এবং প্রচারের পরিচয় রুশ সাহিত্যে পাওয়া যায়। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে সাহিত্য অখণ্ড বস্তু নয়, অর্থাৎ প্রত্যেক সাহিত্যিক স্বদেশীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরগুলির প্রতিনিধি হইয়া কিছুই লেখেন না। তিনি তাহার স্ব সমাজেরই (of his own class) চিত্র অঙ্কিত করেন।

বর্ত্তমান যুগের প্রথম দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক কাণ্ট (Kant) বলিয়াছেন— "যদি মানুষকে বুঝিতে চাও তাহা হইলে তাহার পারিপার্শ্বিক সমাজকে বুঝিতে চেষ্টা কর।" মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়া থাকে। এই কারণ বশতঃ নিজের সমাজের গণ্ডীর বাহিরের সংবাদ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়া কিম্বা উহার মনস্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য ও সম্ভবপর হয় না। যিনি অভিজাত ও সম্ভ্রান্তবংশীয়দের প্রতি স্বামিধর্ম্ম প্রদর্শন করিবার তরফদারী করেন, তিনি ব্যবসায়ীশ্রেণীর ডেমোক্রাসী সমর্থনপূর্ব্বক লেখনী ধারণ করিতে পারেন না। আবার যদি ব্যবসায়ীদের বুর্জ্জোয়া-ডেমোক্রাসীর আদর্শকে সম্মুখে ধরিতে চাহেন তিনি শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা (Government) সমর্থন করিয়া কলম চালাইতে পারেন না। যিনি ধনিকশ্রেণীর আবেষ্টনীর মধ্যে লালিত পালিত ও পরিবর্দ্ধিত এবং সেই সামাজিক আদর্শকে সনাতন ও শাশ্বত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন তিনি অর্থনীতিক-সাম্য-সঞ্জাত শ্রেণী-হীন সমাজ (Classless Society) সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কলম নিয়োজিত করিতে পারেন না। সর্ব্বহারাগণের মনস্তত্ত্ব তাঁহার পক্ষে বোঝা ও জানা এবং নিখুঁতভাবে উহাকে রূপ দেওয়া অসম্ভব্। উচ্চস্তরের লোকদের মধ্যে কাহারও কাহারও "ছোটলোকদের" প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা সম্ভব হইতে পারে, ইহাতে তাহাদের দয়া ও মহানুভবতা প্রকাশ পায় বটে; কিন্তু উচ্চস্তরের লোকদের পক্ষে তাহাদের মনস্তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া এবং তাহার সহিত নিজেকে মিশাইয়া দিয়া তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে লোক সমাজে উপস্থাপিত করা মনোবিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু যে-সব যায়গায় এরূপ ঘটনা ঘটে সেখানে

ইহা পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হইবে যে, সেই ব্যক্তি স্বয়ং শ্রেণীচ্যুত হইয়াছেন ; তিনি আর তাহার সমাজ ও জন্মগত শ্রেণীতে অবস্থিত নাই—নিম্নশ্রেণীর সহিত সর্ব্ব বিষয়ে এক ও অভিন্ন হইয়া শ্রেণী-বিহীন (de-classed) হইয়াছেন। এই কারণেই বলিতে হয় যে সাহিত্য একটি অখণ্ড বস্তু নহে, প্রত্যেকেই আপনার শ্রেণীগত মনস্তত্ত্ব-জাত দৃষ্টিভঙ্গীতে সাহিত্য রচনা করিয়া থাকে। কোন একটি দেশের নির্দ্দিষ্ট ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিলেই সেইটিকে সেই দেশের অখণ্ড সাহিত্য বলা যাইতে পারে না। তবে এই কথা বিশেষভাবে বলা যায় যে বর্ত্তমানে সোভিয়েট সাহিত্যই প্রলেটারিয়েট সাহিত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অধুনা সোভিয়েট সাহিত্যিকগণ রুশীয় ভাষায় যাহা লিপিবদ্ধ করেন তাহা রুশ ভাষার অন্তর্গত সাহিত্য বটে , কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর রুশ-সাহিত্য আর আধুনিক গোগল, পুস্কিন হইতে আরম্ভ করিয়া সলকফ্ প্রভৃতি উদীয়মান নবীন সোভিয়েট সাহিত্যিকদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্য বিষয় ও আদর্শের মধ্যে কি পর্ব্বতপ্রমাণ পার্থক্য দেখা যায়! তাহাতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মনোভাব ও কার্য্য যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আজকাল সোভিয়েট রুশিয়ায় প্রলেটারিয়েট সাহিত্য নামে সাহিত্যের একটা নূতন রূপ বিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার অর্থ—শ্রমিকদের সাহিত্য। ইহাতে শ্রমিকদের জীবন, তাহাদের মনোভাব, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং লোক সমূহকে তাহাদের আদর্শ-অনুযায়ী দেখা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়গুলি পরিস্ফুট করা হইতেছে। প্রলেটারিয়েট সাহিত্যের কথা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সোস্যালিষ্ট আন্দোলনের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। যেমন উনবিংশ শতাব্দীতে বুর্জ্জোয়াশ্রেণী দ্বারা একটা সাহিত্য সৃষ্টি হয় এবং তাহাতে তাহাদের সমাজ ও জীবনের আলেখ্য প্রতিফলিত হয় তদ্রূপ প্রলেটারিয়েটদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাদের আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিয়া একটা নূতন সাহিত্য গড়িয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। উক্ত আন্দোলন সোভিয়েট রুশিয়ার গণবিপ্লবের পর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েট রুশিয়ার শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার

পর সর্ব্বপ্রথম শ্রমিকদের শ্রেণীস্বার্থ, জীবন ও আদর্শ লইয়া একটা বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। এরূপ শোনা যায় যে শ্রমিকদের বংশ হইতেই বড় বড় তরুণ নবীন সাহিত্যিক সৃষ্ট হইতেছে ; এবং তাহাদের রচিত পুস্তক-সমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হইতেছে। এই তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা এই তথ্যে উপনীত হওয়া গেল যে সাহিত্যে বিভিন্নশ্রেণীরই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্যে সমাজ-চিত্র

(২)

এক্ষণে জার্ম্মাণ সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। প্রাচীন টিউটনদের জনশ্রুতি (saga) বলে যে, ঋক (Rik) দেবতা—যোদ্ধা-অভিজাত (Jarl), কৃষক (Karl) এবং অর্দ্ধ-গোলাম দাস (thrall) নামক তিনটি বিভিন্ন আকৃতির লোক সৃষ্টি করেন (Rigsthule বা Heimdall saga দ্রষ্টব্য)। এই তিনজন তিনটি শ্রেণীর আদিপুরুষ (এই জনশ্রুতির সহিত হিন্দুর বর্ণবিভাগের কাহিনীর অনেকটা সাদৃশ্য আছে, এ-বিষয়ে Bluntschliর "The Theory of the State" দ্রষ্টব্য)। এই গল্পের মধ্যে টিউটন জাতির প্রাচীনকাল হইতে শ্রেণী-বিভাগের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুইডিস্ সাগা-সমূহে (sagas) এবং জার্ম্মান নেবুলিঙ্গেন গীতসমূহে (Nebulingen lieder) বিভিন্ন কৌমের সর্দ্দার-বংশের যুদ্ধবিগ্রহ ও প্রেমের সংবাদই পাওয়া যায়। সিগফ্রিড ও ব্রুনহিল্ডের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ ও প্রত্যাখ্যানের মধ্যে বর্ব্বর-যুগের বীর ও বীরাঙ্গনাদেরই সংবাদ পাওয়া যায় (J. J. Meyer তাঁহার The Sexual life of the ancient Indians নামক পুস্তকে [ইংরেজী অনুবাদ] উপরোক্ত উভয়কে দ্রৌপদী ও কর্ণের সহিত তুলনা করিয়াছেন)। এইসব জনশ্রুতিতে জনসাধারণের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এক একটি কৌমের সর্দ্দার বা রাজা অপর একটি কৌমকে পরাজিত করিয়া কি প্রকারে গোলামী অথবা অর্দ্ধ-দাসত্বে (serf) পরিণত করিল এবং বিজিতদের কি দশা হইল সাহিত্যে তাহার কোন নিদর্শন নাই। এইসব বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া যে-সব রাজনীতিক পুস্তক পরে রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে অনেক রাজনীতিক তথ্য পাওয়া যায়।

অতঃপর টিউনিক জাতিসমূহ খৃষ্টান হয় এবং রোমীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। এই সময় ইউরোপের অন্ধকার যুগ কাটিয়া গিয়া সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি যেমন জার্ম্মান অধ্যুষিত ফ্রান্সে তেমনি জার্ম্মানীতে শিকড় গাড়ে। সেখানেও ব্যারণদের যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বন্ধে অনেক চারণ-গাথা রচিত হয় এবং স্বামি-ধর্ম্ম তথায়ও প্রাধান্য লাভ করে। এইসব গাথা ও গল্পের মধ্যে ব্যারণ ও তাহাদের প্রণয়িনীদের কার্য্যের সংবাদই মিলে; ইহাতে chivalry, gallantry প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। উহাতে দেখা যায়, এক যুবতীর প্রেমলাভের জন্য দুই 'নাইট' যোদ্ধা লড়িতেছে; এবং যুদ্ধে যে জয়লাভ করে যুবতী তাহারই কণ্ঠলগ্ন হইতেছে। এতদ্দ্বারা এই মনস্তত্বই প্রকাশ পায় যে জার্ম্মান-যুবতী প্রেম বিষয়ে aggressive, এ-বিষয়ে আজকালকার ন্যায় সে passive ও coyish নয় (পরলোকগত অধ্যাপক ভিন্টারনিটস বলিয়াছেন এই ভাবটী ভারতীয় সাহিত্য হইতে করাসী সাহিত্যের মধ্য দিয়া অবশেষে জার্ম্মাণ সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার History of Sanskrit Literature দ্রষ্টব্য)। ইহার পর শিল্প-সমূহের উদ্ভব হয়। শিল্পীরা ধর্ম্মের ধারণা-সমূহকে রূপ দিবার জন্য চেষ্টা করে। ধর্ম্ম তখন উচ্চশ্রেণীর লোকদের দ্বারাই অধ্যুষিত। ইহারই ফলে মধ্যযুগীয় Gothic style-এর ভাস্কর্য্যের সৃষ্টি হয়। এই সময় Church জনকতক উচ্চবর্ণের ও অভিজাতবংশীয় লোকদের দ্বারা পরিচালিত হইত। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মমণ্ডলী (Church) কেবল বনিয়াদী স্বার্থের (vested interests) তরফদারী করিত। ইহা 'জন' বা 'গণে'র কোন তোয়াক্কা রাখিত না। সাধারণ লোক হয় গরীব শিল্পী নয় অর্দ্ধগোলাম সার্ফ (serf) ছিল। তাহাদের মধ্যেই খৃষ্টীয়-কম্যুনিস্ট মত-সমূহ প্রচারিত হয়। পোপ এবং ইতিহাস ইহাদিগকে heretic sects বলিয়া চিত্রিত করিয়াছে! ইহাদের উপর পোপ ও ধনিকশ্রেণীর ঘোর অন্যায় ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইত। আবার এই সময়েই অতীন্দ্রিয়বাদীদের (mystic) সংবাদ জার্ম্মান সাহিত্যে পাওয়া যায়। Rosacrucians প্রভৃতি অতীন্দ্রিয়বাদীর দল এই মধ্যযুগে উত্থিত হয়। ইতিহাসে দেখা যায় যে, জাতীয় হা-হুতাশের ও অবসাদের দিনেই

মিষ্টিকদের আবির্ভাব হয়! এতদ্দ্বারা মানুষের মনকে ইহ জগতের দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে সরাইয়া পর-জগতের সুখ-সম্ভোগের আশা-আকাঙ্ক্ষায় মস্‌গুল করিয়া রাখা হয়। বিভিন্ন রাজা, অভিজাত ও ধর্ম্মযাজকদের দ্বারা শোষিত ও নিষ্পেষিত শ্রেণী সমূহের মধ্যেই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ মত-সমূহ সমর্থিত হইত। এই যুগের শেষে অর্থাৎ Renaissance-এর যুগে একটা ব্যবসায়ী-শ্রেণী উত্থিত হইয়াছে। তখন আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতের রাস্তা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পশ্চিম ইউরোপে একটা বিশিষ্ট ব্যবসায়ীশ্রেণী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাহাদের পরিস্থিতির প্রতীক হইলেন মার্টিন লুথার ও জন ক্যাল্‌ভিন। প্রটেষ্টাণ্ট, অর্থাৎ ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর অনুকূলেই পরিচালিত হয়। এইজন্য প্রটেষ্টাণ্ট সাহিত্য সম্রাট, বড় বড় রাজা, পোপ ও কার্ডিনালদের প্রতিকূলেই লিখিত হইতে দেখা যায়। এই আন্দোলনে 'গণে'র সম্বন্ধ কি সেই সম্পর্কে Engels-এর "The Peasant Revolt in Germany" পুস্তক পাঠ করিলেই তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। অতঃপর আসে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল। এই সময় ফরাসী বিপ্লবের যুগ। ইউরোপের সর্ব্বত্রই মধ্যবিত্তশ্রেণী জাতীয়তার (Nationalism) মাদকতায় বিভোর। তখনকার জার্ম্মান শিক্ষিত লোকদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, কি প্রকারে জার্ম্মানীকে একরাষ্ট্রাধীন করিয়া একজাতীয়তা-সম্পন্ন করা যায়। রুশোর মত—দেশ "এক এবং অবিভাজ্য" (one and indivisible)। তাহা ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়া সমস্ত জাতীয়তা-বাদীদের হৃদয়ে তৎকালে গ্রথিত হইয়াছিল; জার্ম্মানীকেও তদ্রূপ করিতে হইবে ইহাই ছিল তখনকার জার্ম্মান স্বদেশপ্রেমিকের আদর্শ। আর ফ্রান্স বরাবরই এই পুণ্যকর্ম্মের শত্রু, বিশেষতঃ নেপোলিয়ন জার্ম্মানীকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতেছে। তখনকার হ্যাস্‌বুর্গ (Hapsburg) এবং আধুনিক হোহেন্‌জোলারন (Hohenzollern) বংশদ্বয়ের বিবাদের মধ্যে স্বদেশ-প্রেমিকেরা তাঁহাদের আদর্শ খুঁজিয়া পান নাই। এইজন্য তাঁহারা অতি প্রাচীন স্যাক্সন বীর হেরম্যানকে (ল্যাটিন Arminius-যিনি রোমানদের পরাজিত

করিয়াছিলেন) স্মরণ করিয়া গীতি রচনা করিতে লাগিলেন। আবার শিলার (Schiller), গেটে (Goethe)—William Tell, Egmont প্রভৃতি লেখক মধ্যযুগীয় বীরগণের কীর্ত্তিকলাপ অবলম্বন করিয়া নাটক ও গীতিকাব্য রচনা করেন। মুলার জার্ম্মান অতীত ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। জার্ম্মানীর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে রচিত সাহিত্যের মধ্যে এই সময়ের জার্ম্মান ন্যাশন্যালিজমের ও বিপ্লবীদের কর্ম্মপ্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসী-বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের প্রতি বিতৃষ্ণা ছিল সেই যুগের সাহিত্যের ভঙ্গী। জার্ম্মানীতে মধ্যযুগীয় রাজা ও ব্যারণরা সেই সময়ে রাজশক্তি করায়ত্ত করিয়া সমাজের শীর্ষদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া জার্ম্মান জাতীয়তাবাদ সাধারণতঃ ফ্রান্সের মত গণতন্ত্রবাদী হইতে পারে নাই। যে-সব রাজনীতিক ও অর্থ-নীতিক সংস্কার প্রুশীয় মন্ত্রী হেরডার কর্ত্তৃক সংসাধিত হয় (প্রুশিয়াতে সার্ফদের মুক্তিদান) তাহা ফরাসী আক্রমণের চাপেই হইয়াছিল। সেইজন্য তখনকার সাহিত্যে অভিজাতশ্রেণীর বিরুদ্ধে কোন কথা পাওয়া যায় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের একজন বড় দার্শনিক ছিলেন হেগেল (Hegel)। ইনি প্রুশীয় তথা জার্ম্মান স্বজাতিপ্রেমিকদের তৎকালীন চিন্তাধারার একটী উৎকৃষ্ট নজীর। প্রাচীন রাষ্ট্র, ধর্ম্ম ও সমাজপদ্ধতিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিতন্ত্রের আবহাওয়ায় খাপ-খাওয়াইবার জন্য তিনি যে-সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা আজ অগ্রাহ্য হইলেও উহাই একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে নিজের দেশের সমস্ত পদ্ধতিকে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ দান বলাই ছিল জার্ম্মান স্বজাতিপ্রেমিকদের গর্ব্ব। হেগেল "দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাস" (History of Philosophy) নামক পুস্তকে তাঁহার Thesis, Antithesis এবং Synthesis নামক dogmaটি প্রয়োগ করেন। এই dogmaটি তিনি চীন হইতে প্রুশিয়া তথা জার্ম্মানী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে প্রয়োগ পূর্ব্বক দেখান যে প্রুশিয়ায় জার্ম্মান জাতিই এই dogmaটির পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং জীবনে Subjective ও Objective-এর সম্মিলন করিয়া মানবজীবনের পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

অবশ্য তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ তাহার বেদান্ত-দর্শনশাস্ত্র দ্বারা সেই সত্যে উপনীত হইয়াছে; কিন্তু উহা Sensuous ও Superficial! এই কারণ-বশতঃ তিনি জার্ম্মানদের মানবকুলের শ্রেষ্টজাতি বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনিই প্রথম Germanism নামক মতবাদ সৃষ্টি করেন; এই মতবাদই আজ জার্ম্মানীতে Nordicism বলিয়া চলিতেছে। এই গর্ব্ব প্রকাশ পায় যখন নেপোলিয়নের জার্ম্মানী-নিপীড়ন কাহিনী লোকের মনের মধ্যে জাগ্রত ছিল! পরে নিটশে (Nietzsche) ও তাঁহার শিষ্য ট্রাইট্স্কে (Treitschke) উক্ত মতকে Blonde boast theory নাম দিয়া জার্ম্মানদের শ্রেষ্ঠমানব বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার পশ্চাতে ছিল—শতধা-বিচ্ছিন্ন জার্ম্মানদের উৎকট জাতীয়তাবাদ দ্বারা জগতে বড় জাতিরূপে খাড়া করা। এই সকল দার্শনিক সাহিত্য আদৌ প্রগতিশীল নহে।

তৎপর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রমশিল্পের বিবর্ত্তনের সঙ্গে একটা নূতন সমস্যা উদ্ভূত হইতে দেখা যায়—এই সমস্যাটি হইল শ্রমিক আন্দোলন। মুক্ত সার্ফদের পুত্রেরা সর্ব্বহারা শ্রমিকে পরিণত হইতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-পদ্ধতির উপর কারখানার মালিকদের শোষণনীতি (exploitation) চাপিল! এই সময়েই সাম্যবাদরূপ মতবাদটি অভিব্যক্ত হয়! League of the Just, Communist League প্রভৃতি সমুত্থিত হইয়া রাজনীতিক ক্ষেত্রে এক নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি করে। এই আবহাওয়ার প্রকৃষ্ট সাহিত্যিক নজীর হইতেছে মার্ক্স (Marx) ও এঙ্গেল্‌সের (Engels) 'সাম্যবাদীর ফতোয়া' (Communist Manifesto)। মার্ক্স, এঙ্গেলস্, লাসাল, বেবেল ও অন্যান্য সোস্যালিষ্টদের লিখিত পুস্তকসমূহ তৎকালীন নূতন পরিস্থিতি-প্রসূত সমস্যার নিদর্শন; অন্যদিকে অধ্যাপক ডুরিং (Duehring), স্মলার, এড্‌লফ্ ভাগনার ও তাহাদের দলের সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতি-বিশারদ্‌গণের পুস্তকসমূহ বিপক্ষদলের সাহিত্যের নজীর! ডুরিং-এর নিজেকে সোস্যালিষ্ট বলিয়া জাহির করা এবং এঙ্গেলসের "Herr Duehrings umwalzung" বা "Anti-Duehring" নামক পুস্তক উক্ত দ্বন্দ্বের পরিচয় প্রদান করে।

এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে সোশ্যালিষ্টদের সাহিত্যে প্রগতির আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু অধ্যাপক স্মলার তাঁহার Historical School নামক দলের সাহিত্য দ্বারা এই মতটি জাহির করিতে থাকেন যে, একটা জাতির ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে উহার কার্য্য-ক্ষমতা (Race capacity) সীমাবদ্ধ, ঐ সীমার বাহিরে সেই জাতি অভিব্যক্ত হইতে পারে না। এতদ্বারা তিনি একটী জাতির কর্ম্মক্ষমতার বিবর্ত্তনের ধারাকে সীমাবদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে চাহেন। উক্ত মতবাদটি আন্তর্জ্জাতিক ভাবাপন্ন সোশ্যালিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া তিনি দেশবাসীকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে জার্ম্মানদের প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই! অবশ্য সোশ্যালিষ্টদের আন্দোলনকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি কিছু সংস্কার চাহিয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহার দলকে উপহাস করিয়া পুঁজিবাদীরা Cathedra (chair) Socialists বলিত! এইজন্য "ঐতিহাসিক স্কুল" ও 'আরাম কেদারার সাম্যবাদীদের' সাহিত্যকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

ইতিমধ্যেই অন্যক্ষেত্রে যে সাহিত্য প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহাতে নবোত্থিত মধ্যশ্রেণীয় 'জনের' কথঞ্চিৎ সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। থিওডোর ষ্টোরমের 'Immensee' ও অন্যান্য নভেলগুলি মধ্যবিত্তশ্রেণীর নায়ক ও নায়িকা লইয়া লিখিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা প্রাচীন আচার ও সংস্কার-বিমুক্ত নহে। পক্ষান্তরে 'Germelhausen' নামক নভেলে মধ্যযুগীয় ভূতুড়ে গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত জার্ম্মানীতে মধ্যযুগীয় যাদু ও ভূতুড়ে গল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল। তাহারই অবতারণা করা হইয়াছে উপরোক্ত নভেলে। রুশ সাহিত্যের আদি ঔপন্যাসিক গোগল এই প্রকারে দক্ষিণ রুশ বা উক্রেনীয়ার ভূতুড়ে গল্প সমূহ রচনা করিয়াছেন। ইহার পর আসেন, আইসেনডর্ফ। ইনি বহু উপন্যাস লিখিয়াছেন। তাহাতে এক দিকে যেমন সাধারণ লোকের কিঞ্চিৎ সংবাদ পাওয়া যায় অন্যদিকে তেমন খেতাবধারী অভিজাত সমাজেরও কিঞ্চিৎ চিত্র পাওয়া যায়। তাঁহার

'Wanderung eines Taugenichts-এ' (নিষ্কর্ম্মা ভবঘুরের পরিভ্রমণ) এই চিত্র কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের সাহিত্যে জন ও গণের সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না। তখনও জার্ম্মানী প্রাচীন অভিজাত সমাজের দিকে মুখ চাহিয়া আছে এবং নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণীর ধনীরা অভিজাতদের সমাজে মিলিতেছে ; সেইজন্যই উভয় শ্রেণীর ছাপ এই সাহিত্যে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এই কারণ বশতঃ একটা যথার্থ মধ্যবিত্তশ্রেণীর বা বুর্জ্জোয়া সাহিত্য বিবর্ত্তিত হয় নাই। ইহার পরে আসেন হফ্‌ম্যান ও স্বল্পখ্যাত বহু সাহিত্যিক-দল। তখন জার্ম্মানী শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়ে জগতের একটি উচ্চস্তরে অবস্থান করিতেছে। সেই সময়ের সাহিত্যিকেরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর উকিল, ডাক্তার ও অধ্যাপকদের জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস লিখিতেছেন। সেইজন্য নায়িকাগণ প্যারিসের পোষাক পরিধান করিতেছেন, কথায় বার্ত্তায় দুই চারিটি ফরাসী শব্দ ব্যবহার করিতেছেন, "5'0 clock Tea" পান করিতেছেন,—কারণ, ইহাই ছিল বিগত মহাসমরের পূর্ব্বে বিত্তশালী শিক্ষিতদের মধ্যে চল্‌তি ফ্যাসান! এই সাহিত্যে জনের সম্বন্ধে সংবাদ কিছু কিছু পাওয়া যায় বলিয়া অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা তৎকালীন আমেরিকান বা ফরাসী বুর্জ্জোয়া সাহিত্যের ন্যায় নহে। এই সাহিত্য প্রাচীন সমাজের আদর্শের পানে চাহিয়া ছিল। ইহার দৃষ্টিভঙ্গী আদৌ বুর্জ্জোয়া-শ্রেণীর বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী নয়। জার্ম্মানীর Police State লোকের সকল প্রকার কর্ম্মের উপরই প্রখর দৃষ্টি রাখিত বলিয়া, লোকের মস্তিষ্কে "ঈশ্বর ও কাইসার" ব্যতীত অপর কোন আদর্শ প্রবেশ করিবার সুবিধা পাইত না।

ইতিমধ্যে শ্রমিকদল বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। আদর্শ-ঘটিত এই পরি-স্থিতির প্রতিপক্ষে সোস্যালিষ্ট দল Proletarian Culture (প্রলেটারীয় সংস্কৃতি) নামক এক আন্দোলন সুরু করেন। তাঁহারা শ্রমিকশ্রেণীর সাহিত্য, থিয়েটার, সংবাদপত্র প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা 'গণে'র কথা কহিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহারা প্রথিতযশা কোন সাহিত্যিক সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। যে-সব সাহিত্যিক জনসাধারণের সম্বন্ধে কিছু

সংবাদ সাহিত্য দ্বারা প্রকাশ করিতেন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন—"জিমার ম্যান"। ইনি ১৯১৮ সালে জার্ম্মান বিপ্লবের পর 'Die Revolution' নভেলে বিপ্লব বিষয়ে গরীব সাধারণের মনস্তত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকসমূহে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিপ্লবের পর সোস্যালিষ্ট ও কমিউনিস্ট দল হইতে গীতি কবিতা প্রভৃতি রচিত হইয়াছে; কিন্তু উহা রাজনীতিক দ্বন্দ্ব সাহিত্য হইলেও প্রগতিশীল। পক্ষান্তরে Remarque-এর 'Nitcht neues im Westen' (All Quiet in Western Front) পুস্তকে শুধু যুদ্ধের নৃশংসতাই বর্ণিত হইয়াছে—ইহাতে কোন আদর্শ নাই। ইহা একটী প্রোপাগ্যাণ্ডা (প্রচার) সাহিত্য মাত্র। এইজন্য ইহাকে স্বদেশ-প্রেমিকেরা Defeatist mentality-র (পরাজিত মনোভাব) পরিচায়ক বলিয়া নিন্দা করেন।

জার্ম্মানীর রাজনীতিক পরিস্থিতির জন্য সমাজ এখনও প্রাচীন পদ্ধতির আওতায় আছে। সেইজন্য একটী যথার্থ বুর্জ্জোয়া সাহিত্য সেখানে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু জিমারম্যান ও অন্যান্যদের রচিত পুস্তক-সমূহে যে কিঞ্চিৎ প্রগতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বিপ্লবের পর সোস্যালিষ্ট ও মধ্যবিত্তশ্রেণী দ্বারা সংগঠিত গবর্ণমেণ্ট এবং মধ্যবিত্ত ও গরীব মধ্যবিত্ত-শ্রেণীদ্বয়ের হস্তে শাসনভার আসিয়াছিল বলিয়াই তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল।

এবার ভারতের সাহিত্যের বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। বৈদিকযুগের কৌমগুলির (tribes) রাজাদের চারণেরা ছন্দোবদ্ধ ভাষায় যে-সকল গীতস্তুতির কবিতা লিখিত সেগুলিই 'বেদ' নামে পরিচিত। বেদের প্রথমাবস্থায় দেখা যায় যে একদল চারণ-গায়ক সর্দ্দার বা রাজার স্তুতিগায়ক ছিল; তাহারাই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইত। শাসকদের "রাজন্" এবং তাহার স্বগোষ্টীকে "রাজন্য" বলা হইত। সাধারণ লোকসমূহ "বিশ্" নাম দ্বারা অভিহিত হইত। এই প্রকারে ঋগ্বেদের সময়ে সমাজে তিনটি শ্রেণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সমাজের যে অবস্থায় বেদ বিরচিত হয় তাহা বৈদিক

কৌমগুলির যৌবনাবস্থা। তখন "রাজন" যুক্তরাষ্ট্র ও শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত সমাজ বিবর্ত্তিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের "দানস্তুতি" ও "দাশ রাজন্য" যুদ্ধে ব্রাহ্মণ চারণদের দ্বারা ক্ষত্রিয় রাজাদের গুণগ্রাম কীর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। দাশ রাজার যুদ্ধে চারণ বশিষ্ঠকে ভারত রাজা সুদাসের গুণ কীর্ত্তন করিতে দেখা যায়। বেদের ঋক্‌গুলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দ্বারা লিখিত হয়, ঐগুলিতে উক্ত তিন শ্রেণীর কথার উল্লেখ আছে। তখন জন ও গণের মধ্যে বিভাগ ছিল কিনা এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। ঋকে শূদ্রের উল্লেখ নাই ; কিন্তু যজুর্ব্বেদে চারিবর্ণেরই উল্লেখ আছে। শূদ্র যদি 'গণ' হয় তাহা হইলে সেই গণের সংবাদ বেদে পাওয়া যাইবে কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বেদে শূদ্র রাজা, শূদ্র মন্ত্রী ও ধনী শূদ্র প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অতএব পরিষ্কার বোধগম্য হয় যে শূদ্র বলিলেই কেবল 'গণ'কে বুঝাইত না। কিন্তু "ব্রহ্মজায়া" ও "ব্রহ্মগাভী" স্তোত্রসমূহে ভীষণ শ্রেণী-সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল স্তোত্রে যে-সব ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের শয্যা হইতে তাহার স্ত্রীকে অপহরণ করিত এবং ব্রাহ্মণের গরু কাটিয়া খাইত তাহাদের উপর অভিসম্পাত আছে ! এই যুগে পুরুরবা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণদের ধন অপহরণ, এক সহস্র ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নহুষের রথ টানাইবার উল্লেখ দেখা যায়। ক্ষত্রিয়ের সহিত দ্বন্দ্বে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণদের বৈশ্য ও শূদ্রকে তাহাদের বিরুদ্ধে উস্কাইতে দেখা যায়। আর বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায় যে, কখন বলা হইতেছে ব্রাহ্মণেরা বড় ও শ্রেষ্ঠ, আবার, কখন বলা হইতেছে ক্ষত্রিয়েরা শ্রেষ্ঠ। বৈদিকযুগের শেষের দিকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ভীষণ শ্রেণী-সংগ্রাম বাঁধিয়া উঠে। এই প্রকারে বেদে কেবল ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতে না দেখিয়া শ্রেণী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। অধ্যাপক ব্লুমফিল্ড যথার্থই বলিয়াছেন যে বেদ কেবল ধনী ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের ক্রিয়াকাণ্ডের সংবাদ সম্বলিত পুস্তক মাত্র। মহাকাব্যগুলিতে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে ; পুরাণসমূহে ক্ষত্রিয় রাজগোষ্ঠিগুলির কীর্ত্তি-কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে নাটক ও কাব্যসমূহে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের

শাসকবর্গের পরিচয় পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় স্বামি-ধর্ম্মের মহিমা বর্ণনা। গীতায় এই স্বামিধর্ম্মের বিশেষ ব্যাখ্যা আছে। বৌদ্ধ ও জৈন পুস্তকসমূহে দেখা যায় যে একদিকে ক্ষত্রিয়বর্ণের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, অপরদিকে ব্যবসায়ী সঙ্ঘসমূহ (Trade Guilds) ও বিদেশীয় বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ আছে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যেও এই শ্রেণীভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পার্জিটারের মত এই যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে দুই প্রকারের ব্রাহ্মণদল ছিল। একদল ক্ষত্রিয় রাজাদের গুণকীর্ত্তন করিত; তাহারা পুরাণ-সমূহ লিখিয়াছিল। ইহারা নিজেদের ক্ষত্রিয় মনিবের কীর্ত্তিকাহিনী গাথায় লিপিবদ্ধ করিত। আর একদল স্বীয় শ্রেণীর উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করিয়া নিজের সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিত। ইহারাই বেদ রচনা করিয়াছিল এবং সংস্কৃত সাহিত্যে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের বিষয়ে লিখিয়া যায়। এইমত সর্ব্ববাদীসম্মত না হইলেও ইহা অবশ্য সত্য যে সংস্কৃত সাহিত্য শ্রেণীগত সাহিত্য। ইহা রাজা ও সামন্তবর্গের স্তব-স্তুতিতে পরিপূর্ণ। এই সাহিত্য উপরের স্তরের লোকদের মাহাত্ম্য-বর্ণনায় ভরপুর। হিন্দুর প্রাচীন দর্শন, সাহিত্য ও চারু শিল্প উচ্চ স্তরের স্বার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে; জন ও গণের মনস্তত্ত্বের পরিচয় তাহাতে আদৌ পাওয়া যায় না। এই জন্যই স্বামী বিবেকা-নন্দ বলিয়াছেন—তুমি তোমার দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে অহঙ্কার কর, কিন্তু তাহা শ্রেণীগত দর্শনশাস্ত্র! প্রাচীন ভারতে হিব্রু পয়গম্বরদের ন্যায় গরীবের উপর উচ্চ স্তরের লোকের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেহই দণ্ডায়মান হয় নাই, এবং কেহই তাহাদের নিন্দা তিরস্কার করে নাই। প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীরা এবং সামাজিক নেতারা রাজা অথবা ধনীর স্তুতিগায়ক সাজিয়াছেন। এইজন্য ভারতের সাহিত্যে বোমার্শে, চেনিয়ে, ভিক্টর হুগো, আনাটোল ফ্রান্স ও গর্কির ন্যায় লেখকের এখনও উদয় হয় নাই। ভারতীয় সমাজ হিন্দু রাজত্বকালে সামন্ততান্ত্রিক যুগে অবস্থিত ছিল—এমন কি আজও অবধি ইহা অধিকাংশ স্থলে তদবস্থায়ই অবস্থিত। মুসলমান যুগের অবস্থাও 'তথৈব চ' ছিল। ভারতের অর্থনীতি পূর্ব্বে

সামন্ততান্ত্রিক যুগে অবস্থিত ছিল এবং আজও অধিকাংশ স্থানেই পূর্ব্বাবস্থায়ই রহিয়াছে। এইজন্যই আমাদের আদর্শ এখনও আধুনিক যুগোপযোগী আদর্শানুযায়ী বিবর্ত্তিত হয় নাই।

খাস বাংলা সাহিত্যেও অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের যেটুকু নষ্ট-কোষ্ঠীর পুনরুদ্ধার হইয়াছে তাহাতে বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্মবিষয়ই বর্ণিত আছে। "সরোরুহপদে" পাওয়া যায় 'গুরুবাদ' এবং তাহার অন্বয় বজ্রটীকার শেষ কথায় পাওয়া যায় "শুভমস্তু সর্ব্বজগতম্"। বৌদ্ধধর্ম্ম আন্তর্জ্জাতিক আদর্শ-ভাবাপন্ন। এইজন্যই লেখক জগদ্বাসী সকলেরই মঙ্গল কামনা করিতেছেন। কিন্তু নাথ-ধর্ম্মের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে 'গণে'র সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সন্ধান মিলে। হাড়ীপা প্রভৃতি হাড়ী জাতীয় লোক গুরু হইয়া রাণীকে শিষ্যা করিতেছেন এবং মীননাথ, মচ্ছেন্দ্রনাথ ধীবর-বংশীয় হইয়া নাথ-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। এই সমস্ত বিষয়ে দেখা যায় যে বৌদ্ধযুগে বাঙ্গলার আজকালকার পতিত জাতিসমূহের পূর্ব্ব পুরুষগণ তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজে হেয়-স্থানীয় ছিলেন না; বরং বৌদ্ধ সমাজে ইঁহাদের অনেকেই "কেষ্ট-বিষ্টু" ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উত্থানের সহিত বাঙ্গলায় একটা ঘোর শ্রেণী-বিরোধ বাঁধিয়া উঠে। অবশ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় প্রথা অনুযায়ী এই শ্রেণীসংগ্রাম (Class Struggle) ধর্ম্ম-সংগ্রামের রূপ ও আকার ধারণ করে। দশম শতাব্দীর এই দ্বন্দ্ব ছড়া ও পাঁচালীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তাহার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে:

"আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে,
ডাল গাগর মৃগল বাজে,
বাজতে বাজতে পড়ল সাড়া,
সাড়া গেল বামুন পাড়া"...

এই ছড়ার অর্থ স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধরাইয়া দিবার পূর্ব্বে কয়জন তাহা বুঝিয়াছিলেন? রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গলে "নিরঞ্জনের রুষ্মা" কাব্যে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের দ্বন্দ্ব এবং তাহার পরিণতিতে যে "ধর্ম্ম হৈল

যবনরূপী, মাথা এতে কাল টুপী" দিয়া যাযপুর প্রবেশ করিয়া, "দেউলদেহড়া ভাঙ্গে" তাহার সংবাদ পাই। এই দ্বন্দ্ব হইতে এইটুকু অনুমান করিতে পারি যে বাঙ্গলা কি প্রকারে এতটা অল্পায়াসে মুসলমানদের কুক্ষিগত হইয়াছিল।
ইহার কয়েক শতাব্দী পর যখন বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে তখন আর সদ্ধর্ম্মী বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের বিরোধের সংবাদ পাওয়া যায় না; পরন্তু হিন্দু ও মুসলমানের দ্বন্দ্বের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চণ্ডীদাস হইতে সমস্ত বৈষ্ণব কবিদের হা-হুতাশের মধ্যে বাঙ্গালীর অবিদিত মন (Sub-conscious mind) হইতে পরাধীনতা জনিত ক্রন্দনই শ্রীমতীর বিরহ ও ক্রন্দনের রূপে ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। এই সময়ের আর একজন বড় কবি মুকুন্দরাম তৎকালীন সমাজের আলেখ্য আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। কবিকঙ্কণ জনশ্রেণীর লোক; তিনি তাঁহার গ্রামের মুসলমান কর্ম্মচারীর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া গ্রাম ত্যাগ করেন। এইজন্য জন ও গণের প্রতি তাঁহার এতটা দরদ! তিনি রূপকের সাহায্যে তৎকালীন জমিদার ও রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারচিত্রটি বর্ণনা করিয়াছেন। চণ্ডীর সমস্ত পশু সমবেত হইয়া অভিযোগ করে: "চৌধুরী নেউগী নহি না রাখি তালুক"—তবু কেন তাহাদের অত্যাচার হয় ইত্যাদি! গণের সম্বন্ধে বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাধ কাল-কেতুর স্ত্রীর দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন যে বারমাসই "অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।" জাতির মধ্যে পূর্ব্বকালের সঙ্ঘ-পদ্ধতি অনুযায়ী সাম্যের পরিবর্ত্তে ধনের শ্রেষ্ঠত্ব যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা ধনপতি সদাগর তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে দেখাইয়াছেন:

"ধনে শীলে কুলে মানে চাঁদ নহে বাঁকা,
বাহির দুয়ারে যার সাত ঘড়া টাকা।"

মুকুন্দরাম Subjective-ভাবে তখনকার সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। এই কারণে তিনি কাল-কেতুকে গুজরাটে রাজারূপে অধিষ্ঠিত করান; এবং গুজরাট সহরকে তৎকালীন ফ্যাসানে হিন্দু মুসলমান নানা জাতির লোকের আবাসস্থল রূপে চিত্রিত করেন।

এইজন্য মুকুন্দরামকে জনের অথবা গণের প্রতীক বলা চলিতে পারে না। অতঃপর আসেন বাঙ্গলার বড় কবি "অন্নদা-মঙ্গল"-রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁহার রচনার মধ্যে কেবলমাত্র সামন্ততান্ত্রিক রাজারাজড়ার সংবাদই পাওয়া যায়। তিনি রাজোপাধিধারী এক জমিদারের সন্তান এবং একজন সামন্ত রাজার আশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি রাজাদের অন্দর মহলের কথা, যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনায় স্বীয় কবি-প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিলেন। মুসলমানের অধীন সামন্ত রাজাদের আশ্রয়ে থাকিয়া এবং ঐ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার তৎকালীন হিন্দুজনোচিত পরাভব-মনোবৃত্তি (defeatist mentality) প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ-বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বর্ণনার মধ্যে তৎকালীন বাঙ্গলার হিন্দু-সমাজের মনস্তত্ত্ব বেশ পরিস্ফুট। এই সংক্ষিপ্ত যুদ্ধবর্ণনা হইতে সেই সময়ের বাঙ্গলার হিন্দুর ইতিহাস ও মনোভাব অনেক কিছুই অনুমান করা যাইতে পারে। কবি প্রথমেই বলিতেছেন—

"বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত
মিলে মানসিংহ সনে।"

পরেই আবার কবি বলিতেছেন—

"পাতশাহী ঠাটে কেব কেবা আঁটে।…
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া
প্রতাপাদিত্য হারে"॥

ইহা মুসলমানদের দ্বারা দুইবার বিজিত হিন্দুর পরাভব-মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে। দিল্লীর সম্রাট্ অজেয়, তাঁহার পল্টন সমূহ কখন পরাজিত হয় না; আর ভগবানের কৃপা না হইলে কে কখন বড় হইতে পারে—এই যুক্তি গোলাম জাতিরই মুখ হইতে বাহির হয়। ছোটবেলায় বিশিষ্ট লোকদের মুখে শুনিতাম: ভারতের স্বাধীনতা—যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয় তবে তাহা হইবে। এরূপ উক্তি গোলাম জাতেরই উক্তি। আজকালকার ঐতিহাসিকেরা বলেন যে মানসিংহ সামন্ততান্ত্রিক বাঙ্গলাকে ভাঙ্গিয়া কেন্দ্রীভূত

মোগল-শাসন প্রবর্ত্তন করেন। এতদ্বারা একদিকে যেমন তিনি বাঙ্গালী জাতির শৌর্য্য-বীর্য্য ঠাণ্ডা করিয়া দেন তদ্রূপ অন্যদিকে একটা ভীষণ শ্রেণী-সংগ্রাম (হিন্দুর 'শ্রেণী' জাতি রূপে রূপান্তরিত হওয়ায় শ্রেণী-সংগ্রামকে জাতি-সংগ্রামরূপে দেখিতে ও বুঝিতে হইবে) বাধাইয়া তাহার ফলস্বরূপ বাঙ্গলাকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহোদয়গণ বলিয়াছেন যে বাঙ্গলার কায়স্থ ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের শক্তি বিনষ্ট করিয়া মোগলেরা বাঙ্গলা বিজয় করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহারা বলেন যে বাঙ্গলার কায়স্থ ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা গৌড়ের তথাকথিত পাঠান সুলতানদের স্বার্থের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে মোগলদের পক্ষে বাঙ্গলা বিজয় অনায়াস-সাধ্য হয় নাই। মুনিম খাঁ ও টোডরমোল্ল দাউদ খাঁকে পরাজিত করিলেও বাঙ্গলার সামন্ত রাজাদের জয় করা সহজ হয় নাই। আইন-ই-আকবরীর মতে তখনকার জমিদারেরা সকলেই কায়স্থ। কিন্তু মানসিংহ আসিয়া ভেদবুদ্ধি প্রবর্ত্তন করিয়া বাঙ্গলার সর্ব্বত্র পশ্চিমের হিন্দুদের জমিদারী প্রদান করিয়া বাস করান; আর পশ্চিমবঙ্গে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের জমি প্রভৃতি দিয়া হাত করেন। আজ পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার লোক ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, এবং মানসিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিত ঔপনিবেশিকদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। ইহা হইতে মানসিংহের রাজনীতিক চাল বোঝা যায়। এইজন্যই কবি বলিয়াছেন,—

"বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত
মিলে মানসিংহ সনে।"

কথাটা এই যে কায়স্থ-প্রাধান্যে ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট ছিল না। সেইজন্য ব্রাহ্মণেরা বিদেশীর সঙ্গে সম্মিলিত হয় আর মানসিংহকে ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া পূজা করে। এই সুযোগের ফলে বাঙ্গলার কায়স্থদের পতন হয় এবং উত্তর বঙ্গের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের বড় বড় জমিদারী মোগলেরা বাজেয়াপ্ত করিয়া নেয়। মুঘল যুগ হইতে বাঙ্গলার জমিদারের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ব্রাহ্মণ। বাঙ্গলার কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের শ্রেণী-বিরোধের পরিণামের ইহাই হইতেছে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কবি

মানসিংহের অনুগ্রহভোজী রাঢ়ী ব্রাহ্মণ রাজা (এই ব্রাহ্মণ রাজার উত্তর-পুরুষই প্রতাপাদিত্যের শত্রুতা করিয়াছিলেন) কর্ত্তৃক প্রতিপালিত, কাজেই দুই এক কথায় তখনকার ইতিহাসের তথ্যগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের সময়েই পলাশীর প্রাঙ্গণে বাঙ্গলার ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটে। এই যুদ্ধে বাঙ্গলার কয়েকজন মাতব্বর হিন্দু যে লীলাভিনয় করিয়াছিলেন হালের স্বদেশপ্রেমিক লেখকরা উহার নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই সময় আর এমন কোন বড় সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় নাই যাঁহার লেখা হইতে তৎকালের লোকের মনোভাব বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সেই সময় বহু গ্রাম্য কবিতা রচিত হইয়াছিল, ঐ-গুলিতে পলাশীর যুদ্ধের বর্ণনা আছে এবং অনেক কবিতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অতিবুদ্ধিরও নিন্দা করিয়াছে। বাঙ্গলার ভাগ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা কয়েকজন সামন্ততান্ত্রিক লোকের স্বার্থের জন্যই সংঘটিত হয়। বোধ হয় জনসাধারণ তদ্বারা সুখী হইতে পারে নাই, কারণ ইহার পর নানা প্রকারের প্রজা-বিদ্রোহ, জমিদার-বিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সংঘটিত হইয়া ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এই সময়ের প্রকৃত ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই বলিয়া উহার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভবপর হইতেছে না। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়ের ঘটনা অবলম্বনে "আনন্দ মঠ" ও "দেবী চৌধুরাণী" প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাস লিখিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে পঞ্চাশ বৎসর বাঙ্গলায় এই অরাজকতা বিরাজ করে। এই সময়েই ১৮১৮ সালের বিনাবিচারে আটক রাখিবার Ordinance (Regulation III Act of 1818) আইন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক রচিত ও বিধিবদ্ধ হয়। উক্ত আইন কাহাদের উপর প্রয়োগ করা হইত তা কি ভাবিবার কথা নয়? নিশ্চয়ই এই অরাজকতা নিবারণের জন্য ইহা (উক্ত আইন) প্রয়োগ করা হইত? কেহ কেহ অনুমান করেন যে তখনকার দিনে যে সকল বিদ্রোহী জমিদার খাজনা ও কর প্রদান করিত না এবং অরাজকতা সৃষ্টি করিত তাহাদেরই বিরুদ্ধে ইহা প্রয়োগ করা হইত।

সাহিত্যে সমাজ-চিত্র

(৩)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নবীন ভারতের প্রথম উন্মেষ বাঙ্গলায়ই দৃষ্ট হয়। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ আসিয়া প্রথম লাগে বাঙ্গলায়ই ; ইহার প্রথম ধাক্কাটা রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার শিষ্যবর্গের আন্দোলনের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবেই অনুভব করা যায়। ইউরোপে তখন ফরাসী বিপ্লবের ফল-প্রসূত সভ্যতার মধ্যে মধ্যযুগীয় কোন ভাব ও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় কেবল খাঁটি নিছক বুর্জ্জোয়া সংস্কার! কিন্তু যে সংস্কারের ঢেউ বাঙ্গলায় আসে তাহা প্রকৃত ফরাসী-বুর্জ্জোয়া সংস্কার নয়, বরং ইংরেজ-বুর্জ্জোয়া সংস্কার—ক্রমওয়েলের Puritan ও তাহাদের সন্ততি একেশ্বরবাদীদের (Unitarin) সংস্করণ এবং তৎপরে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের (Mid-Victorian Age) সংস্কার ; ইহাকে "ম্যাঞ্চেষ্টার স্কুলের ভাবধারা" বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই সময়ের শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরেজী-নবিশীতে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল ইংরেজী শিখিয়া তাহার "intellectual isolation" বেশ পাকা রকমেরই হইয়াছিল। সেই সময় হইতে ইংলণ্ডই ভারতের পক্ষে স্বর্গরাজ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং অপরাপর দেশের খবর শিক্ষিত ভারতবাসী রাখিতে বড় একটা চায় নাই! ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রের গণ্ডীবদ্ধতা কতখানি পাকাপোক্ত হইয়া গিয়াছিল তাহা নিম্ন ঘটনা দ্বারাই বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। এই সময় হইতে বিগত পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লণ্ডনে ইউরোপের বড় বড় মনীষী এবং চিন্তা ও ভাবরাজ্যের বিপ্লবীগণের সমাগম হইত এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই আবার তথায় বহুদিন ধরিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই কব্‌ডেন, জন ব্রাইট্‌, জন ষ্টুয়ার্ট মিল,

গ্ল্যাড্‌ষ্টোন, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, মার্টিনো প্রভৃতির সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের ভাবধারা প্রচার করিতে থাকেন। সে সময়ে কার্ল মার্ক্‌স্‌, ম্যাট্‌সিনি লণ্ডনে বাস করিতেন। তাহাদের সঙ্গে কোন ভারতবাসীর সাক্ষাৎকারের সংবাদ কখনও শোনা যায় না। রুশ নেতা ক্রপট্‌কিন্‌ লণ্ডনে বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ভারতীয়দের (একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত) সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে কোনও বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তখন ভারতীয় বুর্জ্জোয়াশ্রেণী ইংলণ্ডের বুর্জ্জোয়া-শ্রেণীর অনুগ্রহপ্রার্থী ছিল। সেই কারণে মানবের মুক্তিকামী অন্যান্য ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই। যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রবলভাবে আন্দোলন চালায় তখন তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহিত্যিক প্রচেষ্টা প্রকট হয়। ইঁহাদের লেখার মধ্যে অতীতকে শ্রদ্ধা করিবার ভাব অধিক প্রবল। অতীতের সমুদয় সভ্যদেশই সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার সহিত সংশ্লিষ্ট। এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ও ব্রাহ্মসমাজের লেখকদের উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিভিন্ন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে জন বা গণের সম্বন্ধে কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। মধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবী কৃষক ও শ্রমিকদের জীবন অবলম্বনে তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। ধনী জমিদার বাড়ীর ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়াই তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাসগুলি রচিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে যে-সাহিত্য বাঙ্গলায় সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রভাবমুক্ত হইতে পারে নাই; এমন কি বর্ত্তমান সাহিত্যও সেই নিগড় সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিতে পারে নাই। ইহার কারণ বাঙ্গলার নবোত্থিত মধ্যবিত্তশ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার আওতায় বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট। এখনও সমাজে আদর্শ হইতেছে মধ্যযুগীয় জমিদার। বাঙ্গলার সমাজে এখনও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ও সম্মান গৃহীত হয় নাই। এইজন্যই পরাশর ও মোগল-পাঠানের সনদপ্রাপ্ত জমিদার এখনও সমাজের শীর্ষদেশে অবস্থিত। বাঙ্গলার অর্থনীতিকক্ষেত্রে Industrialisation এখনও বহুদূরে। সকলেই জমি আঁকড়াইয়া ধরিয়া

আধীতের

পড়িয়া আছেন; অধিকন্তু রাজ্যব্যবস্থাও তাহার অনুকূলে। কাজেই যথার্থ বুর্জ্জোয়া সমাজ বাঙ্গলায় বিবর্ত্তিত ও সংগঠিত হইতে পারিতেছে না বলিয়াই পূর্ণ বুর্জ্জোয়া আদর্শ এখনও সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এক্ষণে বিচার্য্য, 'জন' ও 'গণ' বলিলে কি বুঝা যায়? 'গণ' অর্থে যদি masses বা working class (শ্রমজীবী শ্রেণী) বুঝা হয় তাহা হইলে তাহাদের সমাজের প্রলেটারিয়েট বা শ্রমিকশ্রেণী বুঝাইবে; আর ইহার বাহিরের জনসাধারণ অর্থাৎ Peopleকে যদি 'জন' ধরা হয় তাহা হইলে অভিজাত ও শ্রমিকদের বাহিরে সকল প্রকার শ্রেণীদেরই 'জন' অর্থে বুঝাইবে। এখানে অভিধান বা ইতিহাস ধরিয়া শব্দের অর্থ নির্দ্দিষ্ট করা হইতেছে না। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে Aristocrat ও Patricianশ্রেণী ছিল Populus অর্থাৎ People. ইহাদিগেরই নাগরিক অধিকার ছিল এবং তাহারাই ছিল জনসাধারণ। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিল আর্য্য, তাহারাই রাষ্ট্রের সমস্ত সুখভোগের অধিকারী ছিল। পরে শূদ্র রাজত্বের সময় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য শূদ্রকে 'আর্য্য' বলিয়া স্বীকার করিয়া নেন। তিনি আবার গোলামের পুত্রকেও 'আর্য্য' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং গোলাম তাহার গোলামিত্ব হইতে বিমুক্ত হইলে তাহার আর্য্যত্ব ফিরিয়া পাইবার অনুশাসন দিয়াছেন। শূদ্র হইলেই সে দাস বা গণশ্রেণীর লোক হইত না। এখানে এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য দেওয়ার কারণ এই যে, শব্দের মূল ধরিয়া উহার ব্যবহারিক অর্থ সকল সময় ঠিক থাকে না। চলতি ভাষায় যদি ধরিয়া লওয়া যায় "জন" অর্থে অভিজাত ও শ্রমজীবী এই দুই শ্রেণীর ব্যহিরের লোক সমূহ, তাহা হইলে তাহাদের উপরের স্তরের ও নিম্নস্তরের মধ্যবর্ত্তী মধ্যবিত্ত-শ্রেণী বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে; তদ্রূপ 'গণে'র প্রাচীন সংস্কৃত অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'গণ' অর্থে masses বা proletariat ধরিতে হইবে। এই প্রবন্ধে উক্ত অর্থেই শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হইতেছে।

জনসাধারণ অর্থাৎ 'জন' মধ্য হইতে আজিকার ভারতে শিক্ষিত স্ত্রী ও পুরুষের উদ্ভব হইতেছে। প্রকৃত ভারতের Demos এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায়।

তাহারা অধিকাংশই মধ্যবিত্তশ্রেণী হইতে উদ্ভূত এবং এইশ্রেণীই রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠাস্থাপন প্রয়াসী; বর্ত্তমান ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা, আশা-ভরসা এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টা এখনও তাহাদিগকে লইয়াই। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর আদর্শ দ্বারাই ভারত এখনও পরিচালিত হইতেছে; কাজেই কর্ম্মক্ষেত্রে 'জনে'র প্রাধান্য এখনও প্রবল। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীকেই ফরাসী ভাষায় "বুর্জ্জোয়া" (bourgeois) বলা হয়। ইউরোপের মধ্যযুগে দাসত্ব-মুক্ত গোলামের পুত্রগণ একজন ব্যারণের (baron) আশ্রয়ে থাকিয়া অথবা তাহার সহরে আসিয়া বাস করিলে তাহাকে 'বুর্জ্জোয়া', অর্থাৎ বুর্গের (কেল্লার) লোক বলিয়া অভিহিত করা হইত। ক্রমে ইহার অর্থ দাঁড়ায় সহরের লোক—যে অভিজাতও নহে এবং সার্ফ-দাস অথবা গোলাম নহে। এইজন্য রাষ্ট্রে তাহার স্থান ছিল না। ক্রমে শিক্ষালাভ এবং অর্থোপার্জ্জন করিয়া সহরের এই শ্রেণীর লোকেরা তৃতীয় শ্রেণীরূপে (Third Estate) বিবর্ত্তিত হয়। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে রক্তাক্ত বিপ্লব দ্বারা তাহারা রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করিয়া 'জাতিতে' উঠে। এক্ষণে ইউরোপে যাহারা প্রলেটারিয়েট নয় তাহারা 'বুর্জ্জোয়া' বলিয়া অভিহিত হয়। এই অর্থের একটি বিশেষ কারণ এই যে, অভিজাতশ্রেণী ও ধনী বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর লোকেরা ক্রমশঃ মিশিয়া গিয়া শ্রমিকের প্রতিপক্ষ 'ধনী শ্রেণী' বিবর্ত্তন করিতেছে।

কিন্তু ভারতে বিপ্লবী ব্যবসায়ী বুর্জ্জোয়াশ্রেণী এখনও সম্পূর্ণরূপে উদ্ভূত হইতেছে না। বিশেষতঃ বাঙ্গলায় ইংলণ্ডের Squirearchyর ন্যায় একটী জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়ায় Land Capitalism এখনও বিশেষভাবে প্রবল। এইজন্য Industrial Capitalism বাঙ্গলায় ভালভাবে ক্রমবিকশিত হইতেছে না। এখানে মধ্যযুগীয়, সামন্ততান্ত্রিক বারভূঁইয়া দল আর নাই। মোগলপাঠানের সনদধারী অভিজাতের সংখ্যা কম; বরং ইংরাজের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাহাত্ম্যে জমিদার দল সৃষ্ট হইয়াছে এবং সমাজ এখনও তাহাদের আওতায় আছে। বাঙ্গলার গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহাদের মুখাপেক্ষী। এইজন্য এখনও বাঙ্গলায় বিপ্লবী বুর্জ্জোয়ার আবির্ভাব হয় নাই।

এক্ষণে কথা উঠে, বুর্জ্জোয়ার কার্য্য কি ? ইতিহাসে দেখা যায় যে সমাজের ক্রম-বিকাশের পর্য্যায় কৌমাবস্থার (tribal stage) পর একরাটত্ব (kingship), তৎপর যথেচ্ছাচারী একরাটের অধীনে সামন্ততন্ত্র বিবর্ত্তিত হইতেছে। এই অভি-জাত সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া ব্যবসায়ী মধ্যবিত্তশ্রেণী শুধু রাষ্ট্র দখল করে না, পূর্ব্বের সমাজের রূপও পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। পূর্ব্বে ফরাসী দেশে এই বুর্জ্জোয়া-বিপ্লব সম্পূর্ণরূপে সংঘটিত হইয়াছে, আর অধুনা হইয়াছে কামালের তুর্কীতে। ইংলণ্ডে ক্রমওয়েলের অধীনে বুর্জ্জোয়াশ্রেণী বিপ্লব করিয়া জাতে উঠিলেও অভি-জাত রাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বুর্জ্জোয়াশ্রেণী দ্বারা সমাজের পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ সংসাধিত হইয়াছে। ইহার ফলে ইংলণ্ড আর প্ল্যাণ্টাজেনেট বংশের (Plantagenet Dynasty) অধীন হয় নাই।

বুর্জ্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে একটা নূতন কথা রাজনীতিক্ষেত্রে সৃষ্ট হইয়াছে: Functions of a bourgeois-democratic revolution (বুর্জ্জোয়া-সাম্যবাদী করণীয় পরিবর্ত্তন)। এই শব্দ লেনিন ও তাঁহার দল কর্তৃক সৃষ্ট হই-য়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার অর্থ বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করিয়া সামন্ততান্ত্রিক সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য যে-সব সংস্কার প্রয়োজন তাহার সংসাধন। ইহারই ফলে বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক সভ্যতার বিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশ হইয়াছে। অবশ্য শ্রেণীস্বার্থ প্রণোদিত হইয়াই ইহা করা হয়। কিন্তু এতদ্বারা অতীতের প্রাচীনত্ব বিনাশ করিয়া হালের জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়। এই সংস্কার সাধন না হওয়া পর্য্যন্ত মানব সমাজ ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশে এই প্রকার জাতীয় রাষ্ট্র সংগঠিত হইয়া সেখানকার মানব কৌমাবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা এবং মধ্যযুগীয় সভ্যতার স্তর অতিক্রম করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে এসিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ সেই ধারা অবলম্বনে জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করিতেছে। ভালই হউক আর মন্দই হউক, জগতে এই ধারাই চলিতেছে। এই সভ্যতা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নামে মানব মনকে ভোলায় এবং নানা শক্তির সংঘাত ও সংঘর্ষের ফলে বুর্জ্জোয়া সভ্যতা, রাজ-

নীতিক সাম্য অর্থাৎ সকলের ভোটাধিকার পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। অবশ্য এই বুর্জ্জোয়াতন্ত্রের অধীনে পুঁজিবাদ (capitalism), সাম্রাজ্যবাদ (imperialism) স্বার্থপর ব্যক্তিত্ববাদ (individualism) প্রভৃতি দেখা দেয়। ফলে সমাজে মুষ্টিমেয় ধনীর প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আজকালকার কাহারও কাহারও মত এই যে, সমাজের রাজনীতিক সাম্যবাদ সম্মত সংস্কার সাধিত না হইলে প্রকৃত অর্থনীতিক সাম্য বিবর্ত্তিত হইতে পারে না। একদল সমাজতাত্ত্বিকের মত এই যে, প্রাচীন অবস্থা হইতে একটা দেশকে "আধুনিক" সভ্য অবস্থায় উন্নীত করিতে হইলে, ইহাকে এবম্প্রকারের সমস্ত সংস্কার সমূহের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

এক্ষণে আমাদের বিচারের বিষয়বস্তু হইতেছে—ভারত বর্ত্তমানে কোন অবস্থায় অবস্থিত আছে। ভারতে আদিম অবস্থার লোকও আছে এবং অতি আধুনিক কৃষ্টিসম্পন্ন লোকও আছে। ভারতীয়দের মধ্যে কৌমাবস্থার (tribal stage) লোকসমষ্টিও আছে, বুর্জ্জোয়া আদর্শে গঠিত সমাজও রহিয়াছে, স্থান বিশেষে বহুস্বামীত্বও (polyandry), বহুপত্নীত্ব (polygamy) এবং এক-পত্নীত্বও আছে। ভারতীয়েরা জন্মগত বিভিন্ন জাতি (caste), ধর্ম্মের দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই সকল কারণে তাহাদের মধ্যে মূলজাতি-গত একতাবোধ (racial unity) নাই; রাজনীতি ও অর্থনীতিগত এবং ঐতিহাসিক একতাবোধ-জনিত একজাতীয়তা (Nationality) বোধ এখনও সম্যক উদ্বুদ্ধ হয় নাই। সাধারণের মধ্যে এখনও মধ্যযুগীয় মনোভাব বর্ত্তমান; তজ্জন্য ধর্ম্মের একতা দ্বারা একজাতীয়তা সংস্থাপনের কথা মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। আবার ভাষার গণ্ডী দ্বারা প্রাদেশিক একজাতীয়তা সংগঠ-নের প্রস্তাবও মাঝে মাঝে শোনা যায়। এই প্রকারে ভারত ঐক্যের পরিবর্ত্তে অনৈক্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়াই মনে হইতেছে।

ভারতে ভাষা ও মূলজাতিগত (racial) পার্থক্য ও বিভিন্নতা চিরকালই রহি-য়াছে; ধর্ম্মের বৈষম্য হেতু সাম্প্রদায়িক প্রভেদ বরাবরই আছে। তথাপি মৌর্য্য ও গুপ্তযুগে ভারত রাজনীতিক একজাতীয়তা সংগঠন করিয়াছিল এবং

তৈমুরের বংশের অধীনে হিন্দু ও মুসলমান লইয়া একটা ভারতীয় একজাতীয়তা বিবর্ত্তনের প্রয়াস চলিতেছিল। এই প্রয়াসকে অধিকতর সফলকাম করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাট আকবর "দীন ইলাহি" * (Din-Ilahi) ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে বিশেষ-ভাবে প্রয়াসী হন।

আকবরের "দীন ইলাহী" ধর্ম্ম সফল হইতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তৈমুরবংশের নেতৃত্বাধীনে যে নূতন সভ্যতা ক্রমবিকশিত হইতেছিল তাহাতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দানই ছিল। এতদ্দ্বারা উহা ঐক্যের পথেই অগ্রসর হইতেছিল। ফলে উর্দ্দু ভাষা ও সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয় এবং তৎসঙ্গে ভারতে একই ধরনের চাল-চলনের প্রচলন হয়। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সময় হইতেই প্রতিক্রিয়া সুরু হয়, এবং শেষ পর্য্যন্ত গোঁড়ামীই জয়ী হয়। বাঙ্গলায় হিন্দুর পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশ হওয়ায় বাঙ্গলা সাহিত্যে উহার কোন প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় না, সীতারামের প্রচেষ্টার বিবরণ এতদিন শুধু গ্রাম্য গল্পের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; শোভাসিংহ ও উদিতনারায়ণের বিদ্রোহও কেবল লোকের স্মৃতিপটেই অঙ্কিত ছিল। এইসকল ঘটনাবলীর কোন সংবাদ সাহিত্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু মগ ও পর্ত্তুগীজ বোম্বাটিয়াদের অত্যাচার কাহিনী সাহিত্যের আনাচে-কানাচে সন্ধান করিলে পাওয়া যায় ("রাত্রিদিন বহে যায় হার্ম্মাদার ডরে"—মুকুন্দরাম)।

ইহার পর ইংরেজ আমলে সমগ্র ভারত এক শাসনাধীন হইলে ভারতে একটা রাজনীতিক একত্ব সম্পাদিত হয়। এতৎসঙ্গে যাতায়াতের সুবিধা, এক ভাষা শিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা ভারতের বাহ্যিক একত্ব কথঞ্চিৎ সম্পন্ন হইতে থাকে।

* প্রাচীন ইজিপ্তে ইখ্‌নাটনের একেশ্বরবাদের উৎপত্তির পশ্চাতেও যে-প্রেরণা ছিল আক্‌বরের এই নবধর্ম্ম "দীন ইলাহি" ধর্ম্মের পশ্চাতেও সেই একই প্রেরণা ছিল। "আইন-ই-আকবরী"র প্রথম ভাগে "দীন ইলাহি"র উৎপত্তি ও মতসমূহ পাঠ করিলে এই ধারণা জন্মে, যে-"ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা" (Materialistic Interpretation of History) উক্ত প্রচেষ্টার মূলে কার্য্য করিয়া-ছিল; তাহা হইতেছে—একটা নূতনধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া সকল প্রজাদের উহা গ্রহণ করাইয়া এক অখণ্ড অ-হিন্দু অ-মুসলমান ভারতীয় রূপে সংঘবদ্ধ সমগ্র দেশের লোকদের তৈমুরবংশের অধীনে একটা একজাতীয়তা বিবর্ত্তন করা।

ভারত আবার এক রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও ঐতিহাসিক যন্ত্রের মধ্য দিয়া পিষ্ট হইয়া একজাতীয়তার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ফলস্বরূপ ভারতের সকল প্রদেশের লোকেরা আপনাদিগকে 'ইণ্ডিয়ান' (Indian) নামে অভিহিত করিতে শিখে, সকলের সুখ-দুঃখের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন—একথা বুঝিতে সক্ষম হয়।

এই নিখিল ভারতীয় একত্ববোধ ভারতের শিক্ষিত বুর্জ্জোয়া অথবা মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যেই জাগে। ইংরেজ শাসনের আওতায় উদ্ভূত মধ্যবিত্তশ্রেণী কৌমগত (tribal), ধর্ম্মগত অথবা ভাষাগত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বিবর্ত্তিত হয় নাই। সমগ্র ভারত তাহার কর্ম্মস্থল; ভাষা ও প্রদেশের ব্যবধান তাহার কর্ম্মক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে নাই। এইজন্য বাঙ্গলার রামমোহন, কেশব-চন্দ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত এবং শিষ্য ও অনুবর্ত্তী প্রাপ্ত হন। এই কারণ গুজরাটের মূলশঙ্কর ওরফে স্বামী দয়ানন্দ পাঞ্জাবেই বিশেষভাবে গৃহীত হন। ভাবের এই আদান প্রদানের ফল বাঙ্গলা সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যে রাজপুতনার বীরগাথা স্থান পাইয়া প্রতাপ সিংহ, হল্‌দীঘাট, কৃষ্ণকুমারীর নাম বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত হয়। পঞ্জাবের গুরুগোবিন্দ সিংহ ও পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ প্রভৃতির কীর্ত্তিকাহিনী বাঙ্গলা সাহিত্যে স্থান লাভ করে। এই সময়ে বাঙ্গলা সাহিত্যে অখিল ভারতীয় স্বদেশপ্রেম বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। হেমচন্দ্রের "ভারত সঙ্গীত", "ভারত বিলাপ", ভূদেবচন্দ্রের "স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস", গিরীশচন্দ্রের "হল্‌দী-ঘাটের যুদ্ধ", রমেশ চন্দ্রের "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা", "মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত" প্রভৃতির দ্বারা নিখিল ভারতীয় ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে।

এই সময়ে প্রাদেশিক স্বদেশপ্রেম কাহারও মনে স্থান পায় নাই। এই যুগে ইটালীর বিপ্লবী নেতা ম্যাট্‌সিনী ছিলেন বুর্জ্জোয়া স্বদেশ প্রেমের আদর্শ। তাঁহার "Italia Uni" (যুক্ত ইটালী) ভাব এদেশের তরুণ বুর্জ্জোয়া নেতাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার আত্মজীবনীতে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে ম্যাট্‌সিনির আদর্শে তাহারা "যুক্ত

ভারত" গঠনের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হন। ঠিক এই সময়েই শিক্ষিত লোকেরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাহারই ফলে "India League" ভারতের বিভিন্নস্থানে স্থাপিত হয়। পর বৎসর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিক আন্দোলন পরিচালনা করিবার জন্য "জাতীয় মহাসমিতি" (Indian National Congress) স্থাপিত হয়। এতদিন নবোদ্ভূত জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন দ্বারা আপনাদিগকে প্রকট করিতেছিল। এক্ষণে সেই শক্তি রাজনীতিক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা ও আশা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রকাশের প্রয়াস আরম্ভ করিলে সাহিত্যেও উহা প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক গানগুলিতেই তাহা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর "নমো হিন্দুস্থান" নামক জাতীয় সঙ্গীত ভারতীয় একত্ব প্রচেষ্টার পরিচয় প্রদান করে। তৎপর "বঙ্গভঙ্গ" ও "স্বদেশী" আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোভাব সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রকট হয়। মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাজনীতিক বুলি হইতেছে জাতীয়তা (Nationalism)। এই সময় জাতীয়তাবাদের চরমরূপ প্রদর্শিত হয় গরমপন্থী স্বদেশপ্রেমিকদের সাহিত্যে। গান, সংবাদ পত্র দ্বারা উক্ত মনোভাব বিশিষ্টরূপে ধারণ করে। "সন্ধ্যা", "নবশক্তি", "যুগান্তর" এইভাব প্রচারের ভার গ্রহণ করে। যুগান্তর সোজাসুজি জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিতে থাকে। এইযুগে নাটকেও জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশ পায়। ক্ষীরোদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের "প্রতাপাদিত্য", গিরিশচন্দ্রের "অযোধ্যার বেগম" তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। সখারাম দেউস্করের লিখিত 'দেশের কথা' প্রভৃতি পুস্তকে ভারতীয়দের দেশের লোকের অর্থনীতিক ও রাজনীতিক অবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়া তাহা সাধারণের গোচরীভূত করা হয়। এই সঙ্গে গরমপন্থী দল জাতীয়তার ব্যাখ্যার সহিত রামায়ণ কথকতার উদ্ভব করে; সঙ্গে সঙ্গে মুকুন্দদাসের "স্বদেশী যাত্রা"র সৃষ্টি হয়। এই "স্বদেশী যুগই" জাতীয়তাবাদ বিকাশের অনাবিল অবস্থা। বাঙ্গলার এই "Storm and Stress Period" (ঝটিকা ও গুরুত্বের যুগ)-এ

militant nationalism (আক্রমণশীল জাতীয়তাবাদ) উদ্ভূত হয় এবং বাংলার মনে উহার ছাপ স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই যুগেই বিপিনচন্দ্র পাল, "The spirit of nationalism নামক পুস্তিকা লিখিয়া জাতীয়তাবাদের দর্শন প্রদান করে।

যদি কেহ মনে করেন যে 'জন' লোকের ভাবোচ্ছ্বাস, জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও উন্মাদনাপূর্ণ লেখার জন্য বাঙ্গলার মরা গাঙ্গে (নদী) নূতন তেজের বন্যা আসিয়াছিল তাহা হইলে তাঁহারা আসল কারণটা ধরিতে পারেন নাই। বঙ্গ-ভঙ্গ দ্বারা বাঙ্গলার গরীব কৃষক ও শ্রমিক যাহারা 'গণ' সমূহ নামে অভিহিত, তাঁহাদের কি লোকসান হইত তাহা আজও অবধি কাহারও বোধগম্য হয় নাই। কিন্তু এতদ্বারা ধনিকশ্রেণী সমূহের বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল বলিয়া প্রবল আন্দোলন উঠে। বঙ্গভঙ্গের পর জমিদারদের সহিত জমিবিষয়ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) গভর্ণমেণ্ট প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারেন—এই আশঙ্কা ও ভয়ই বাঙ্গলায় জমিদার, তালুকদার প্রভৃতিদের হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তোলে! অবশ্য এই শ্রেণীগুলি সংখ্যায় অধিকাংশই হিন্দু; সেইজন্য হিন্দুদের প্রতিবাদ ও ক্ষোভ এত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীদ্বয় ধনীদের তাঁবেদার; কাজে-কাজেই হৈ-চৈ করিবার লোকের অভাব হয় নাই। এইজন্যই হিন্দুর প্রতিবাদ এরূপ বিশাল আকার ধারণ করে। হিন্দু বনিয়াদী স্বার্থে (vested interests) আঘাত পড়িবার বিশেষ আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ার তদ্বারাই এই বিরাট আন্দোলন সংঘটিত হয়। কিন্তু উপরের স্তরগুলি গরমপন্থী হয় নাই; নিম্নস্তরের বুর্জ্জোয়া শ্রেণীই এই পন্থা অবলম্বন করে। ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গলায় বুর্জ্জোয়া শ্রেণী তখন নিজেকে শিক্ষা দীক্ষায় ইংরাজ বুর্জ্জোয়ার সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতে স্বরু করিয়াছে, তাহারা আর "আবেদন নিবেদনের থালা" হাতে বহন করিয়া নতশির হইতে চায় নাই। এইজন্যই Autonomy (স্বায়ত্তশাসন) তাহাদের কাম্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। পরে, "Swaraj is our birth right" (স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার)—এই বুলি জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা

অধিবেশনে গৃহীত হয়; সেই সময় হইতে বুর্জ্জোয়া শ্রেণীদ্বয় এই বুলির মন্ত্র করিতেছে; কিন্তু ইহার অর্থ কি, ইহার স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে আজও অবধি নানা মুনির নানা মত। এইজন্য স্বরাজের কর্ম্মপদ্ধতি পরিষ্কাররূপে বিবৃত করিয়া কোন সাহিত্য প্রকট হয় নাই। তৎপর আসে ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন। ইহা গুটিকয়েক চরখার ও "অসহযোগের" মাহাত্ম্য বর্ণনা করা ব্যতীত বিশিষ্ট কোন সাহিত্য উদ্ভব করিতে পারে নাই। শিক্ষিত ও বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর পরিস্থিতি ও আদর্শের আবিলতাই ইহার জন্য দায়ী। উপস্থিত সময়ে, একটি কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন ভারতে সংগঠিত হইয়াছে। তজ্জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকদের দ্বারা "জন" ও 'গণ' বিষয়ে লিখিত খানকতক নভেলও প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য ইহা বুর্জ্জোয়া বা প্রলেটারীয় শ্রেণীর অন্তর্গত সাহিত্য নহে। বুর্জ্জোয়া আদর্শ পরিষ্কার নহে বলিয়া বুর্জ্জোয়া স্বার্থ প্রণোদিত সাহিত্যের উদ্ভব হয় নাই। আর বর্ত্তমানের 'গণ সাহিত্য' অর্থে গণের জীবনী অবলম্বন করিয়া উপরি স্তরের লোকদের দ্বারা লিখিত নভেল! ইহা হইতে দৃষ্ট হয়, সমাজের পরিস্থিতি যে প্রকারের, সাহিত্যও তদ্রূপ তাহার প্রতিবিম্ব বহন করিতেছে।

হিন্দী সাহিত্যে প্রগতি

(১)

এক্ষণে হিন্দী সাহিত্য বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করিব। বাংলা ও ভারতীয় অন্যান্য আর্য্য ভাষার ন্যায় হিন্দী ভাষাও প্রাকৃত ভাষা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে (১)। পশ্চিমে সিন্ধু দেশের পূর্ব্বভাগ থেকে বাংলার পশ্চিমভাগ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন ভাষা সমূহ লোক মধ্যে প্রচলিত আছে সেইগুলিকে আজকাল হিন্দী ভাষা বলা হয়। মধ্য যুগে আর্য্যাবর্ত্তের এই খণ্ডের ভাষাকে পণ্ডিতেরা "হিন্দী প্রাকৃত" বলিতেন, যেমন বাংলাকেও "গৌড় প্রাকৃত" বলা হইত। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রাক্কালে দিল্লীর দরবারের রাজকবি তুর্কী বংশজাত আমীর খসরৌ বলিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুদের একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে—তাহা হিন্দী (২)। ইহা ফার্সী অপেক্ষা উন্নত, আর ফার্সী ভাষা যেমন আরবী ভাষার সহায়তা ছাড়া দাঁড়াইতে পারে না, হিন্দী অন্যপক্ষে একটি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল ভাষা (৩)। এই খসরৌ প্রথমে হিন্দী ফার্সী মিলাইয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন (৪)। আজকাল হিন্দী বলিয়া যে ভাষা লোকসমাজে ধরা হইতেছে তাহার মূল ভিত্তি হইল "খড়ি বোলী।" এ ভাষা দিল্লীর চারপাশে প্রচলিত আছে। ত্রিপাঠী বলেন, এই "খড়ি বোলী"

(১) Grierson—Linguistic Survey দ্রষ্টব্য।

(২) তিনি হিন্দুর ভাষা অর্থে হিন্দী ও হিন্দুবী দুই শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার "খালিকবারী" দ্রষ্টব্য।

(৩) Elliot—"History of India told by her own Historians" এবং উপাধ্যায়—হিন্দীভাষা ঔর উসকে সাহিত্যকা বিকাশ, পৃঃ ৪৯ দ্রষ্টব্য।

(৪) রামনরেশ ত্রিপাঠী—কবিতা কৌমুদী ৪র্থ ভাগ, উর্দ্দু পৃঃ ২।

ব্রজভাষা হইতে স্বতন্ত্র (১)। আমরা দেখি যে, হিন্দী বলিয়া আজ একটি সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহা রাজনীতিক কলহের আবর্ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে দেখিলে দেখা যায় যে আর্য্যাবর্ত্তের এই বিশাল অংশে নানাপ্রকারের উপভাষা আছে। প্রাচীনকালের ভারতীয় পণ্ডিতেরা, সৌরসেনী প্রাকৃত এবং মাগধী প্রাকৃত নামে উত্তর ভারতের ভাষাকে বিভক্ত করিয়াছেন। গ্রিয়ারসন মহোদয় হিন্দীর দুইটা উপভাষা আছে বলেন : পূর্ব্বদিকের আর রাজস্থানের। আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে এর আরও উপভাষা পাওয়া যায় যথা—'মঘাইয়া বোলী', 'মৈথিলী', 'খড়ি বোলী', 'বঙ্গেড়ু', 'ব্রজভাষা', 'রাজস্থানী', 'বুন্দেলখণ্ডী', 'বাগেলখণ্ডী', 'ভোজপুরিয়া' ইত্যাদি। আবার রাজস্থানীর ভিতরও বহু উপভাষা আছে। এইগুলির ব্যাকরণ যে এক তাও নয়। তবে হিন্দুর ভাষা—হিন্দী, আর ভারতবর্ষের বাইরের মুসলমান দেশসমূহে ভারতবাসীকে "হিন্দী" বলিয়া অভিহিত করা হয় বলিয়া "হিন্দীভাষা" (২) বলিয়া একটা কথা চলিয়াছে। এই উপভাষাগুলির মধে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর পর্য্যন্ত চলিত ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সাদৃশ্য আছে (৩)। বাংলা ও বিহারের ভাষা মাগধী ভাষা প্রসূত (৪)। হয়তো বাংলার রাজনীতিক ক্ষমতা থাকিলে এই উপভাষাগুলি বাংলা ভাষার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু ইতিহাসের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে এই

(১) রামনরেশ ত্রিপাঠী—কবিতা কৌমুদী ৪র্থ ভাগ, উর্দ্দু, পৃঃ ১। গ্রিয়ারসন ও দ্রষ্টব্য।

(২) প্রাচীন মুসলমান লেখকেরা "জবানে হিন্দোস্তান" হিন্দী বা হিন্দবী বলিয়া হিন্দুর ভাষার নামকরণ করেন। সূর্য্যকান্ত শাস্ত্রীর "হিন্দী সাহিত্যকা বিবেচনাত্মক ইতিহাস", পরিশিষ্ট পৃঃ ২৬ দ্রষ্টব্য।

(৩) আরা ও গোরক্ষপুর জেলার লোকদের কাছ থেকে লেখক শুনিয়াছেন যে, বাংলা ভাষা দেবনাগরীতে লিখিতে হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন।

(৪) পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী শাস্ত্রাচার্য্য বলেন "প্রকৃত প্রস্তাবে সৌরসেনী ও মাগধী ভাষাভাষী আর্য্যদের আচার ব্যবহার এবং স্বভাব অনেক বিভিন্ন ছিল।"

—হিন্দী সাহিত্যকা ভূমিকা পৃঃ ১৭।

সব স্থানে দিল্লীর চলিত ভাষাপ্রসূত হিন্দী ও উর্দ্দু আসিয়া দখল করিয়াছে। প্রাচীনকালে এই সব স্থান 'গৌড়-চক্রে'র অন্তর্গত ছিল (১)। হয়তো সেই সময়ে বাংলা ভাষা ও এই সব স্থানের ভাষার বিশেষ প্রভেদ ছিল না। কিন্তু আজ এই খণ্ডের ছাত্রদের তথাকথিত হিন্দী সাহিত্য শিখিতে হইতেছে এবং তাহাদের মাতৃভাষা যাহাকে আজ গ্রাম্য বা ঠেঁট হিন্দী বলা হয়, তাহা মরিতে বসিয়াছে (২)। বর্ত্তমান সময়ের হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য অতি আধুনিক। ইহার ব্যাকরণ উর্দ্দুর সঙ্গে মেলে। এখন হিন্দী সাহিত্যিকেরা হিন্দী ভাষাকে সপ্তম বা অষ্টম সম্বৎ হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। আবার হর-প্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় নেপাল থেকে "বৌদ্ধ গান ও দোহা" বলিয়া যে তিনখানি পুস্তক আবিষ্কার করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা "অপভ্রংশ" ভাষাতে লিখিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। হিন্দী সাহিত্যিকেরা ইহাকেও হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া দাবী করিয়াছেন (৩)। কিন্তু বাংলা ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন ইহা প্রাচীন বাংলা। এ থেকে এই বুঝা যায় যে বর্ত্তমানের হিন্দী ও বাংলা ভাষা উপরের দিকে গিয়া এমন জায়গায় উপস্থিত হয় যাহাকে উভয় ভাষাই নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারে।

এখানে হিন্দী সাহিত্যের Chauvinismএর (আক্রমণশীলতার) কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইল। এই বিষয়ে লেখক নিজেকে পক্ষপাতশূন্য বলিয়া মনে করেন, কিন্তু এই হিন্দী বা উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানী ভাষা বর্ত্তমান সময়ে ঘোর রাজনীতিক আবর্ত্তে ঘুরিতেছে। কংগ্রেস আবার একটি কল্পিত (artificial) হিন্দুস্থানী ভাষা এই খণ্ডে মাতৃভাষারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তাহা আরো ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হিন্দী ভাষার একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

(১) "আর্য্য মঞ্জুশ্রী মুলকল্প" দ্রষ্টব্য।

(২) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন মৈথিলী ছাত্র লেখকের নিকট অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তথাকার বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের হিন্দী ভাষা শিখিতে বাধ্য করিয়াছে ও তাহাতে তাহাদের মাতৃভাষা মৈথিলী ভুলিতে হইয়াছে। উপস্থিত তাহাদের মাতৃভাষা শিক্ষা করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া শ্রুত হয়।

(৩) শুক্ল—"হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস"—পৃঃ ৮।

করিতে গেলে এই সব ব্যাপার উল্লেখ প্রয়োজন বলিয়া এই স্থানে উল্লিখিত হইল।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচকেরা সাহিত্যকে Romantic, Neo-Romantic, Idealist, Neo-Idealistic, Symbolist, Realist, Neo-Realist, Impressionist প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন (১)। আবার ভিক্টর হুগো বলিয়া গিয়াছেন (তাঁর 'ক্রময়েল' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য) যে প্রত্যেক জাতির সাহিত্য উপর্য্যুপরি তিনটি ধাপ দিয়া অগ্রসর হয়, যথা: Lyric, Epic, Dramatic। এই ছিল একদিনের সাহিত্যিক সমালোচনার সনাতন পদ্ধতি (২)। কিন্তু হালে Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সোরোকিন (৩) সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমস্ত বিষয়কে Ideational, Idealistic এবং Sensate এই তিনটা সামাজিক পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। আর ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসকে Heroic Age, Classical Age, Feudal Age, Bourgeoisie Age প্রভৃতি যুগে ভাগ করেন। আর আধুনিকতম সমাজতাত্ত্বিকেরাও এই এক একটি ঐতিহাসিক যুগের সংস্কৃতি ও তার বাহন সাহিত্যকে ওই সব যুগে বিভক্ত করেন। সভ্যতার ক্রমোন্নতির প্রত্যেক স্তরের পরিচয় সেই সময়কার সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। একটি অতীত জাতির ইতিহাস যেমন তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহের মধ্যে কিঞ্চিৎ পাওয়া

(১) K. T. Butler—"A History of the French Literature".

(২) Sorokin—"Social and Cultural Dynamics". Vol. I. pp. 595-96.

(৩) সরোকিন এই তিনটি পর্য্যায়ের যথাক্রমে নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যথা:—(১) যে সাহিত্যে অদৃশ্য জগৎ, পরীক্ষামূলক জ্ঞান ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু, যাহাতে শব্দ ও মূর্ত্তিসমূহ এই জগতের প্রতীক মাত্র বলিয়া আলোচিত হয়—উহা Ideational. (২) যে সাহিত্যে পরীক্ষামূলক জ্ঞান (empirical knowledge) প্রসূত অনুষ্ঠানসমূহকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়, উহা Sensate or Impressionist. (৩) আর এই দু'য়ের মিশ্রিত সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে Idealistic বা Mixed বলা হয়। সরোকিন পৃঃ ৫৯৫—৫৯৭।

যায়, তেমনি একটী জীবিত জাতির প্রত্যেক যুগের ইতিহাস তার তৎকালীন সাহিত্য মধ্যে প্রতিফলিত হয়। আবার মনুষ্য সমাজ একস্থানে চিরকাল দাঁড়াইয়া থাকে না। সমাজ গতিশীল (dynamic), প্রত্যেক যুগের সভ্যতার গতির দ্বারা মানব সমাজ রূপান্তরিত হইতেছে। কাজেই প্রত্যেক যুগের মানুষের মনস্তত্ব এক প্রকারের নয়। ইহা সত্য যে, রূপ ও রস নিয়াই সাহিত্য কিন্তু রূপরসও আপেক্ষিক বস্তু। যুগে যুগে মানুষের রুচি ও ধারণা বদলায়। কাজেই বিভিন্ন যুগের সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিভিন্ন প্রকারের হইবে। মানব সমাজ যেমন যুগে যুগে বিবর্ত্তিত হইতেছে তাহার সাহিত্যও তেমনি প্রগতিশীল হইতে বাধ্য। কাজেই সাহিত্যে প্রগতির অনুসন্ধান করিতে গেলে তাহা 'মতলব-বাজের' কাজ' বলিয়া শ্লেষ করা অর্ব্বাচীনের কথা হইবে। এই কথা বলিয়া আমরা হিন্দী সাহিত্যের সমাজতাত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রগতির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। হিন্দী সাহিত্যে আমরা Heroic ও Classical Age-এর সন্ধান পাই না; কারণ তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত। সত্যই স্বর্গীয় অধ্যাপক ভিণ্টারনেটস্(১) বলিয়াছেন যে ভারতীয় সাহিত্যের যুগ বড় লম্বা—এ বৈদিক সমাজ থেকে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রাচীন ভারতীয় জাতির বংশধরেরা আজও ভারতখণ্ড থেকে বিলুপ্ত হয় নাই, যদিচ রাষ্ট্র ও সমাজকে নানা প্রকারের ঘুর্ণি-পাকে পতিত হইতে হইয়াছে। এই জন্যেই ভারতবাসীদের প্রাচীন যুগসমূহের নিদর্শন সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যেই পাওয়া যায়। যখন হিন্দী ভাষা অভিব্যক্ত হইল, তখন ভারতবর্ষ সামন্ত যুগেই (Feudal Age) উপনীত হইয়াছিল। হিন্দী ভাষায় যেসব বীরগাথা আছে, তা সামন্ত যুগেরই পরিচয় প্রদান করে। এর পূর্ব্বের অপভ্রংশ ভাষাতে যেসব লেখা হইয়াছে তাহা ধর্ম্মাত্মক সাহিত্য, কিন্তু তাহাকে হিন্দী সাহিত্য বলা যায় কি না প্রশ্ন উঠিতে পারে। এখন কথা উঠিবে যে, হিন্দী ভাষার জন্মকালকে আমরা সামন্ত যুগে ফেলিব কেন? তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে যে, ভারতে সামন্ত যুগ কখন আরম্ভ হয়? ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যো-প্যাধ্যায় বলিয়াছেন যে, রাজপুতেরা সামন্তযুগ ভারতে আনয়ন করিয়াছিল, কিন্তু

(১) "History of Sanskrit Literature" দ্রষ্টব্য।

আমরা জানি না, তাঁহারা কোথা থেকে এটা পাইয়াছিলেন (১)। কিন্তু আজকালকার ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারিগণ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র অতি প্রাচীনকাল থেকে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়। বোধ হয়, মৌর্য্যযুগের পরে ইহা ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়াছিল। গুপ্তযুগকে সামন্ততান্ত্রিক যুগ বলা হয়। হর্ষবর্দ্ধনের পর হইতে উত্তর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপন পর্য্যন্ত সামন্ততন্ত্র জাজ্জ্বল্যমানভাবে বিরাজ করিত। কাজেই দেখা যায় যে, রাজপুতদের উত্থানের আগেই ভারতীয় সমাজের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই জন্যেই হিন্দী সাহিত্যের প্রারম্ভকাল আমরা রাজপুত শাসনকালীন সামন্ততান্ত্রিক যুগেই নির্দ্ধারিত করিলাম। এই বিচারের সমর্থন আমরা সূর্য্যকান্ত শাস্ত্রীজীর কাছ থেকে পাই। তিনি বলেন, "হিন্দী ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যের জন্ম রাজপুতানায় হইয়াছে।" (২) এই স্থলে কথা উঠে সামন্ততান্ত্রিক যুগের লক্ষণ কি? সর্ব্বপ্রথম লক্ষণ, যে জমির মালিকানা সত্ব রাজা হইতে ধাপে ধাপে নামিয়া প্রজাতে যায় (Sub infeudation of land), 'স্বামিধর্ম্ম' (Nobless oblige), স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান ও বীরত্ব (Chivalry), নিষ্কর জমি ভোগ করা (Fief), জমি বা অন্য কোন বিষয়ের উপস্বত্ব ভোগ করা (Benefice), বংশাভিমান ও রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা প্রভৃতি। এর মধ্যে কোন কোন লক্ষণ বৈদিক যুগ হইতে সূচিত হয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সমাজের এই অবস্থাগুলি যে বহু পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল, মহাভারতেই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। এখন বিচার্য্য এই যে, হিন্দী সাহিত্যে সামন্ত যুগের কি নিদর্শন পাই।

শ্রীযুত শুক্ল মহাশয় তাঁহার পুস্তকে ঐতিহাসিক কালানুসারে 'আদি কাল' (বীর-গাথা কাল), 'উত্তর মধ্য কাল' (রীতি কাল) এবং 'আধুনিক কাল' (গদ্য কাল)—এইভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। আর শ্রীরামকুমার বর্ম্মা 'হিন্দী সাহিত্যকা

(১) P. N. Banerjea—"Public Administration in Ancient India".

(২) সূর্য্যকান্ত শাস্ত্রী—"হিন্দী সাহিত্যকা বিবেচনাত্মক ইতিহাস"—পৃঃ ৩।

আলোচনাত্মক ইতিহাস' পুস্তকে 'চারণ কাল', 'ভক্তি কাল', 'প্রেম কাব্য', 'রাম কাব্য', 'কৃষ্ণ কাব্য' নামে হিন্দী সাহিত্যকে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এই বিভাগ গ্রহণ করা চলে না। সুতরাং আমরা সর্ব্বপ্রথমে দেখিব যে, হিন্দী সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক যুগের কি প্রতিবিম্ব পাই। হিন্দী সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক যুগের চিত্র বিশিষ্টভাবে পাওয়া যায়। বোধ হয়, ভারতীয় অন্য কোন সাহিত্যে এত সংবাদ পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যে এর অত্যন্ত অভাব। মুসলমান-তুর্কী আক্রমণের পর হইতে নানা বীরগাথা (ballad) হিন্দীতে রচিত হয়। চারণেরা রাজাদের বিজয়, শত্রু-কন্যা হরণ ইত্যাদি বর্ণনা দ্বারা গাথা রচনা করতেন। ইহার মধ্যে সাহিত্যিক পুস্তকাকারে যেগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহাকে 'রাসো' বলা হয়। শ্রীযুত শুক্ল 'বিসলদেব রাসো'কে সর্ব্বপ্রথম বীর গীতি বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন (১)। শুক্ল ইহার কাল নির্দ্ধারিত করেন ১২১২ সম্বৎ। এই সময়টি রাজপুতদের আধিপত্যের যুগ। এই পুস্তকে বিসলদেবের সহিত রাজমতীর বিবাহের ও কলহের বর্ণনা আছে। পরে উভয়ের মিলন হয়। বিসলদেব একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন—কিন্তু ইহাতে সামন্ত যুগীয় রাজারাণীর প্রেম ও বিরহের কথাই আছে। উদাহরণ স্বরূপ :—

"পরণয়া চাল্যোবীসলরায়।
চৌবস্থা সহুলিয়া বোলাই।
অতিরঙ্গ স্বামী সুঁ মিল-রাতি।
বেটী রাজা ভোজকী।"

আর একখানি পুস্তকের নাম 'খুমান রাসো'। ইহা চিতোরের রাওল খুমানের বিজয়ে লিখিত হয়। ৮১০—৯৯০ সম্বতের মধ্যে চিতোরের তিনজন খুমান রাজা হন। ইহার মধ্যে একজন খুমানের সহিত আরবদের যুদ্ধ হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। এইসব লড়াইয়ের কথা 'রাসো'তে আছে। এইবার আসে বিখ্যাত চন্দবরদাইয়ের 'পৃথ্বীরাজ রাসো'। ইহাতে দিল্লীর শেষ হিন্দু নরপতি পৃথ্বীরাজের বীরত্ব,

(১) শুক্ল—হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস পৃঃ ২৪।

প্রেম প্রভৃতির গাথা আছে। আজকালকার সমালোচকদের অভিমত যে, এই পুস্তক প্রামাণিক নয়। ইহা ইতিহাস-বিরুদ্ধ কল্পিত ঘটনা দ্বারা পরিপূর্ণ। এই পুস্তকে (রাসোতে) বর্ণিত আছে যে, পৃথ্বীরাজের সহিত সাহাবুদ্দীন ঘোরীর একটি ঘটনা দ্বারা যুদ্ধ কলহ সৃষ্টি হয়। সাহাবুদ্দীন চন্দ্ররেখা নামক একটি গক্কর কুমারীর প্রেমে আসক্ত হন। কিন্তু হুসেন নামক একজন পাঠান সর্দ্দার তাঁর প্রণয়ী ছিল। এই ব্যাপার নিয়াই উভয়ের মধ্যে কলহ হয়। এর ফলে, এই পাঠান সর্দ্দার তার প্রণয়িনীকে নিয়া দিল্লীতে পৃথ্বীরাজের শরণাগত হন। ঘোরী পৃথ্বীরাজকে ইহাদের প্রত্যর্পণ করার জন্য লিখিয়া পাঠান। পৃথ্বীরাজ ইহা রাজধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া অস্বীকার করেন। এর ফলেই ঘোরীর পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ হয় (১)।

(১) সম্রাট সাহাজানের পাঠান সেনাপতি খাঁ জাহান লোদীর আদেশানুসারে ফার্সী ভাষায় নিয়ামৎউল্লা নামক এক ব্যক্তি আফগানদের একটি ইতিহাস রচনা করেন। Dorn ইহা ইংরেজীতে "History of the Afghans" নাম দিয়া অনুবাদ করেন। ইহাতে উল্লিখিত আছে যে, ঘোরের এক রাজবংশীয় লোকের সঙ্গে তথাকার রাজার বিবাদ হয়। ইহাতে সেই লোকটির জীবন সংশয় হওয়ার তিনি দিল্লীতে পলায়ন করিয়া এক মন্দিরে তিন বৎসর লুকাইয়া ছিলেন। ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পৃথ্বীরাজের পতনের পূর্ব্বের ঘটনা। অনুমান হয়, এই ঘটনাই "রাসো"তে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আর ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, সাহাবুদ্দীনকে গক্করেরা হত্যা করিয়াছিল। এখন উভয় কাহিনী একত্রিত করিলে অনুমান হয় "রাসো" বর্ণিত এই ঘটনার ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর "Last Days of Mughal Empire" পুস্তকে বলিয়াছেন যে, কোন গক্কর সর্দ্দার তাঁকে বলিয়াছেন যে, এই ঘটনা গক্করদের দ্বারা সংঘটিত হয় নাই। ইহা কক্কররা করিয়াছিল। গক্করেরা একটি পঞ্জাবী জাতি। পেশোয়ারের যুদ্ধে অনঙ্গ পালকে মামুদ পরাজয় করিবার পর গক্করদের জোর করিয়া মুসলমান করা হয়। কিন্তু আজ তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা মামুদের সঙ্গে পারস্যদেশ থেকে ভারতে আসিয়াছিলেন। লেখক অনুমান করেন যে, গক্করদের দ্বারাই খুব সম্ভবতঃ ঘোরী নিহত হইয়াছিলেন আর নিয়ামৎ উল্লার ইতিহাস পাঠে এই প্রতীতী হয় যে, এই সময়ে হিন্দুর অস্পৃশ্যতা দোষ এত প্রবল হয় নি। আবার শেখ শাদির "বোস্তানে" বর্ণিত ঘটনা যে, সোমনাথের মন্দিরের গর্ভগৃহে তথাকার পাণ্ডারা তাঁকে এক রাত্রি রাখিয়াছিল তাহা পড়িয়া এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। এখানে ইহা উল্লিখিত হইতে পারে যে, ঘোরীরা ইরাণী বংশসম্ভূত বলিয়া দাবী করিতেন। আফগানীস্থান হইতে যাঁহারাই আসেন তাঁহারাই "পাঠান" নহেন।

ইহা ছাড়া এই রাসোতে চৌহান বংশের উৎপত্তি, পৃথ্বীরাজের জন্ম, বিষ্ণুর দশ অবতার, দিল্লীস্থিত কেল্লার কথা, বিভিন্ন রাজা ও মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ (১) পৃথ্বীরাজের বহু বিবাহ, হোরী উৎসবের বর্ণনা, দীপ মালিকোৎসবের বর্ণনা, সংযোজিতার (বাঙ্গলায় এঁকে সংযুক্তা বলা হয়) পূর্ব্ব জন্মের কথা—তাঁর পৃথ্বীরাজকে বিবাহ করিবার পণ, দিল্লী বর্ণনা, কান্যকুব্জে সংযোজিতার জন্য যুদ্ধ, সাহাবুদ্দীনকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করা এবং একবার তাঁকে বন্দী করা ; এরপর গজনীতে কবি চন্দের গমন এবং পৃথ্বীরাজের শব্দভেদী বাণ দ্বারা সুলতানকে হত্যা করার কথা, তারপর চান্দ পৃথ্বীরাজকে মারিয়া ফেলার কথা, পৃথ্বীরাজের পুত্র নারায়ণ সিংকে দিল্লীতে রাজ্যাভিষেকের পর তাহার বধ ও দিল্লীর পতন এবং আরো বহু ব্যাপার এই কবিতা পুস্তকে বর্ণিত আছে (১)।

(২)

ইহার পর আসে জয়ানকের "পৃথ্বীরাজ বিজয়।" এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি অতি খণ্ডিতভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে। লেখক একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত বলিয়া অনুমিত হয়। এই পুস্তকের প্রথম সর্গে—মহাকবি বাল্মীকি, ব্যাস ও ভাসের (২) বর্ণনা আছে।

দ্বিতীয় স্বর্গে আছে সূর্য্যমণ্ডল থেকে চৌহানদের আদি পুরুষের অবতরণ, অর্ণ রাজের মুসলমানদিগকে পরাজয়, পৃথ্বীরাজের জন্ম উৎসব, তাঁহার যৌবন, অনেক

(১) বর্ত্তমানের সমালোচকেরা বলেন এই 'রাসো' আকবরের দরবারে লিখিত হইয়াছিল ; সেই জন্যই বোধ হয় তুর্কির বদলে 'মোগল' শত্রুর কথা ভূল ক্রমে এই স্থলে উল্লিখিত হয়।

(১) শ্রীরামকুমার বর্ম্মা—"হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস" পৃঃ ৭৩-৭৬।

(২) হালে ভাসের নাটকসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিত মহলে তাঁর নাম সুপরিচিত হইয়াছে। বিদেশীয় পণ্ডিতদের মুখে একথা শুনা গিয়াছে যে ভারতবর্ষ ভাসকে কি করিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলো। এই হিন্দী পুস্তকেই দেখা যায় যে এই পুস্তক লিখিত হইবার সময়ে ভারতীয় কবিরা ভাসকে ভোলেন নি।

রাজকুমারীর তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা, পৃথ্বীরাজের বীরদের শৌর্য্য বর্ণন ; ঘোরীর দূতের আজমীরে আগমন, গুজরাটের রাজা ভীমদেব কর্ত্তৃক ঘোরীর পরাজয়, হর্ষোৎসাহ, পৃথ্বীরাজের নিজের চিত্রশালায় গমন, জয়ানকের পৃথ্বী-রাজের দরবারে আগমন এবং সরস্বতীর নিকট হইতে এই আজ্ঞা প্রাপ্তি যে সে যেন বিষ্ণুর অবতার পৃথ্বীরাজের সেবা করে (১)। এই সময়কার আর একখানি পুস্তক হইতেছে ভট্টকেদারের "জয়চন্দ্র প্রকাশ।" ইহাতে কনৌজের জয়চন্দ্রের বীরগাথা বর্ণিত আছে। কিন্তু এই পুস্তকখানি এখনও দুষ্প্রাপ্য হইয়া আছে। "রাঠৌরোঁকী খ্যাত" নামক পুস্তকে ইহার উল্লেখ আছে। এই প্রকারের আর একখানি বইয়ের নাম 'জয়ময়ঙ্ক-জসচন্দ্রিকা"। ইহার নামও ওই খ্যাত পুস্তকে উল্লিখিত আছে (২)। মধুকর নামে এক কবি এই পুস্তক লেখেন। আর একখানি বিশিষ্ট পুস্তক হইতেছে—"আলহ খণ্ড"। জনশ্রুতি বলে যে ইহা জগনিক দ্বারা (সম্বৎ ১২৬০) লিখিত একটী বীররস প্রধান গীতি-কাব্য। এর কোন হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। মহোবার চন্দেল রাজা পরমালের সহিত পৃথ্বীরাজের যুদ্ধের সময় বনাফর বংশীয় (৩) "আলহা ও উদল" নামে দুই ভাই পরমালকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই দুই ভ্রাতার বীরত্বগাথা উপরোক্ত পুস্তকে বর্ণিত আছে। সমগ্র উত্তর ভারতে আজও লোক মুখে ইহা গীত হয় কিন্তু এই জন্য ভাষাও বিকৃত হইয়া স্থানীয় ভাষার রূপ ধারণ করিয়াছে। লোকে বলে এই গাথা গীত হইবার সময় তাহা শুনিয়া শ্রোতারা এত উত্তেজিত হয় যে প্রায়ই মারামারি হইয়া যায়। লেখক একবার ভাগলপুরে এই গানের কিয়দংশ শুনিয়াছিলেন।

(১) শ্রীরামকুমার বর্ম্মা—হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস : পৃঃ ৮৫-৮৭।

(২) শ্রীরামকুমার বর্ম্মা—হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস : পৃঃ ১০১।

(৩) K. P. Jayswal-এর মতে বনাফরেরা বুন্দেলখণ্ড নিবাসী একটি পতিত জাতি, রাজপুতেরা এদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধাদি করিতে চায় না। ইনি বলেন এরা শক প্রভুত্বকালে বানসফরস নামে হুনবংশীয় বেনারসের গভর্ণরের বংশধর। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে, মহোবার পতনের পর ইহাদের কী সামাজিক অধঃপতন হইয়াছে।

দোসাদ জাতীয় একজন লোক একটা কাংস পাত্র বাজাইয়া অতি উত্তেজনা সহকারে এই রাজপুত বীরদ্বয়ের বীরত্ব কাহিনী গাহিতেছিল এবং শ্রোতারা মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতেছিল। এই গানের একটী কলি হইতেছে—

"বাতন বাতন বাত ঝাড়গৈ
হোগৈ আদমি রাঢ়।
রাঢ়কো উপর গারি চলগৈ
আগুল চলে তলোয়ার।"

আলহাখণ্ডে কনৌজ ও মহোবার শক্তির পরিচয় আছে। ইহা পুনরুক্তিদোষে পরিপূর্ণ। তত্রাচ এই পুস্তক উত্তর ভারতের সামন্ততান্ত্রিক যুগের একটী প্রকৃত নিদর্শন।

তৎপর আসে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর "হাম্বীর রাসো"। ইহাতে রনথমবরের রাজা হামীরের গৌরব গান আছে কিন্তু ইহার একটীও পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। কেবল ঐতিহাসিকেরা নির্দ্দেশ মাত্র দিয়াছেন (১)। তারপর আসে গল্লসিং ভট কর্ত্তৃক রচিত 'বিজয় পাল রাসো'। ইহার সময় ১৩৫৫ সম্বৎ। এই পুস্তকে করোলীর রাজা বিজয় পালের যুদ্ধসমূহ ওজঃপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত আছে। ডিঙ্গল (রাজস্থানী ভাষা) ভাষায় রচিত এই প্রকারের বহু বীরগাথা আছে কিন্তু তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নি। চারণদের রচনা কেবল পদ্যতেই হয় নি গদ্যতেও হইয়াছে। তাঁহারা অধিকাংশ বিষয়ই রাজা ও তাঁহাদের বংশাবলীর কথা নিয়া লিখিয়াছেন। ইহাদের বর্ণনার বিষয় হইতেছে রাজাদের যশোগান, তাঁহাদের যুদ্ধকৌশল তাঁহাদের ধর্ম্মভীরুতা ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান। নায়কের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য কবি বিপক্ষীয় লোককে (হিন্দু বা মুসলমান) হীন ও নগ্ন চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাতে কবি বেশীর ভাগই কল্পনার আশ্রয় নিয়াছেন। আবার এই সাহিত্যে বীররসের প্রাধান্য আছে। অবশ্য শৃঙ্গার রসও কখন কখন দৃষ্ট হয়। যুদ্ধের পর কবির উল্লিখিত বীর আমোদ প্রমোদ অথবা স্বয়ম্বরে বিবাহ করিয়াছেন।

(১) শ্রীরামকুমার বর্ম্মা—হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস। পৃঃ ১০৬।

তৎপরে বিরহ বর্ণনাও আছে। অদ্ভুত রস রৌদ্র বা বীভৎস রস ও যুদ্ধ বর্ণনাও পাওয়া যায়। আবার শত্রুর মৃত্যুর পর শত্রু নারীদের হৃদয়ে করুণার ধারা প্রবাহিত হইতেছে—এক কথায় হাস্য ও শান্ত রস ছাড়া প্রায় সব রসের সমাবেশ ইহাতে আছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই এই বীর গাথার রচনা ক্ষীণ হইতে থাকে। তাহার প্রধান কারণ রাজনীতিক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন। উত্তর ভারতে মুসলমান প্রভুত্ব সুদৃঢ় হয় এবং হিন্দু রাজারা দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। কাজেই তাঁহাদের গৌরব বর্ণনা করিবার সামগ্রীর অভাব হয়। চারণদের রাজসভায় সম্মান প্রাপ্তির সুযোগই আর ছিল না। কাজেই কে আর বীরগাথা লিখিবে? এই সময়ে মুসলমান সার্ব্বভৌমিকত্ব বিস্তার হয়, হিন্দু সামন্ততন্ত্র পদ্ধতি ওলট পালট হইয়া যায়। মোগল যুগের আগে পর্য্যন্ত তাহার ছায়া অবশিষ্ট ছিল বটে কিন্তু মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে একটী কেন্দ্রীভূত শাসন নীতি উত্তর ভারতে প্রবর্ত্তিত হয়; গাঙ্গেয় উপত্যকায় পুরাতন পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হয়। মোগল শাসন সামন্ততান্ত্রিক বাংলাকে বিধ্বস্ত করিয়া 'ভেতো বাঙ্গালীর' দেশে পরিণত করে। উত্তর ভারতে লোক বিষহীন সর্পে পরিণত হয়। কেবল রাজস্থানেই সামন্ততন্ত্রের শেষ ছায়া বিরাজ করে। আর তথাকার বীর যুগের শেষ দীপ নির্ব্বাণ মেবারের রাজসিংহে ও অজিত সিংহে পরিসমাপ্তি হয়। ইহা সত্য যে ভারতীয় সমাজ আজও সামন্ততান্ত্রিক যুগের ছায়াতে দণ্ডায়মান আছে কিন্তু বর্ত্তমানকালে কল-কব্জার যুগ (Industrial Age) ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাহা সমাজকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে।

আর রাজনীতি ক্ষেত্রে এই যুগ আকবরের সময়েই বিলুপ্ত হইয়াছে। বাংলায় চারণ ও ভাটদের বীরগাথাসমূহ প্রায় বিলুপ্তই হইয়াছে। পালরাজাদের গীতসমূহ আর বাংলায় গীত হয় না। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে ও উত্তর বাংলার রংপুরে তাহা কদাচিৎ শ্রুতিগোচর হয় (১)।

আর ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের বীরত্ব গাথার মধ্যে যদি কোন ঐতিহাসিক

(১) হালে রংপুর থেকে মহীপালের গীতের কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সত্য থাকে তাহাও হয়তো প্রাচীন শ্রুতি অবলম্বনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে। আর বাঁকুড়া জেলাস্থিত বন বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের সহিত "চেতোবর্দ্দার" (মেদিনীপুরের বর্ত্তমান গড়বেতা নামক স্থান) জমিদার শোভাসিংহের যুদ্ধ গাথা যাহা স্থানীয় লোকমুখে "চেতোবর্দ্দার লড়াই" বলিয়া কথিত হয় এবং নোয়াখালীর "চৌধুরীর লড়াই", ময়মনসিংহের ইশা খাঁ মসনদ আলীর বংশের লড়াইয়ের গীত প্রভৃতি, অন্নদামঙ্গলে প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব গাথা ইত্যাদি মোগল যুগেই রচিত হইয়াছিল।

এক্ষণে আমাদের অনুসন্ধানের বস্তু এই যে এইসব 'রাসো' গুলিকে আমরা কোন যুগের সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। এই বীরগাথাগুলি সামন্ততান্ত্রিক যুগীয় সমাজের চিত্র প্রদর্শন করে। ইহাতে বীরত্ব (chivalry), স্ত্রীলোকদের প্রতি সম্মান ও প্রেম প্রদর্শন (Gallantry), আর অধস্তন পুরুষের উর্দ্ধতন পুরুষের প্রতি স্বামিধর্ম্ম (Nobless Oblige) প্রদর্শন, ক্ষত্র বৃত্তির বড়াই, নিমক হালালী (Faithfulness) প্রভৃতি বিশিষ্ট ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। পৃথিবীর যে সব স্থানে সামন্ততন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই সব স্থানেই বীরগাথা সৃষ্ট হইয়াছিল। ইউরোপে সামন্ততন্ত্র যুগে স্পেন, ইতালী ও ফ্রান্স দেশে এবম্প্রকার বহু বীরগাথা প্রচলিত ছিল। ফ্রান্সের দক্ষিণের Troubadour-দের ও উত্তরের Trouveres Chansons ফরাসী সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। চারণদের মধ্যে Roland-এর গাথাসমূহ আজও বিখ্যাত হইয়া আছে। সামন্ততান্ত্রিক যুগের রাজনীতিক আদর্শ তিনি এক কথায় পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—"It is the duty of the liegeman to fight for his liegelord (ভূস্বামীর হইয়া যুদ্ধ করাই প্রজার ধর্ম্ম)।" ইউরোপের Feudal যুগের আদর্শ যাকে এক কথায় Nobless Oblige-বলা হয় তাহা এই পংক্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। আর ভারতে, মহাভারত তৎপরে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় আর শেষে হলদীঘাটের রণক্ষেত্রে যথায় "ঝালা স্বামিধর্ম্ম ভোলে না"—আর বাঙ্গলার শ্রীহট্টে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সেনাপতি রাধার রণক্ষেত্রে প্রভুর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া "যথা কৃষ্ণ তথা রাধা" বলিয়া অশ্বসনে নদীতে আত্মবিসর্জ্জনের ব্যাপারসমূহ দ্বারা হিন্দু

জাতির চরিত্রে Nobless Oblige-এর ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। হিন্দী ভাষার এই সব রাসোতে আমরা সামন্ততন্ত্র-যুগীয় পরিচয় পাই। অবশ্য হিন্দু জাতির বর্ণভেদ অনুযায়ী একটী শ্রেণীর মধ্যে এই লক্ষণটি বিকশিত হয়। আলহাখণ্ডে এই নিম্নলিখিত বচনে তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়ঃ—

"বারহ বরিসলৈ কুকর জিয়েঁ, ঔ তেরহলৈ জিয়েঁ সিয়ার।
বরিশ আঠারহ ছত্রী জিয়েঁ, আগে জীবনকে ধিক্কার।"

ইহাতে কেবল ছত্রী যুবকেরই কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এতদ্দ্বারাই রাজপুতদের পতন হয়। যদি কেহ বলেন যে, এবম্প্রকারে প্রাচীনকালে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই লড়াই করিত তাহার উত্তর এই যে, তাহা সত্য নহে (১)। কৌটিল্য ও মনুতে ইহার কোন পোষকতা পাওয়া যায় না। ইহা ব্রাহ্মণ্যবাদের কল্পনা মাত্র। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় অর্থে কতিপয় কুল বা Clan ছিল মাত্র (২)। Keith এবং Macdonnell একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে সর্ব্বশ্রেণীর লোকই সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইত (৩)। অন্যপক্ষে ইউরোপে Knight-রা বিশিষ্ট পদ পাইয়া একটী শ্রেণীভুক্ত হইত বটে কিন্তু পুরোহিত ছাড়া সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরাই সৈন্য হইত। হয়তো রাজপুতদের যুগে যুদ্ধবৃত্তি একটী বিশিষ্ট জাতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল বলিয়া এবং এই জাতির লোকেরা শাসকরূপে বিবর্ত্তিত হওয়ায় সেই সব বংশের গুণকীর্ত্তনের জন্য এত বীরগাথা সৃষ্ট হইয়াছে। আর বাঙ্গলায় কোন বিশিষ্ট যোদ্ধৃশ্রেণী উদ্ভূত হয় নি এবং রাজা ও জমিদার বংশগুলিও সামান্য দিনের জন্য স্থায়ী হইত। হয়তো এই জন্যই বীরগাথা সাহিত্যে বিশেষভাবে বিকশিত হয়নি যদিচ ভাট বলিয়া একটী জাতি বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে ইহাদের কর্ম্ম ছিল

(১) Zimmer—"Alt indisches Leben" দ্রষ্টব্য।

(২) Fick—"Social Organisation of North-eastern India in the time of Buddha,"

(৩) Vedic Index দ্রষ্টব্য।

ধনী বংশের গুণকীর্ত্তন করা এবং তাহাদের কুলজি গ্রন্থ রচনা করা। বাঙ্গলায় যে সব জাতীয় লোকেরা সৈনিকের কর্ম্ম করিত তাহারা আজ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রকোপে অস্পৃশ্য ও হেয়। বাঙ্গলা কবিতায় ইঁহাদের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে ঃ—

"নয় কাহন বাগ্‌দী উঠে যুদ্ধে তাঁরা যম।
সাত কাহন হাড়ি পাইক, বার কাহন ডোম।" (১)

অথচ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ধর্ম্মমঙ্গলে এবম্প্রকারের ডোম জাতির এক বীরের মুখ দিয়াই শৌর্য্যের কথা বাহির করা হইয়াছে—

"শাকার স্থবর্ণ ছড়া বাপের ও ঢাল খাড়া
দিয়ে সমাচার বোলো।"
রণে অকাতর হয়ে শক্রশির সংহারিয়ে
সম্মুখ সমরে শাকা মলো।"

আবার জনশ্রুতি এই শ্লোকের প্রতিপোষকরূপে বলে—

"আগু ডোম বাগ ডোম ঘোড়া ডোম সাজে।
ঢাল গাগর মৃগল বাজে" ...ইত্যাদি।

যাহা হউক হিন্দী সাহিত্যে বীর গাথাগুলি জগতের সামন্ততান্ত্রিক বীরত্বসূচক সাহিত্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর স্থান অধিকার করে। ব্লোঁলার পাশেই চাঁন্দ বরদাইয়ের স্থান। আবার উভয়ের স্বামিভক্তির নিদর্শন প্রায় এক প্রকারেরই। Roland-র প্রভু Normandy-র Duke এবং England-এর রাজা Richard the Lion-hearted যখন Crusade যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন পথিমধ্যে Austria-র Duke তাঁহাকে কয়েদ করিয়া অজ্ঞাত স্থানে রাখেন। ব্লোঁলা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া গানের দ্বারা অবশেষে তাঁহাকে ভিয়েনার জেলে আবিষ্কার করেন এবং তাঁর মুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়া সফলকাম হন। আর রাসোতে বর্ণিত আছে যে, চাঁন্দ যখন শুনিলেন যে, পৃথ্বিরাজকে ঘোরী আফগানিস্থানে নিয়া গিয়া কষ্ট দিতেছেন তখন তিনি তথায় গিয়া সমস্ত

(১) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—"কবিকঙ্কণ চণ্ডী" ২য় ভাগ, পৃঃ ৯৭২ দ্রষ্টব্য।

কষ্টের অবসানের উপায় নির্দ্ধারণ করেন। অবশ্য এই ঘটনাও ঐতিহাসিক ঘটনা নহে। (১)

হিন্দী সাহিত্যের এই বীর গাথাগুলিকে আমরা প্রগতিশীল বলিতে পারি না। ইহাতে কেবল কতকগুলি রাজবংশের বীরত্ব, বৈর (blood feud) এবং বন্ধুত্ব (blood bond) প্রভৃতির নিদর্শন প্রদর্শন করে। জনসাধারণ ও গণসমূহের কোন সংবাদই ইহাতে পাওয়া যায় না। সমগ্র সমাজ কি ভাবে অবস্থিত, তাহারও কোন সংবাদ ইহাতে নাই। এই বীর গাথাগুলিতে পৃথ্বিরাজ ও জয়চন্দ্রের ঐশ্বর্য্য ও বীরত্বের কথাই আছে, কিন্তু ইহাদের পরাজয়ের পর মুসলমানেরা যে হিন্দু জাতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল এবং ভারতের ইতিহাস চিরকালের জন্য পরিবর্ত্তিত হয় ও সমাজের তজ্জন্য কি অবস্থা হয় এইসব বিষয়ের কোন সংবাদ তাহাতে পাই না। ইহার পরিবর্ত্তে আমরা চাঁন্দে পাই পৃথ্বিরাজের ও শাহাবুদ্দীনের বৈরতার শেষ অঙ্কের চিত্র—

"সাত বাঁশ চব্বিশ গজ
উঙ্গলি অষ্ট প্রমাণ,
ইত্তেপর সুলতান হ্যায়
চুকো মাৎ চৌহান!"

অর্থাৎ শব্দভেদী বাণ দ্বারা পৃথ্বিরাজ শাহাবুদ্দীনকে মারিয়া নিজের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন।

এইজন্যই এই মধ্যযুগের সাহিত্যকে আমরা সামন্ততন্ত্র যুগের সাহিত্য বলিয়া গণ্য করিতে বাধ্য। ইহাতে প্রগতির কোন নিদর্শন পাই না অর্থাৎ ভারতীয় সমাজকে উন্নতির অবস্থায় নিয়া যাইবার সঙ্কেত ইহাতে নাই। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর, বাঙ্গলার পালদের, মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রকূটদের এবং পশ্চিম ভারতের গুর্জ্জর-

(১) আবুল ফজল এবং অন্যান্যেরা ঘোরীর মৃত্যু সম্বন্ধে হিন্দুদের সংবাদেরই পোষকতা করেন—K. K. Basu—"The Tarik-i-Mubarakshahi" ইংরেজী অনুবাদ, পৃঃ ১৩ ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

প্রতিহারদের পারস্পরিক যুদ্ধের ফলে উত্তর ভারতে একটী সাম্রাজ্য বা এক রাষ্ট্র গঠিত হওয়া অসম্ভব হইয়াছিল।

তৎপর আসে রাজপুতদের উত্থানের যুগ। তাহাদের কুলসমূহ চিরকালই খেয়ো-খেয়ি করিয়া মরিযাছে। এখনও হিন্দীতে বলা হয় "বার রাজপুতের তের হাঁড়ি।" আর এইসব বীরগাথা হইল তাহাদের পারস্পরিক খেয়ো-খেয়ির বড়াই, ইহাতে সমগ্র দেশের সংবাদ বা মঙ্গলজনক কোন নির্দ্দেশ নাই। একদল লোক আছেন, যাঁহারা বলেন রাজপুতেরা বিদেশাগত। কিন্তু লেখক মনে করেন তাহা ঠিক নয়। অবশ্য প্রমাণিত হইয়াছে যে,শক-হুন প্রভৃতি জাতিরা হিন্দু হইয়াছিল এবং হুন ও রাজপুতদের সঙ্গে বিবাহ চলিত। কিন্তু একথা ঠিক নহে যে, বিদেশাগত লোকেরাই এই সামন্ততান্ত্রিক মনোবৃত্তি ভারতে আনয়ন করিয়াছিল। বরং বলা যাইতে পারে যে ইহাদের কুলধর্ম্ম ও তৎ-প্রসূত বৈরতা প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক যুগের ও মহাভারতোক্ত সামাজিক অবস্থার চিত্রই প্রতিবিম্বিত করে। ইহা ঠিক কথা যে, এ বিষয়ে ভারতের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল ; ভারত পুনরায় কৌমগত যুগের (Tribal Age) মনোবৃত্তিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। এ স্থলে তাহার নির্দ্দেশ করিবার অবসর নাই। সরোকিনের বিভাগ অনুযায়ী ইহাকে Ideational যুগের সাহিত্য বলা যাইতে পারে। আমরা ইহাকে সামন্ততান্ত্রিক যুগীয় প্রগতি-বিহীন সাহিত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিব।

হিন্দী সাহিত্যিকেরা চারণ কালের পর "ফুটকল" বা বিবিধি সাহিত্যের যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভারতে এক নূতন পরিস্থিতি সংঘটিত হয়। ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মের প্রেরণা আসে। নানা প্রকারের ধর্ম্ম সংস্কারক উত্থিত হইয়া যোগধর্ম্ম তৎপরে ভক্তিধর্ম্মের প্রচার করেন। এই সময় হইতে নব-বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদয় হইতে আরম্ভ হয়। তদ্দ্বারা কেহ বা নিরাকারবাদ, কেহ রাম বা কৃষ্ণের উপাসনা প্রচার করেন। এই প্রেমধর্ম্মে জাতিবাদের বিপক্ষতা, অহিংসাবাদ, হিন্দু ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা, ব্রাহ্মণ্য পুরোহিতবাদের বিপক্ষতা, হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী স্থাপন প্রভৃতি মত প্রচার হইতে থাকে।

এইসব প্রচেষ্টা দ্বারা হিন্দু সমাজে এক নূতন জাগরণ সমুপস্থিত হয়। এই প্রকারের প্রচেষ্টার ফলে ভারতের সর্ব্বভাষার একটী বিশাল ভক্তি সাহিত্যের উদয় হয়। হিন্দী সাহিত্যিকেরা বলেন, মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠার ফলে হিন্দুর পৌরুষত্বের অন্তর্ধ্যানের পর হতাশ জাতির পক্ষে ভগবত শক্তি ও তাহার ধ্যান ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না। এইজন্য কবি ভক্তিতত্ত্ব দিয়া এক নূতন রাস্তা সৃষ্টি করেন। পরে এই ভক্তিতত্ত্ব এত বাড়িয়া উঠে যে, উদার মুসলমানেরাও ইহাতে আকৃষ্ট হন। (১) ইহার পরিণতি এই যে হিন্দু অস্ত্রের পরিবর্ত্তে জপমালার আশ্রয় লয়, আর নিজের লৌকিক জীবনে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা খুঁজিতে থাকে এবং নিজের সংসারিক কষ্ট থেকে মুক্তি পাইবার জন্যে ঈশ্বরের শরণ লয়, এবং নিজের শক্তির অভাবে দুষ্টের দমনের জন্য ঐশ্বরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়। এই প্রকারে বীররস শান্ত এবং শৃঙ্গার রসে পরিণত হয়। (২)

এই নূতন পরিস্থিতির কোন ঐতিহাসিক অর্থনীতিক ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া এই স্থানে ইহা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট যে ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে যখন কোন জাতি পরাজিত হইয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় তখন তাহারা ধর্ম্মের নাম করিয়া নিজেদের বাঁচাইবার চেষ্টা করে। কি রাজনীতিক ও অর্থনীতিক কারণে সে জাতির পতন হইল তাহার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া ধর্ম্মের অভাবেই পতন হইয়াছে—এই বলিয়া ধর্ম্মের ধূয়া তুলিয়া বনিয়াদী স্বার্থের লোকেরা আসল ব্যাপারকে ঢাকিবার চেষ্টা করে। অনেক সরল লোকেরা ইহা বিশ্বাসও করেন। আবার অনেকে সংস্কাররূপে পুরাতন সমাজকে নূতন অবস্থার সহিত মিলাইবার চেষ্টা করেন। অধ্যাপক মাহাফি বলেন গ্রীস যখন ম্যাসিডোনিয়ানদের দ্বারা বিজিত হয় এবং পরে পুনরায় রোমের অধীনে আসে, তখন তাহাদের নিজের একটী বিশিষ্ট ধর্ম্মমত না থাকাতে

(১) শুক্ল—হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস, পৃঃ ৬৩—৬৪ দ্রষ্টব্য ;
বর্ম্মা—হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস, পৃঃ ১৫—১৬ দ্রষ্টব্য।

(২) বর্ম্মা ঐ—পৃঃ ১২৬

শিক্ষিতেরা নাস্তিক হয় এবং পরে ক্রীশ্চান হইয়া যায়। অন্য পক্ষে, হিন্দুরা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া নিজেদের আত্মরক্ষা করে। (১) পারস্য দেশেও তদ্রূপ। পারসীকেরা আরবদের দ্বারা বিজিত হইবার পর বাধ্য হইয়া আরবদের ধর্ম্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ইসলামের নানা প্রকারের নূতন ব্যাখ্যা দিয়া নিজেদের মধ্য থেকে আরব প্রাধান্য দূরীভূত করিবার চেষ্টা করে। তাহারা, সূফীমতবাদ, 'জিন্দিকি' ধর্ম্ম, সিয়া মত এবং বর্ত্তমান কালের 'বাবি' মতবাদ, 'বাহাই' মতবাদ বিবর্ত্তিত করিয়াছে এবং এবম্প্রকারের প্রচেষ্টা আজও চলিতেছে। এই জন্যেই অধ্যাপক পার্সিব্রাউন পারস্যকে The Land of Heresy (প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধভাবপূর্ণ দেশ) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। অতএব ভারতীয় সমাজে এই প্রকারের পরিস্থিতি আশ্চর্য্যজনক নয়। (২)

বর্ম্মামহোদয় এই বিবিধ সাহিত্যের যুগে গোরক্ষনাথ প্রভৃতির হঠযোগ সম্বন্ধীয় সাহিত্যকে গণনা করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গলার ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, গোরক্ষনাথ অ-বাঙ্গালী হইলেও "নাথ-পন্থা" বাংলাতেই উদ্ভূত হয়। মৎসেন্দ্র-নাথ বাঙ্গলার বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন। আর গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ বাঙ্গলার লোক ছিলেন। (৩) তিব্বতের লামা তারানাথ প্রভৃতির পুস্তকে মীননাথকে কামরূপের ধীবর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং মৎসেন্দ্রনাথকে তাঁহার পুত্র বলা হইয়াছে। (৪) তারানাথ বলিয়াছেন গোরক্ষনাথের গুরু ছিলেন মৎসেন্দ্রনাথ। এই ধর্ম্মের এক গুরু হাড়ীপা পূর্ব্ববঙ্গের চন্দ্র বংশীয় রাজা গোপীচন্দ্রের মাতার গুরু ছিলেন, যথা: বিধবা রাণী পুত্রকে বলিতেছেন—

"হাড়ী নয় হাড়ী নয়, জাতি মহোত্তর।
যার বাড়ির দুয়ারে খাটে ষোলশত নফর॥"

(১) "Mahaffy: 'Greek Thought and Culture."
(২) Percy Browne: "Literary History of Persia" দ্রষ্টব্য।
(৩) শ্রীনলিনী ভট্টশালীর দ্বারা আবিষ্কৃত "মীন-চেতন" দ্রষ্টব্য।
(৪) B. N. Datta: "Mystic Tales of Lama Taranatha" পৃঃ ৫৬।

লামা তারানাথের মতে সিদ্ধ জলন্ধরী হাড়ীর বেশে চাটিগ্রাম (চট্টগ্রাম) আসিয়াছিলেন। রাজা গোপীচন্দ্রের মাতা পুত্রকে তাঁহার কাছ হইতে সিদ্ধিলাভ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। (১) বাঙ্গলা ভাষায় "গোরক্ষ বিজয়" নামক এক পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে। (২) বাঙ্গলার ঐতিহাসিকেরা মীননাথ প্রভৃতির কাল অন্ততঃ খৃঃ দশম শতাব্দী বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। গোরক্ষ নাথের কাল একাদশ শতাব্দী। গোরক্ষনাথ ও তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা যে সব ধর্ম্মাত্মক পুস্তক হিন্দীতে লেখা আছে সেগুলিও Ideational বিভাগের অন্তর্গত। ইহাকে আমরা প্রাচীন অতীন্দ্রিয়বাদের সাহিত্যের মধ্যে গণ্য করিব। ভারতে অতি প্রচীনকাল হইতে যোগশাস্ত্র ও তদনুযায়ী শিক্ষা চলিয়া আসিয়াছে। নবাবিষ্কৃত তথাকথিত প্রাক্-বৈদিক যুগের মহেন-জো-দাড়োর ধ্বংশাবশেষ মধ্যে যোগাসনে আসীন ও যোগনেত্র যুক্ত মূর্ত্তিসমূহ পাওয়া গিয়াছে। এই জন্যে অনেকে অনুমান করেন যে, যোগচর্চ্চা এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিতেছে। ফলতঃ এই সাহিত্যকে আমরা প্রগতিশীল বলিতে পারি না। ইহা প্রাচীন যুগের ধারা মধ্যযুগে পুনঃ প্রচলিত করিয়াছে।
তৎপরে আসেন "আমীরখস্রৌ"। ইনি ফার্সীতে অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন এবং "খড়িবোলী" হিন্দীতেও পদ্য লিখিয়াছেন। আবার, আরবী, ফার্সী ও খড়িবোলী (দিল্লীর আশপাসের হিন্দী উপভাষা) মিশ্রিত ভাষায়ও পদ্য লিখিয়াছেন। এই জন্য ইহাকে উর্দু সাহিত্যের জন্মদাতাও বলা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি হিন্দীতে কী লিখিয়াছেন তাহাই আমাদের অনুসন্ধানের বস্তু। বর্ম্মাজী বলেন (৩) খস্রৌ জনসাধারণের খড়িবোলী ভাষাকে রূপ দিয়াছেন এবং এই ভাষাকেই প্রথমে কবিতায় স্থান দিয়াছেন। এই জন্য ইহাকে বর্ত্তমানের খড়িবোলীমূলক হিন্দী ভাষার আদি কবি বলা যাইতে পারে। ইনি হিন্দী সাহিত্যের বড় উপকার করিয়াছেন। খস্রৌর সাহিত্য মনোরঞ্জক ও

(১) B. N. Datta : "Mystic Tales of Lama Taranatha" পৃঃ ২৬।

(২) দীনেশচন্দ্র সেন : "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"।

(৩) বর্ম্মা—ঐ পৃঃ ২৪২।

চিত্তবিনোদনোদ্দেশে লিখিত হইয়াছে। মিশ্রিত ভাষায় লিখিত ইহার পদ্যের একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

"জ হাল মিশ্‌কীন মকুন ত গাফ্‌ল দুয়ারে নৈনা বনায়ে বাতিয়াঁ,

* * * *

সখি, পিয়া কোজো ন দেখুঁ তো কৈসে কাটুঁ অধেঁরে রাতিয়াঁ।"

ইহার হেয়ালীর একটী ছড়া :—

"শ্যামবরণ কীহৈ একনারী, মাথে উপর লাগে পেয়ারী

যে মানুষ ইস্‌ অরথ কী খোলে, কুত্তাকিও বোলী বোলে।"

ইহার অর্থ ভোঁ—(বাঙ্গলায় ভ্রূ)

খোস্‌রৌর হিন্দী রচনা মধ্যযুগে লিখিত হইলেও এ অতীন্দ্রিয় ব্যাপার কিম্বা রাজারাজড়ার যুদ্ধে পর্য্যবসিত হয় নি। হিন্দীতে তাঁহার যে রচনা পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে গভীর তত্ত্ব নিরূপণ নাই বা জীবনের উদ্দেশ্য নিয়াও কোন লেখা হয় নি। ইনি কেবল লোকের চিত্ত বিনোদনের জন্যই লিখিয়াছেন এবং হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য ইহার লেখার মধ্যে বস্তুতান্ত্রিকতার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। এই কারণে তাঁহার রচনাকে সোরোকিনের sensate স্তরে গণ্য করা যাইতে পারে। আর ইনি জনসাধারণের ব্যাপার নিয়া লিখিয়াছেন। এঁর হিন্দী পদ্য পূর্ব্বের সাহিত্যের চেয়ে কিঞ্চিৎ প্রগতিশীল বলিতে পারি। ইহার পর শুক্ল বিদ্যাপতিকে উল্লেখ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির বিষয়ে কিছু বলা বাংলায় নিষ্প্রয়োজন। বিদ্যাপতিকে হিন্দী সাহিত্যিকেরা তাঁহাদের মধ্যে গণ্য করেন। তাঁহাকে Idealistic স্তরে গণ্য করা যাইতে পারে। আমরা বিদ্যাপতিকে প্রগতিশীল সাহিত্য মধ্যে গণ্য করিতে পারি না। ইহা সামন্ততন্ত্র-যুগীয় সাহিত্যের অন্তর্গত। বর্ম্মা, খস্‌রৌর পর মুল্লা দাউদের নাম হিন্দী সাহিত্যে আসিতে পারে বলেন।

ইনি "নূরক ঔর চান্দা কি প্রেম কথা" নামক এক পুস্তক লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা আর পাওয়া যায় না। মুল্লা দাউদ আলাউদ্দিন খিলজির সমকালীন ছিলেন। এই প্রেম সাহিত্যে পরম্পরায় কুতুবন, মন্‌ঝন, মুহম্মদ জায়সী

প্রভৃতি কবি প্রেম কথা লেখেন। এখন বোঝা যায় না ইহাঁদের লেখাতে আধ্যাত্মিক ও সুফি মতের প্রতিপাদ্য বস্তু ছিল কিনা। যাহা হউক, এইসব রচনা প্রগতিশীল নহে।

এর পর শুক্ল সাহিত্যে ভক্তিকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই ভক্তিকালের মধ্যে আবার জ্ঞানাশ্রয়ী শাখার মধ্যে তিনি কবীর, ধর্ম্মদাস, দাদুদয়াল, সুন্দরদাস, মুলুকদাসকে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন রসের ভক্তিস্রোত দক্ষিণাপথ হইতে রামানন্দ উত্তরে লইয়া আসেন। এই ভক্তিস্রোত দ্বারা সগুণ ঈশ্বরবাদ প্রচলিত হয়। এই স্রোতের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের মিলন হয়। ইঁহাদের একটী উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সমাজকে সংস্কার করিয়া উদার করা ও মুসলমানের সঙ্গে মিলন ঘটানো। এই সময় "রাম রহিম না জুদা করো ভাই" ভাব প্রচলিত হয়। এইজন্যই নামদেব বলিয়াছিলেন,—

"হিন্দু অন্ধা তুর্কৌ কানা
দুহোঁ তে জ্ঞানী সয়ানা॥
হিন্দু পূজৈ দেহরা,
মুসলমান মসিদ
নামা সোই সেবিয়া জহ দেহরা ন মসিদ॥"

এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, এইসব নূতন ধর্ম্ম প্রচারকদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান বা নীচ হিন্দু বংশীয় ছিলেন। বাংলার ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় কবীরের জাতি নিয়া বিবাদ আছে। বর্ম্মা বলেন, এ বিষয়ে যে-সব প্রমাণ আছে, তাহাতে তিনি মুসলমান ছিলেন বলিয়াই প্রমাণিত হয়। আর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হইতেছে গুরু নানকের "গুরু গ্রন্থ সাহেব" নামক ধর্ম্ম পুস্তক যাহাতে রবিদাসের একটী পদ উদ্ধৃত আছে। এই পদে তিনি নামদেব, কবীর ও নিজের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে নামদেবকে "ছিপা" বা দর্জ্জি জাতীয় বলা হইয়াছে; কবীরকে মুসলমান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে যাহার বংশে ঈদ বখরীদের দিনে গরু বধ করা হইত। আর রবিদাস চামার জাতীয় ছিলেন। (১)

(১) বর্ম্মা—পৃঃ ২২৭

কবীরের জাতি সম্বন্ধে আর একটী প্রমাণ হইতেছে তাঁহার শব নিয়া রেওয়াঁর রাজা বীরসিংহ দেব এবং বিজলী খাঁ এই উভয় শিষ্যের মধ্যে কলহ। চৈতন্য-চরিতামৃতে এক বিজলী খাঁর উল্লেখ আছে। ইনি নাকি চৈতন্যের শিষ্য হইয়াছিলেন। উভয় বিজলী খাঁই ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হয়। এই বিষয়ে ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধান প্রয়োজন।

কবীর কতকগুলি শ্লোকে নিজের পরিচয় দিতেছেন ঃ যথা—

"জাতি জুলাহা নাম কবীরা
বনি বনি ফিরোঁ উদাসী।" (১)

কবীরের নির্গুণ বা নিরাকারবাদ পোষক রচনাবলী হিন্দু সাহিত্যের একটী বিশেষ অঙ্গ। কবীরের পরে আসেন ধরমদাস, শ্রীগুরু নানক, শেখ ফরিদ, রজ্জব, মুলুকদাস, দাদুদয়াল, সুন্দরদাস, রামচরণ, বীরভান, ইয়ারী সাহব, দরিয়া সাহব, বুল্লা সাহব, দুলাল সাহব, গরীব দাস, তুলসী সাহব প্রভৃতি অনেক সাধু এই মধ্য যুগে উদয় হন। এর মধ্যে কবীর যেমন মুসলমান ছিলেন, শিষ্য পরম্পরায় দাদুকেও কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ বা ধুনিয়া জাতিগত বলেন (২)। দাদুর সহিত আকবরের ধর্ম্মালোচনা হইত (৩)। বীরভান দাদুর সমকালীন ছিলেন। ইনি ১৬০০ সম্বতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রবিদাসের শিষ্য ছিলেন ও "সৎনামী" সম্প্রদায় স্থাপন করেন। এই সম্প্রদায়ে জাতির বন্ধন ছিল না। সকলেই সমানরূপে খাইতেন, মূর্ত্তিপূজা করিতেন না ও পরস্পর বিবাহ করিতেন। ইহারা ঈশ্বর অপেক্ষা গুরুর মত বড় মনে করিতেন। এই সম্প্রদায়ের লোক বেশীর ভাগই কৃষক এবং অতি গরীব শ্রেণীর। এই সম্প্রদায় আওরঙ্গজেবের সময়ে ১৬৭২ খৃঃ তাঁহার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক কাফি খাঁ বলেন যে, ইহারা ভক্তের বেশভূষা পরিত

(১) কবীর গ্রন্থাবলী—নাগরী প্রচারিণী সভা—পৃঃ ১৮১

(২) "শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, 'কতকগুলি প্রবল প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, দাদু ছিলেন মুসলমান ; আর তাঁর পূর্ব্ব নাম ছিল 'দাউদা'," পৃঃ ১৮—

(৩) ক্ষিতিমোহন সেন—"দাদু"—উপক্রমণিকা পৃঃ ১৩।

আর কৃষি এবং ব্যবসায় করিত। সাত্বিকভাবে ধন প্রাপ্তির লক্ষ্য ছিল ইহাদের। যদি কেহ অন্যায় বা অত্যাচার করিত, ইহারা তাহা সহ্য করিত না। অনেকেই অস্ত্রধারণ করিত। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদ করিত না (১) এই সম্প্রদায়ের বিবরণ পড়িয়া মনে হয় যে, ইহারা গণশ্রেণীর (masses) লোক ছিলেন এবং ইহাদের বিদ্রোহকে কৃষকের বা গণের বিদ্রোহ বলা যাইতে পারে (২)। রজ্জবজী (১৭২০ সম্বৎ) দাদু পন্থী এবং ইনি মুসলমান ছিলেন। ইনি নিজের পরিচয়ে বলিয়াছেন,—

"জো ধুনিয়াঁ তো ভী মৈঁ রাম তোমহারা।

* * *

অধম কমীন জাতি মতিহীনা..." (৩)

দুল্লা সাহেব (১৭৫০ সম্বৎ) যাঁর আসল নাম "বুলাকি রাম", জাতিতে কুনবী ছিলেন। গরীবদাস (সম্বৎ ১৭৭৪) জাতিতে জাঠ ছিলেন। রামচরণ (১৭৭৫ সম্বৎ) "রামসনেহী" মত স্থাপন করেন। এই মতের সঙ্গে মুসলমান মতের অনেক ঐক্য আছে। এই মতে জাতিভেদ নাই। ইহারা মূর্তিপূজার বিরোধী এবং নেমাজের মত দিনে পাঁচবার নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনা করার ব্যবস্থা আছে এই ধর্মে। এইসব ভক্তিকালের "সন্ত" মতগুলির সাহিত্য পাঠে দেখা যায় যে এইগুলি নির্গুণ বা নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রচার করিয়াছে; ইহারা মূর্তি-পূজার বিরোধী ছিল ও জাতিভেদ অস্বীকার করিত; ভক্তির দ্বারা ঈশ্বর উপাসনা করিত আর বলিত ভগবদ্ভক্তির মধ্যে সব সমান। এই সাহিত্য পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে, ইহার মধ্যে ইসলামের প্রভাবও বিস্তার হইয়াছে, (৪) সন্ত মতকে

(১) Quoted in "History of Moslem Rule" by Dr. Iswari Prasad: pp. 625—627.

(২) J. Nehru—"Glimpses of World History." pp. 500 দ্রষ্টব্য।

(৩) "দরিয়া সাহেব কী" বাণী—পৃঃ ৫৭ দ্রষ্টব্য।

(৪) হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী শাস্ত্রাচার্য—ইনি বলেন যে, সন্ত মত প্রাচীন যোগী মতেরই বংশোদ্ভব। ইসলাম প্রভাব প্রসূত নহে। —"হিন্দী সাহিত্যকী ভূমিকা" পৃঃ ৩০ দ্রষ্টব্য।

মুসলমান সংস্কৃতি প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এই ভক্তিমতে স্থফী ধর্ম্মের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাংলায় নব বৈষ্ণব ধর্ম্মে অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে স্থফী মতের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু তাহার পরিমাণ কত তা এখনও অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া আছে। কোন কোন লেখক বলেন, স্থফী মতই ভারতীয়দের ইসলাম গ্রহণের পথ সুগম করিয়া দেয়। আবার স্থফী মতের দ্বারাই হিন্দুমুসলমান ধর্ম্ম সাধকেরা আজ পর্য্যন্ত একীভূত হয়। লেখক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, অনেক ফকীর সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা আল্লা অপেক্ষা গুরুকে অধিক মানেন। এই বিষয়ে এই গুরুমতবাদীদের সহিত পুরাতন বৌদ্ধ সহজযানীদের মতের ঐক্য আছে। বর্ত্তমান কালের বাঙ্গলার বৈষ্ণব ও কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় ভগবানের অপেক্ষা কর্ত্তা বা গুরুকে বেশী সম্মান দেয়। এক দল ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী বলেন যে হিন্দু বৈদান্তিক মতের সহিত ইসলামের সংস্পর্শ অতি প্রাচীনকালেই হইয়াছিল। তাহার ফলে স্থফী ধর্ম্মের উদ্ভব হয়। জেলালুদ্দীন রুমী তার একটা নজীর। জার্ম্মাণ প্রাচ্যভাষা বিশারদ ফন ক্রেমার তাঁহার এক পুস্তকে (১) বলিয়াছেন যে, স্তাম্বুলের একটী দরবেশ সম্প্রদায়গত ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশের এক গুপ্ত পুস্তক তাঁহার হস্তগত হয়। তাহা অনুবাদ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, ইহা সংস্কৃত বেদান্তসারের সহিত মেলে। লেখক স্তাম্বুলে Dancing Dervish-দের নৃত্য দেখিয়াছেন। তিনি দেখেন যে, একজন দরবেশ নাক দিয়া বাঁশী বাজাইতে থাকে, আর অন্য দরবেশরা, যাঁহারা ভূমিতে উপবিষ্ট ছিলেন, বাঁশীর শব্দ শুনিয়া উঠিয়া দুই বাহু তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং ঢিপ ঢিপ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া "দশা প্রাপ্ত" হইতে লাগিলেন। এই রীতির সহিত এবম্প্রকারের গৌড়ীয় বৈষ্ণব রীতির মিল আছে। কোথা হইতে এই সাদৃশ্য আসে তাহা অনুসন্ধানের বস্তু। চৈতন্য চরিতামৃতে অদ্বৈত গোস্বামী নিজেকে "আউল" বলিয়াছেন। আবার 'আউলিয়া' উপাধিধারী একজন

(১) Von Kraemer—"Islamische streifzuege."

বড় বৈষ্ণব সাধকের নামে বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের নামের তালিকায় পাওয়া যায় (১)।

বাঙ্গলার বৈষ্ণবদের মধ্যে আউলিয়া, সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায়ও আছে। আবার ৭০ জনের উপর মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদাবলীসমূহের পাণ্ডুলিপিও আবিষ্কৃত হইয়াছে (২)। এতদ্ব্যতীত মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন (৩) মহাশয় লেখককে বলিয়াছিলেন যে, সুফীদের যোগের আসনের সহিত হিন্দুদের যোগাসনের মিল আছে। এই জন্য উভয় মতের ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘাতের বিষয় বিশেষভাবে অনুসন্ধানের বস্তু।

এই সন্ত সাহিত্যে আমরা দেখি যে, একদল সাধু, যাহাদের মধ্যে অনেকেই নীচ হিন্দু জাতীয় এবং মুসলমানবংশীয়—যাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কঠোরতা এবং ইসলামের অনুদারতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং বিবদমান হিন্দুমুসলমানকে এক করিবার যত্ন করিয়াছেন এবং উদার মুসলমান সাধকেরাও সুফী মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ভ্রাতৃভাবে হিন্দুর হস্ত ধারণ করিয়াছেন। যদিও তৎকালীন রাজনীতিক্ষেত্রে উভয় জাতির লোকের বিবাদ ছিল, তত্রাচ সেই গণ্ডী ভেদ করিয়া হিন্দুমুসলমানকে সম্মিলিত করিয়া এক অখণ্ড ভারতীয় জাতিসংগঠনের প্রয়াস ইঁহারা করিয়াছিলেন। আকবর রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার "দীন ইলাহি" ধর্ম্ম দ্বারা সজ্ঞানে এই প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন (৪)। তিনি তাঁহার বংশকে "National Monarch"-রূপে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই যুগের বহু পরেও এই সন্তদের ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়া গুরুগোবিন্দ সিং বলিয়াছিলেন—

(১) জগবন্ধু ভদ্র—"গৌরভক্তি তরঙ্গিণী" দ্রষ্টব্য।

(২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রিপোর্ট। সতীশ রায় "শ্রীপদকল্পতরু" ৫ম খণ্ডে কতকগুলি এই প্রকারের কবির পদাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৩) এই বিষয়ে Wahed Hussain's University Extension Lectures on Sufism" P. 27 দ্রষ্টব্য।

(৪) "আকবরনামা" দ্রষ্টব্য।

"হিন্দ্‌ তুর্ককো ঝগড়া মিটায়ুঁ,
সারা সৃষ্টি এক বর্ণ বনায়ুঁ ॥

সন্তদের এই সব সাহিত্য পাঠে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে তাহারা একটী বিশিষ্ট আদর্শ জনসমাজের সম্মুখে ধারণ করিয়াছিল। অবশ্য ইহাতে অতীন্দ্রিয়ভাব বর্জ্জিত হয় নি বটে, কিন্তু ইহা পারিপার্শ্বিক অবস্থাও অবহেলা করে নি। বরং সেই অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা হইয়াছিল। সরোকিনের বিভাগ অনুযায়ী ইহাকে Idealistic সাহিত্য বলা যাইতে পারে। ইহারই কিয়দংশ মধ্যযুগে লিখিত হইয়াছিল, তথাপি ইহা সামন্ততান্ত্রিক যুগের প্রভাব হইতে বিনির্গত হইয়া জনসাধারণ ও গণশ্রেণীর মধ্যে প্রচার হইয়াছিল। ইহার প্রভাব দ্বারা ভারতীয় সমাজ একটু 'অগ্রসর' স্তরে উপনীত হইয়াছিল। এই জন্য আমরা ইহাকে আগেকার অপেক্ষা প্রগতিশীল সাহিত্য বলিব।

এইবার আসে হিন্দী সাহিত্যের ভক্তিকালের প্রেমকাব্য। এই প্রেমকাব্য অনেক মুসলমান দ্বারা রচিত হইয়াছে। প্রেমকাব্যসমূহে সুফী মত প্রচার হয় আর সেই সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। এই সাহিত্যের প্রথম লেখক ছিলেন কুতুবন (সম্বৎ ১৫৫০)। ইনি শেরশাহের পিতার আশ্রিত ছিলেন। ইহাতে চন্দ্রনগরের রাজকুমার আর কাঞ্চননগরের রাজকুমারী মৃগাবতীর প্রেমকথা লিখিত আছে। এই আখ্যায়িকার মধ্যে লেখক ভগবৎ প্রেমের স্বরূপ দেখাইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে সুফীদের রহস্যময় আধ্যাত্মিক ভাবও পাওয়া যায়। তারপর মনঝনের "মধুমালতী" পুস্তকে কনেসর রাজকুমার মনোহর আর মহারসের রাজকুমারী মধুমালতীর প্রেম বর্ণনা আছে। এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য হইতেছে যে, মানুষের বিরহের দ্বারা ভগবৎ সাধনাই হইতেছে প্রকৃষ্ট পন্থা। ইহার পর আসেন মালিক মহম্মদ জায়সী। "পদ্মাবতী" পুস্তকের রচয়িতা ইনি। এই পুস্তক এত প্রসিদ্ধ হয় যে ইহার পাণ্ডুলিপি ফার্সী, দেবনাগরী ও কয়টি ভাষায় পাওয়া যায়।

এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য হইতেছে যে সিংহল দ্বীপের রাজা গন্ধর্ব্বসেনের কন্যা পদ্মাবতী রূপগুণে (১) অদ্বিতীয়া ছিলেন। পদ্মাবতীর হীরামন নামে এক শুকপাখী ছিল। এই পাখী রাজার ভয়ে উড়িয়া পালাইবার সময় চিতোরের এক ব্রাহ্মণের হাতে পড়ে। ব্রাহ্মণ তাহাকে রতন সেনের নিকটে নিয়া যায়। রাজা পাখীর মুখ থেকে শুনে পদ্মাবতীর রূপে গুণে ব্যাকুল হইয়া যোগী সাজিয়া বাহির হইয়া পড়েন। তৎপর কলিঙ্গ দেশ থেকে এক যোগী দলের সঙ্গে মিশিয়া জাহাজে করিয়া সিংহলে যান। আর হীরামন পাখী গিয়া পদ্মাবতীকে সকল কথা বলে। তারপর রতন সেনের মৃত্যুর পর পদ্মাবতী ও নাগবতী, সহমরণ করেন। আলাউদ্দীন যখন চিতোর পৌছেন তখন তিনি চিতাভস্ম ছাড়া আর কিছুই পান নি। এই পদ্মাবতী পুস্তকই বাংলার কবি সৈয়দ আলাওল "পদ্মাবতী" নাম দিয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক গল্পের নামে সুফী ধর্ম্মের প্রচার করা হইয়াছে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন :—

"তন চিতউর মন রাজা কীনহা;
হিয় সিংঘল বুধি পদমনী চিহ্না।
গুরু সুয়া জেই পঁথ দেখাও।
* * *
মায়া আলাউদ্দিন সুলতানু।"

(১) টডের রাজস্থানে চিতোরের রাণী পদ্মিনীর জন্মস্থান সিংহলে বলা হইয়াছে। ভাটদের কথা অনুযায়ী কর্ণেল টড তাহা পশ্চিম ভারতেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু লণ্ডন হইতে প্রকাশিত "Rajput" নামে অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রিকা এবং "Who are the Rajputs" নামক পুস্তকের রচয়িতা যশোরাজ সিং শিশোদিয়া লেখককে বলিয়াছিলেন যে টড ভুল করিয়াছেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া ইহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এই সিংহল ভারত মহাসাগরের Ceylon Island. তিনি Kandy-র আশে পাশে কৃষকদের মুখে যে গান শুনিয়াছেন তার অর্থ এই যে, "পদ্মাবতী যে গেল আর ফিরলো না।" আর জায়সীর পুস্তকে ইহাকে সিংহল দ্বীপের রাজকুমারী বলা হইয়াছে। ইহা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে, তখনও হিন্দুর জাতিভেদের কড়াকড়ি ছিল না এবং বৌদ্ধদেরও সঙ্গে বিবাহ চলিত।

এর পর আসে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় কবি ওসমান—ইনি "চিত্রাবলী" (১৬১৩ খৃঃ) নামে একটী পুস্তক লেখেন। ইনি নিজামউদ্দিন চিশতীর শিষ্য গোষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার "যোগী চুঁচনখণ্ড" পুস্তকে কাবুল, বাদাকশান, সিংহল দ্বীপ প্রভৃতি দেশের বর্ণনা করেছেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যোগীর ইংলণ্ড ভ্রমণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন—'বলং দ্বীপ দেখা আংরেজা···মদ বরাহ জিঙ্ক কেরা'। কবি এই রচনায় জায়সীকে অনুসরণ করিয়াছেন। ইহার আখ্যায়িকা কল্পিত। তিনি নিজেই বলেছেন—"কথা এক মৈঁ হিত্র উপাই" এই পুস্তকে বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তারপর আসে শেখ নবী (১৬৭৬); ইনি 'জ্ঞান দীপ' নামে এক আখ্যায়িকাপূর্ণ পুস্তক লেখেন। ইহাতে রাজা জ্ঞানদীপ ও রাণী দেবযানীর কথা আছে। ইহার সুফী মতের পদ্ধতি অনুযায়ী লিখিত হইয়াছে। তৎপর আসে কাশিম সাহ (১৭৮৮); ইনি 'হংস জওয়াহির' নামক একটী আখ্যায়িকা লেখেন। ইহাতে রাজা হংস ও রাণী জওয়াহিরের কথা আছে। তৎপর আসে নূর মহম্মদ (১৮০২ সম্বৎ)। ইনি 'ইন্দ্রাবতী' নামে একখানি আখ্যায়িকা কাব্য লেখেন। তাহাতে কালিঞ্জরের রাজকুমার আর আগমনপুরের রাজকন্যা ইন্দ্রাবতীর প্রেমের বর্ণনা আছে। এই গ্রন্থকে সুফী পদ্ধতির শেষ গ্রন্থ বলিয়া নির্দেশ করা হয় (১)। এই সঙ্গে কতকগুলি হিন্দু কবির প্রেম কাব্যও উল্লেখযোগ্য : যথা, দামো কবির (১৫১৬) লক্ষ্মণসেন—"পদ্মাবতীকী" কথা; মোহনলাল কায়স্থের 'রসরতন' কাব্য (১৬৭২), কাশীরামের (কনকমঞ্জরী) (১৭১৫), হরসেবক মিশ্রের (কামরূপকী কথা) (১৮০৮ সং); প্রেমচন্দ্রের (১৮৫৩ সং) 'চন্দ্রকলা'; মৃগেন্দ্র কবির (সং ১৯১২) 'প্রেমপয়োনিধি'। এই হিন্দী কবিদের কাব্যগুলি বেশীর ভাগ পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা নিয়াই লিখিত হয়।

এই প্রেমমার্গ শাখার সাহিত্য হয় অতীন্দ্রিয়বাদ তথ্যযুক্ত গল্প, না হয় রাজা-রাণীর প্রেমের গল্প নিয়া রচিত। ইহাতে পারিপার্শ্বিক সমকালীন অবস্থার কোন উল্লেখ নাই। ইহারা প্রাচীনের সুরই ধরিয়া ছিল। এইজন্য আমরা এই

(১) শুক্ল—পৃঃ ১১৮

সাহিত্যকে প্রগতিশীল সাহিত্য বলিতে পারি না। ইহা Ideational এবং আমাদের বিচারে সামন্ততান্ত্রিক যুগীয় সাহিত্য।

তৎপর আসে ঐতিহাসিকের মতে রামভক্তির শাখা। এই সাহিত্য ভক্তি-মার্গের অন্তর্গত। এই সাহিত্যে তুলসীদাসের (১৫৮৯ সং) রামভক্তির পুস্তকগুলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি কতিপয় রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। ইনি 'রামচরিত মানস' পুস্তকে লোকশিক্ষার্থ নানাভাবে উপদেশ দিয়াছেন—কেবল ব্যক্তিগত-ভাবে নয়, সমষ্টির শিক্ষার্থ নানা রূপকের মধ্য দিয়া সমাজহিতকর নানা উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশের সারাংশগুলি এই: রাজাকে তিনি ঈশ্বরের অংশ বলিয়াছেন, যথা—

"সাধু সুজান সুশীল নৃপালা।
ঈশ অংশ ভব রাম কৃপালা" (১)।"

(রাজার আশ্রমধর্ম্ম পালন প্রয়োজন)। উত্তরকাণ্ডে তুলসী রাম রাজত্বের সমাজকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন,—"বরণাশ্রম নিজ নিজ ধরম, নিরত বেদপথলগ (২)।"

তৎপর স্বামী অগ্রদাস (১৬৩২): তাঁর রামভক্তি বিষয়ে চারিখানি পুস্তক পাওয়া যায়। তৎপরে আসেন অগ্রদাসের শিষ্য নাভাদাসজী (১৬৫৩)। ইঁহাকে কেউ ডোম জাতীয় আবার কেউ বা ক্ষত্রিয় বলেন (৩)। ইঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক হইতেছে "ভক্তমাল"। এই সাহিত্যকেও আমরা প্রগতিশীল বলিতে পারি না। এই পদাবলী গ্রন্থ সাহেবে গুজরী ও মারুরাগে পাওয়া যায়।

এই সাহিত্যে অনেক বড় বড় হিন্দু লেখক উদ্ভূত হইয়াছেন, আবার কতিপয় বিখ্যাত মুসলমান কৃষ্ণভক্তির বিষয়ে কবিতা লিখিয়াছেন। আশ্চর্য্যের কথা এই পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বাঙ্গলাতেও কৃষ্ণভক্তি অনেক মুসলমান কবিকে

(১) তুলসী গ্রন্থাবলী—১ম খণ্ড "রামচরিত মানস" পৃঃ ১৭।
(২) তুলসী গ্রন্থাবলী—১ম খণ্ড "রামচবিত মানস" পৃঃ ৪৫০।
(৩) শুক্ল—পৃঃ ১৪৭

আকর্ষণ করিয়াছে। হিন্দীতে দিল্লীর, রসখান নামে একজন পাঠান সর্দার 'প্রেমবাটিকা' নামে এক কবিতা লিখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি পাঠান সম্রাটদের আত্মীয় ছিলেন। আর একজন ছিলেন আবদুল রহিম খানখানা; ইনি আকবর সাহের অভিভাবক বৈরাম খাঁয়ের পুত্র। আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃতে ইনি অতি পণ্ডিত ছিলেন এবং হিন্দীতে উচ্চাঙ্গের কবিতা লিখিতেন। ইহার সঙ্গে তুলসীদাসের বড় ভাব ছিল। ইনিই "বরঐছন্দ" সৃষ্টি করেন, পরে তুলসীদাস তাহার অনুকরণ করেন। "বরঐ নায়িকা ভেদ" নামক পুস্তক আওধী হিন্দীতে লেখা হয়। এতদ্ব্যতীত দোহাবলী বা 'সতসই' 'শৃঙ্গার-সোরট' 'মদনাষ্টক', 'রাস-পঞ্চাধ্যায়ী,' পুস্তক তিনি লিখিয়াছিলেন। ইহার দোহাবলীর একটী নমুনা :—'হুরদিন পরে রহিম কহ, ভুলত সব কৈ পহিচানি।' ইঁহার কোন পুস্তক আবিষ্কৃত হয় নি। লোকের মুখে ইঁহার কবিতার প্রচার আছে।

তারপর আসেন কাদের—(জন্ম ১৬৩৫ সম্বৎ)। ইঁহার বিবিধ কবিতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার দোহাবলীর একটী নমুনা—যথা—"গুণকো ন পুছৌ কৌ, ঔগুণকী বাত পুছৌ, কহা ভয়ো দৈ। কলিকাল ইযোঁ খরানো হৈ।" এর পর আসেন মুবারক (১৬৪৫ সং)—ইনিও সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সীতে একজন বড় কবি ছিলেন। ইনি কেবল শৃঙ্গার রসের কবিতা লিখিয়াছেন। ইনি নায়িকার অঙ্গের বর্ণনা বড়ই বিস্তারিতভাবে করিয়াছেন। ইহার গ্রন্থের নাম :—"অলক-শতক ঔর তিল-শতক"। ইহার রচনার নমুনা :—

"পরী মুবারক তিয়-বদন অলক ওপ অতিহোয়
মনো চন্দ কী গোদ মে রহী নিসা সী সোয়।"

এইবার আসেন সুরদাস (১৫৪০ সং)। ইঁহার 'সুরসাগর' প্রধান গ্রন্থ। ইনি শৃঙ্গার ও বাৎসল্য রসের একজন অতি শ্রেষ্ঠ কবি। ইঁহার রচনার নমুনা :—(১) "কাহে কো আরি করত মোর মোহন! যোঁ তুম আঙ্গন লোটী?" (২) "মেরে নৈনা বিরহ কী বেলী বই। সীঁচত নৈন—নীরকে সজনী! মুল পতার গই।"

তারপর আসেন নন্দদাস (সং ১৬২৯)। সুরদাসের পরই ইনি কবি বলিয়া গণ্য হন। ইঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক হইতেছে—"রাসপঞ্চাধ্যায়ী"। রচনার নমুনা :—"তাহী ছিন উড়ুরাজ উদিত রস-রাস সহায়ক। কুঙ্কুম-মণ্ডিত বদন প্রিয়া জনু নাগরী নায়ক।" কৃষ্ণ কাব্যের আর একজন বড কবি হইতেছেন মীরাবাঈ। ইনি রাজস্থানের একজন স্ত্রী-কবি এবং উদয়পুরের মহারাণা ভোজরাজের স্ত্রী। ইঁহার কাব্যে কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা নাই। ইনি শুধু দীনতার দ্বারা আপনার হৃদয়ের সমস্ত ভাবনাকে ভক্তিসূত্রে গাঁথিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলেন। মীরা মাধুর্য্যরসের ভক্ত ছিলেন। ইনি নিজে বিরহিনী সাজিয়া আরাধ্য কৃষ্ণের প্রণয় ভিক্ষা চাহিতেন। ইনি নিজের বিষয় বলিতেছেন—

রাজা বরজৈ, রাণী বরজৈ,
বরজৈ সব পরিবারী।
কু'য়রপাটবি সোভি বরজৈ
ঔর সেহল্যা সারী ॥ (১)

নিজের উপর স্বামী গৃহের অত্যাচারের কথা বলিতেছেন,—"রাণা বিষকো প্যাল্যো ভেজ্যো পীয় মগন হোই" (২)। নিজের বৈরাগ্য বিষয়ে তাঁর বক্তব্য—"ছাপা তিলক বনাইয়া ত্যজিয়া সব সিঙ্গার মৈঁ তো সরনে রামকে ভল নিন্দে সংসার" (৩)। কৃষ্ণপ্রেমাত্মক এই সাহিত্যকে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় প্রগতিশীল বলিতে পারি না।

তারপর শুক্লের বিভাগ অনুযায়ী আমরা উত্তর-মধ্য কালে সমুপস্থিত হই। এই যুগকে তিনি রীতিকাল (১৭০০—১৯০০) বলিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, এই যুগে হিন্দী কাব্য পূর্ণ প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইল (৪)। এই সময়ে রস অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কাব্য লিখিত হয়। ত্রিপাটী (১৭০০ সং) থেকে এই

(১) মীরাবাইকা শব্দাবলী—পৃঃ ৩৬।
(২) মীরাবাঈকা শব্দাবলী—পৃঃ ৫৮।
(৩) মীরাবাঈকা শাব্দবলী—পৃঃ ৬০।
(৪) শুক্ল—পৃঃ ২৩৯।

কালের আরম্ভ হয়। ইনি "কাব্য বিবেক", "কবিকুল কল্পতরু" প্রভৃতি কাব্য লেখেন। এই লেখকগণ ভাবুক, সহৃদয় ও নিপুণ কবি ছিলেন। ইঁহারা কাব্য দ্বারা শাস্ত্রীয় তত্ত্ব নিরূপণ করেন। এই সাহিত্যে শৃঙ্গার রসের অনেক সুন্দর রচনা আছে। নায়িকাই এই রসের আধার হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে সাহিত্যে প্রবৃত্তির বিভিন্নরূপ, জীবনের বিভিন্ন চিত্র আর জগতের নানা রহস্য প্রভৃতি স্থান পায় নি। এইজন্য ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় গণ্ডীভূত ও সঙ্কুচিত হইয়াছিল; এবং কবিদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তির প্রকাশ পাই। ইহাতে মার্জ্জিত ভাষা, পদবিন্যাস, অলঙ্কার ব্যবহার ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু এই সাহিত্যের প্রকৃতির বিশ্লেষণ করিলে উচ্চাঙ্গের বস্তুর অভাব দৃষ্ট হয়। (১)

এ যুগে অনেক কবি উদিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে কবি দেবের রচনার নমুনা নিম্নে দেওয়া হইতেছে :—

(১) "সুনো কৈ পরমপদ, উনো কৈ অনন্তমদ,
সুনো কৌ নদীস নদ, ইন্দিরা ঝুরৈ পরী"।

(২) "ডারদ্রুম পলনা, বিচ্ছৌনা নব পল্লবকে,
সুমন ঝঁগুলা সো হৈ তন ছবি ভারী দৈ" ॥

আর একজন মুসলমান কবির নাম উল্লেখযোগ্য—অলী মুহির খাঁ। ইনি ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে "খটমল বাইসী" নামে এক হাস্যরসের পুস্তক লেখেন। ইহাকে "প্রীতমজী"ও বলা হয়। উক্ত পুস্তক হইতে ইঁহার কবিতার উদাহরণ প্রদত্ত হইল :—

(১) "জগৎকে কারণ করণ চারো বেদনকে
কমলমেঁ বসে বৈ সুজান জ্ঞান ধরি কৈ।"

(২) "বিধি হরিহর, ঔর ইনতেঁ নকৌ, তেউ
খাট পৈ ন সোব, খটমলনকোঁ ডরি কৈ ॥"

(৩) "বাঘন পৈ গয়ো, দেখি বনন মেঁ রহে ছপি,
খাটকে নগর খটমলকী দুহাই হৈ।"

(১) শুক্ল—পৃঃ ২৪৩।

এই যুগের আর একজন বিশেষ কবি হইতেছেন ভূষণ। ইনি এই যুগের বীররসের একজন প্রসিদ্ধ কবি (১৬৭০)। ইঁহার আসল নাম এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। চিত্রকূটের রাজা ইঁহাকে কবিভূষণ উপাধি দিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যখন হিন্দুর পুনঃ জাগরণ হইতে থাকে, সেই সময় স্বাধীন হিন্দু শক্তির তুইজন নেতা বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছত্রশাল আর মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শিবাজী, ইঁহাকে আশ্রয় ও সম্মান প্রদান করেন। এইজন্য ইনি একবার বলিয়াছিলেন—"শিবা কো বখানৌঁ কি বখানৌঁ ছত্রশাল কো।" প্রবাদ আছে, তিনি এক এক ছন্দের জন্য লাখ টাকা শিবাজীর কাছ থেকে বখশীশ পাইয়াছিলেন। ইনি বিশিষ্টভাবে বীররসের কবি ছিলেন। ইঁহার "শিবরাজভূষণ", "শিবা বাওয়ানী" এবং "ছত্রশাল দশক" পাওয়া যায়। ইনি শিবাজীকে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ইঁহার একটি বিখ্যাত কবিতা (শিবা বাওয়ানী) মহারাষ্ট্রীয়দের মুখে মুখে প্রচলিত আছে—

"কাশী কা কলা যাতি, মথুরা মসজিদ হোতি,
সুন্নৎ হোতি সবাকার আগর শিবাজী
মহারাজ নহি হোতা প্রকাশ।"

ইঁহার আবিষ্কৃত কবিতার নমুনা :—

(১) "ভূষণ ভনত দিল্লীপতি দিল ধক ধক,
সুনি সুনি ধাক শিবরাজ মরদানে কী"।

(২) "বিলখি বদন বিলখত বিজৈপুর পতি
ফিরত ফিরঙ্গিন কী নারী ফরকতি হৈ

*　　　*　　　*

রাজা শিবরাজকে নগারন কী ধাক সুনি
কেতে বাদসাহন কী ছাতি ধরকতি হৈ॥"

লালকবি নামক এই প্রকারের আর এক কবি ছিলেন। ইনি ছত্রশালের আজ্ঞায় তাঁহার জীবনচরিত কবিতাতে বর্ণনা করেন। পুস্তকের নাম "ছত্রপ্রকাশ।" এই পুস্তকে বুন্দেল বংশের উৎপত্তি, মোগল দ্বারা এই রাজ্যের

অপহরণ, অল্প সৈন্যের দ্বারা ছত্রশালের তাহা উদ্ধার, তৎপর তাহার পুনঃ পুনঃ বিজয় বর্ণনা আছে। ছত্রপ্রকাশের নমুনা,—

"চৌঁ কি চৌঁকি সবদিসি উঠেঁ, সুবা খান খুমান।
অব ধোঁ ধাবৈ কৌনপর ছত্রশাল বলবান॥"

আর একজন কবির নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। ইনি তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ বংশীয়—নাম পদ্মাকর ভট্ট। ইনি সর্ব্বপ্রিয় কবি ছিলেন। জয়পুর নরেশ ইঁহাকে "কবিরাজ শিরোমণি" উপাধি প্রদান করেন। ইনি উত্তর ভারতের অনেক বাদশাহ ও রাজার নিকট হইতে সম্মান ও উপহার পাইয়াছেন। ইঁহার অনেক পুস্তক আছে। ইনি গোয়ালিয়রে দৌলত রায় সিন্ধিয়ার সভায় সম্মান পান এবং তাঁহার প্রশংসাসূচক একটি কবিতা তথায় পড়েন। তাহার নমুনা :—

"বাঁকা নৃপ দৌলত আলীজা মহারাজ কবৌ
সাজি দলপকরি ফিরঙ্গীন দবায়েগো।
দিল্লী দহপট্টি, পাটনা হু কো ঝপট্ট করি,
কবহুঁক লত্তা কলকত্তা কো উড়ায়ে গো"।

এই সাহিত্যের মধ্যে শিখদের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের নাম উল্লেখ-যোগ্য। (১৭২৩ সং)। ইনি হিন্দীতে কতকগুলি ভাল সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। যথা, 'সুনীতি প্রকাশ' 'প্রেমসুমার্গ' 'চণ্ডী চরিত্র' প্রভৃতি। 'চণ্ডী চরিত্র' বড় ওজস্বিনী ভাষায় লেখা হইয়াছে। ইঁহার রচনার নমুনা :—

"বিদ্যাকে বিচার হৌ,
কি অদ্বৈত অবতার হৌ,
কি সুদ্ধতা কী মূর্ত্তি লৌ,
কি সিদ্ধতা কী সান হৌ"

এই সাহিত্যের মধ্যে আমরা প্রগতির কিছুই সংবাদ পাই না এবং ইহার মধ্যে ভূষণ ও লালকবি দুইজন সামন্ততান্ত্রিক রাজার বীরগাথা বর্ণনা করিয়াছেন। এই জন্য আমরা এই যুগের সাহিত্যকে সামন্ততান্ত্রিক যুগের সাহিত্য মধ্যে গণ্য করিব।

আধুনিক কালে হিন্দী গদ্য রচনার সৃষ্টি হয়। এই সময় উত্তর ভারতে ইংরাজ শাসন সংস্থাপিত হইয়াছিল। যে সব কারণে বাঙ্গলা গদ্য রচনার উৎপত্তি হয়, সেই সব কারণেই হিন্দী ভাষায় গদ্যের বিকাশ হইতে থাকে। ইংরাজ শাসনের আবশ্যকতা অনুযায়ী কলিকাতার Fort William College থেকে উর্দ্দু এবং হিন্দীতে গদ্য লিখিবার ব্যবস্থা হয়। এর আগেই "খড়িবোলিতে" সদা শূকলালের "সুখসাগর" ও ইনশাআল্লার্খাঁর "রাণী কেতকীকী কহানী" নামে দুইখানি পুস্তক রচিত হয়। Fort William College-এর আশ্রয়ে লল্লু লালজী গুজরাটী খড়িবোলির গদ্যেতে "প্রেম সাগর" আর সদল মিশ্র "নসিকেতোপাখ্যান" রচনা করেন। এই পুস্তকগুলি পাঠে বুঝা যায় যে, "সুখ সাগর" হইতেছে 'ভাগবতে'র অনুবাদ, আর 'প্রেম সাগর' কৃষ্ণলীলা নিয়া রচিত হইয়াছে। এইগুলি প্রাচীন গল্পকেই ভিত্তি করিয়া গঠিত হয়। সুতরাং এইগুলিকে প্রগতিশীল সাহিত্য বলা চলে না। তৎপরে আসে শ্রীরামপুরের ক্রিশ্চান মিশনারী সম্প্রদায়। ইহারা বাইবেল প্রভৃতি হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিতে থাকেন। ইহারা লল্লু লালজীর বিশুদ্ধ ভাষা আদর্শরূপে গ্রহণ করেন (১)। তৎপর ১৮৯৪ খৃঃ আগ্রাতে মিশনারীরা School Book Society স্থাপন করেন। ইহারা 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' আর মার্সম্যানের প্রাচীন ইতিহাসকে 'কথা সার' নাম দিয়া এক হিন্দী অনুবাদ করেন। তৎপর কলিকাতাতে School Book Society কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পুস্তক হিন্দী পদ্যে প্রকাশিত করেন। ইহার পর আসে মিশনারী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত Orphan Press। ইহাদের ভূচরিত্র, দর্শন, জন্তু, প্রবন্ধ, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তক সামন্ততন্ত্রীয় যুগের প্রভাব বিমুক্ত ও প্রগতিশীল বটে, কিন্তু ইহাতে ভারতীয় সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার চিত্র নাই। ইহাদের সেই জন্য ভারতের জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্গত করা যায় না। ইহার পর রাজা শিবপ্রসাদের "বনারস আখবর" প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহা হিন্দী অক্ষরে লিখিত হইলেও ভাষায় উর্দ্দু ই থাকিয়া যায় (২)।

(১) শুক্ল—পৃঃ ৫০৩।
(২) শুক্ল—পৃঃ ৪৯৭।

তারপর ১৯০৭ সং বাবু তারামোহন মিত্র ও তাঁর বন্ধুবর্গ "সুধাকর" নামক এক সংবাদপত্র বাহির করেন। এই পত্র খাঁটি হিন্দী ভাষায় লিখিত হয়। ইহাতে ভারতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় লিখিত হয়। এই প্রকারে হিন্দী ভাষায় গদ্য লেখার উৎপত্তি হয়।

ইংরাজ রাজত্ব ভারতে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ভারতবর্ষ আবার প্রগতির মুখে ধাবিত হইতে থাকে। ইহার ফলে সর্ব্বপ্রদেশেই প্রগতিপন্থীয় সভা ও তদনুযায়ী পুস্তকসমূহ লিখিত হইতে থাকে। কিন্তু ইংরেজ সংস্কৃতির যে আলো ভারতে সে সময়ে প্রতিভাত হয়, তাহাও ইংলণ্ডের সামন্ততান্ত্রিক যুগের আশ্রয়েই ছিল। এই আলো আপেক্ষিকভাবে ভারতে প্রগতির আকারে প্রকাশ পাইলেও আমরা যে অর্থে প্রগতি বলি তাহার উদয় ভারতে হয় নাই। মিশনারীদের অনুবাদসমূহে অতি প্রাচীন গল্পগুলি এদেশে প্রচারিত হয়। আর যে সব দেশীয় লোকেরা নূতনভাবে পুস্তকসমূহ লিখিতে থাকেন, তাঁহারা ভারতের প্রাচীনকে হালের ভাষাতে আমদানী করেন। এইজন্য এই সব পুস্তক বাঙ্গলা বা হিন্দী বা অন্য প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত গদ্য সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাকে প্রগতিপন্থার ধারার অন্তর্গত বলা যায় না। হিন্দীর গদ্য সাহিত্যের প্রথম উত্থানকালে ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র বিশেষ প্রভাবশালী লেখক ছিলেন। ইঁহাকে বর্ত্তমান হিন্দী সাহিত্যের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করা হয় (১)। ১৯২২ সং হইতে ইনি বাংলা সাহিত্যের নূতন প্রগতির সহিত পরিচিত হন। এর ফলে ১৯২৫এ ইনি "বিদ্যাসুন্দর" নাটক অনুবাদ করেন। ইনি তিনখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইঁহার সময়ের অগ্রে ও পশ্চাতে যে সব অনুবাদ প্রকাশ হইত তাহা পুরাতন তত্ত্বেরই সুর ধরিয়া চলিয়াছিল। ভারতেন্দুর "বৈদিকী হিংসা" "সত্য হরিশ্চন্দ্র" "নীলদেবী" ইত্যাদি নাটকগুলি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক তত্ত্ব নিয়াই লিখিত হয়। ইহার মধ্যে ইনি প্রথম নাটকে রাজা শিবপ্রসাদকে লক্ষ্য করিয়া খোসামুদে ও স্বার্থপর

(১) শুক্ল—পৃঃ ৫১৯

লোকদের বিপক্ষেই লিখিয়াছিলেন (১)। ইঁহার লেখনীর মধ্যে কিঞ্চিৎ আপেক্ষিকভাবে প্রগতির চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু ইঁহার 'কাশ্মীর কুসুম', 'বাদসাহ্ দর্পণ' নামক ইতিহাসে প্রাচীন তত্ত্বের সংবাদই প্রদান করা হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের জীবনকালে একটী সাহিত্যিকমণ্ডলী সৃষ্ট হয়। ইঁহাদের নাম— উপাধ্যায় পণ্ডিত বদরীনারায়ণ চৌধুরী, পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণ মিশ্র, পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস প্রভৃতি। ইঁহারা অনেক উপন্যাস ও নাটক লেখেন। এই সময়ে বহু মাসিক পত্রিকাও হিন্দীতে প্রকাশিত হয়। আবার 'মিত্র বিলাস' প্রভৃতি পত্রিকা সনাতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিল। এই সময়ে সনাতনী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারকদের প্রচারের মধ্যে এক সংঘর্ষ আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্য সর্ব্বত্রই ভারতীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন হয়। ইহার মধ্যে সংস্কারকদের রচনাকে আমরা তৎকালীন অবস্থানুযায়ী আপেক্ষিকভাবে প্রগতিশীল বলিতে পারি। তারপর "নাগরী প্রচারিণী" সভা প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৫০ সং)। এই সভার নিজের পত্রিকাতে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক, দার্শনিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আর ১৯৬৩ সং এই সভা "বৈজ্ঞানিক কোষ" সৃষ্টি করেন। এই বিভিন্ন আলোচনার মধ্য দিয়া আমরা প্রগতির সংবাদ পাই বটে কিন্তু এইগুলিকে ইংরেজী তত্ত্বের দেশী সংস্করণ বলিয়া হিন্দী ভাষাভাষীর নিজের সামগ্রী বলিব না।

অতঃপর আসে গদ্য সাহিত্যের দ্বিতীয় উত্থানের যুগ। এই যুগে বাঙ্গলা উপন্যাসসমূহ অবিশ্রান্ত হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইতেছিল। এই যুগের পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলা উপন্যাসসমূহ ক্রমাগত অনূদিত হইতেছিল। ইহার ফলে বাঙ্গলা ভাষার প্রভাব হিন্দীতে প্রতিফলিত হয়। অনেক হিন্দী লেখক সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষা হইতে সঞ্চয় করিয়া হিন্দীতে ব্যবহার করেন (২)। এই যুগে যে সব সাহিত্য রচিত হয় তন্মধ্যে বাবু রামকৃষ্ণবর্ম্মা দ্বারা বাঙ্গলা ভাষা থেকে 'বীর

(১) শিবপ্রসাদ ভারতীয় গবর্ণমেণ্টপন্থী এবং স্যার সৈয়দ আমেদের সহিত মিলিত হইয়া ভারতীয় কংগ্রেসের ঘোর বিপক্ষতাচরণ করিতেন।

(২) শুক্ল—পৃঃ ৫৬১—৫৬২

নারী' 'কৃষ্ণকুমারী' 'পদ্মাবতী' ইত্যাদি, বাবু গোপালরাম দ্বারা 'বভ্রুবাহন' ইত্যাদি হিন্দীতে অনূদিত হয়। এই সঙ্গে বাবু গোপালরাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকও অনুবাদ করেন। এই সময় পুরোহিত গোপীনাথজী সেক্সপীয়ার-এর দুখানি নাটক অনুবাদ করেন। আবার লালা সীতারাম ও পণ্ডিত সত্যনারায়ণ কবিরত্ন অনেক সংস্কৃত পুস্তকও হিন্দীতে অনুবাদ করেন। ' এই সময়ে অনেক মৌলিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই যুগে আবার বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, শরৎবাবু, চারুচন্দ্র প্রভৃতি বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের পুস্তক অনূদিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস ও অনূদিত হয়। এতদ্ব্যতীত মারাঠী এবং গুজরাঠী ভাষা থেকেও কিঞ্চিৎ পুস্তক অনূদিত হয় (১)। এই যুগে গল্প বা ছোট ছোট আখ্যায়িকাসমূহ অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার মধ্যে বাবু গিরিজাকুমার ঘোষ—লালা পার্ব্বতীনন্দন নাম দিয়া অনেক ভাল গল্প লেখেন। ইহার পরই মৌলিক উপন্যাস লেখা আরম্ভ হয়। এই লেখকদের মধ্যে বাবু দেবকীনন্দন ক্ষেত্রী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার পর আসেন পণ্ডিত কিশোরীলাল গোস্বামী। ইঁহার উপন্যাস সমূহে সমাজের উজ্জ্বল চিত্র, বাসনার রূপ রস প্রভৃতি প্রতিফলিত হয়। এই বিষয়ে ইঁহাকে কিঞ্চিৎ প্রগতিশীল বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ ছিলেন। ইনি নিজের সময়ের লোকের চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি প্রাচীন রাজারাণীর কথা নিয়াই লেখা হইয়াছে এবং ইঁহার বর্ণনার মধ্যে কাল ব্যতিক্রম (anachronism) আছে। তাই এই গুলিকে সামন্ততন্ত্রীয় যুগের সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত করিব। আর এই যুগে যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত সেগুলির মধ্যে সব সময়ে 'প্রগতি' পাওয়া যায় না। অনেকগুলিতে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিলেও রাষ্ট্রে ও সমাজে নূতন আদর্শের চিহ্ন এগুলিতে পাওয়া যায় না। এসব গুলি পুরাতন সভ্যতারই রোমন্থন করা দ্রব্য। ইহার মধ্যে পণ্ডিত মাধব প্রকাশের 'রামলীলা' পুস্তক প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতি পরিপন্থী। গোপাল রামের

(১) শুক্ল—পৃঃ ৫৭২—৫৭২

"রিদ্ধি ও সিদ্ধি" অর্থ বিষয়ক পুস্তক। বাবু বালমুকুন্দগুপ্তের 'শিবশম্ভুকাচিট্টা' একটি রূপাত্মক (allegorical) পুস্তক। অধ্যাপক পূর্ণ সিংহের 'আচরণ কি সভ্যতা' ভাবাত্মক দর্শনশাস্ত্র। ইহার 'মজ্‌দুরী ও প্রেম', কিঞ্চিৎ প্রগতিশীল। এই প্রবন্ধে ইনি পাদ্রী, সাধু, মৌলভী প্রভৃতির সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"এদের চিন্তাবাসি, এদের জীবন বাসি, এদের বিশ্বাসও বাসি এবং এদের খোদাও বাসি হয়ে গেছে" (১)। এই শ্রেণীর আর একজন লেখক ছিলেন—বাবু গুলার রায়। ইনি বিচারাত্মক ও ভাবাত্মক রচনা সকল লিখিয়াছেন, যথা—'কর্ত্তব্য সম্বন্ধী রোগ', 'নিদান ঔর চিকিৎসা', 'সমাজ ঔর কর্ত্তব্য পালন' ইত্যাদি। কিন্তু এই রচনাগুলি সমালোচনাত্মক—নূতন আদর্শ ইহাতে কোথায়?

তারপর আসে তৃতীয় উত্থানের কাল—১৯৭৭ সং। এই যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকসমূহ হিন্দীতে অনূদিত হয় এবং এই সময়ে আধুনিক ঢঙের কতিপয় নাটকও লিখিত হয়। যথা—জয়শঙ্কর প্রসাদের 'জন্মেঞ্জয় কা নাগ যজ্ঞ', 'অজাতশত্রু', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'স্কন্ধগুপ্ত' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব নাটকে প্রাচীন সংস্কৃতি আর সামাজিক পরিস্থিতির বিষয় ভালভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আবার 'বরমালা' এবং 'দুর্গাবতী' প্রভৃতি উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চের নাটকও লিখিত হয়। কিন্তু এই বইগুলিতে সামন্ততন্ত্রীয় যুগের বিষয়বস্তুরই জাবর কাটা হইয়াছে। ইহাতে কোন প্রগতির নির্দ্দেশ নাই। তৎপর লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র "সন্ন্যাসী" ও "রাক্ষস কা মন্দির" দুইখানি সামাজিক নাটক লেখেন। এই সঙ্গে বাবু আনন্দীপ্রসাদ শ্রীবাস্তবের "অছুত" নামক এক নাটক উল্লেখযোগ্য। ইহাতে লেখক অস্পৃশ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকগুলিকে আপেক্ষিকভাবে প্রগতিশীল বলা যায় এতৎব্যতীত আরও অনেক কল্পনামূলক নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু সংস্কৃতির মর্য্যাদার বড়াই আছে। আবার কতক-গুলিতে পরোক্ষভাবে হিন্দু সংস্কৃতির উপর আক্রমণও আছে এবং এই সঙ্গে অবাঞ্ছনীয় কুরুচি ও স্থান পাইয়াছে। অন্যপক্ষে পণ্ডিত মাধব শুক্লের "মহাভারত" নামক নাটকে আর্য্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্তি প্রকাশ করা

(১) শুক্ল—পৃঃ ৫৯৩

হইয়াছে। এই প্রকারের নাটকগুলির মধ্যে কতিপয় পুরাতনের বন্ধন কাটিয়া নূতন যুগের প্রভাবের দিকে ধাবিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলিকে নূতন যুগীয় প্রগতিপন্থী বলা যায় না; অন্যপক্ষে অন্যগুলি প্রাচীনত্বের বড়াই করিয়া প্রগতির পরিপন্থিতা করে।

তৎপর আসে পদ্যের নূতন ধারার উত্থান। ইহার লেখকদের নাম প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর লেখার মধ্যে প্রাচীনের গৌরব ও বর্ত্তমানের অধোগতির তুলনা করিয়া "হায় মা ভারত" বলিয়া বুক চাপড়ান ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় (১)। ইংরেজ শাসন যুগে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম উত্থানের সময়ে ও এই ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যেত। এই প্রকারের সাহিত্য দেশ ভক্তির পরিচায়ক হইলেও আমরা প্রগতির আদর্শমূলক সাহিত্য মধ্যে গণনা করিতে পারি না।

আধুনিক উপন্যাস ক্ষেত্রে বাবু কিশোরীলাল গোস্বামী ও ধনপৎ রায় (প্রেম চাঁদজীর) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক লেখক আছেন যাঁহাদের মধ্যে কৌশিকজী পারিবারিক ও সামাজিক ভাবপূর্ণ গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন; বাবু বৃন্দাবনলাল বর্ম্মা 'গড়কুণ্ডার' নামক সুন্দর উপন্যাস লিখিয়াছেন—যাহা পণ্ডিত উপাধ্যায়ের মতে হিন্দী সাহিত্যে সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছে যেইরূপ Sir Walter Scott-এর রচনা ইংরেজী সাহিত্যে পূর্ণ করিয়াছে (২)। স্ত্রীলোক লেখিকার মধ্যে শ্রীমতী তেজরানী দীক্ষিত প্রথম মহিলা। ইহার পুস্তকের নাম "হৃদয়কা কাঁটা।" 'গিরিজানন্দ শুক্লের' শ্রম কি পীড়া' 'বাবু সাহেব' 'চাণক্য প্রভৃতি উপন্যাসে ভাবুকতা ও সাময়িকতা পাওয়া যায়।

(১) শুক্ল—পৃঃ ৬৩৯

(২) পণ্ডিত অযোধ্যা সিংহ উপাধ্যায়—"হিন্দী কা ভাষা ঔর উসকে সাহিত্যকা বিকাশ" পৃঃ ৬ ০

তৎপর আসে ভাবাত্মক রচনাসমূহ। বঙ্গভাষা থেকে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র ভাব হিন্দী সাহিত্যে বিশেষ প্রতিফলিত হয়। ইহার অনুসরণ করিয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত হিন্দী সাহিত্যে প্রেমোন্মাদ প্রকাশ পাইতে থাকে (১)। তৎপর রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়তা ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ লেখার প্রভাব হিন্দী সাহিত্যে পড়ে (২)। ইহার ফলে হিন্দী সাহিত্যে "রহস্যবাদের" আলোচনা আরম্ভ হয়। এই প্রকার রচনার মধ্যে কৃষ্ণদাসজীর 'সাধনা' ও বিয়োগী হরিজীর 'অন্তর্নাদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুক্ল মহোদয় বলেন, রবীন্দ্রনাথের রহস্যবাদের প্রভাব হিন্দী সাহিত্যে এক ঝটিকা উত্থাপন করে। ইহার ফলে, শুক্ল বলেন, "না জানি কত যুবকই 'অনন্ততে বিলীন' হইবার আকুলতা দেখাইতে থাকে!" (৩) শুক্ল বলেন, হিন্দী সাহিত্য দুর্ব্বল বলিয়াই এই অনুষ্ঠানের উদ্ভব হয়। কিন্তু আমাদের অনুমান ইহার কারণ অন্য স্থলে নিহিত আছে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, পারিপার্শ্বিক রাষ্ট্রীয় অবস্থার জন্য নবোত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের উন্নতি বা আত্মবিকাশ করিবার সুযোগের অভাবেই অতীন্দ্রিয়বাদ, রহস্যবাদ, আধ্যাত্মিকতার দ্বারা "চোখকে মন ঠেরে" নিজেদের মনোভাবকে গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আজকাল হিন্দীভাষায় উপন্যাসের ক্ষেত্র খুব বিস্তৃত হইয়াছে। সেইজন্য সেই উপন্যাসে নানা প্রকারের ভাব-তরঙ্গের উত্থান হইতেছে। কোন উপন্যাসে হিন্দু সংস্কৃতির আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কোনটায় ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করা হইয়াছে, কোনটায় হিন্দু সংস্কৃতিকে পূর্ণভাবে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করা হইতেছে। কাহারো বিচারে পাশ্চাত্য ভাবের ছাপ পূর্ণমাত্রায় পড়িয়াছে, কেহ বা ভারতীয় ভাবের ভক্ত হইয়াছেন। এইভাবে হিন্দী সাহিত্যে নানা ভাবতরঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে (৪); এই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, শৃঙ্গার রসযুক্ত অশ্লীলতাও

(১) শুক্ল—পৃঃ ৬০৭।
(২) শুক্ল—পৃঃ ৬০৭।
(৩) শুক্ল—পৃঃ ৬৮৩।
(৪) উপাধ্যায়—পৃঃ ৬৯৬

সাহিত্যে প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রকারের রচনাগুলির মধ্যে কতকগুলি জন (people) ও গণের (masses) বিষয় নিয়া লিখিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য তা আপেক্ষিকভাবে প্রগতিশীল বটে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে কোন বিশিষ্ট প্রগতিশীল আদর্শের নির্দ্দেশ না থাকায় সেইগুলিকে সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্যের পরের যুগের বুর্জ্জোয়া সাহিত্যের অন্তর্গত বলা যায় না।

এতদ্ব্যতীত হিন্দী সাহিত্যে জীবনচরিত, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, অর্থশাস্ত্র, বিজ্ঞান, সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু এইগুলির অনেকগুলি অনুবাদ মাত্র। ইহাতে মৌলিকত্ব নাই।

এক্ষণে বিচার্য্য যে, বর্ত্তমানকালের হিন্দী সাহিত্যের স্বরূপ কি প্রকারের? প্রাচীন চারণ গাথা থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দী সাহিত্যে সামন্ত-তান্ত্রিক যুগের ছাপ দেখিতে পাই। ইহার অর্থ এই সাহিত্যের মধ্যে রাজারাণী, প্রেম বিরহ, অতঃপর যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদিরই সংবাদ পাওয়া যায় এবং যেখানে রাজারাণীর চিত্রাঙ্কন হয় নাই সেখানে তৎপরিবর্ত্তে জমিদার ও তাহার গৃহিণীকে আনা হইয়াছে। আর এইসব নায়ক নায়িকারাও সামন্ত যুগের দৃষ্টিভঙ্গীতে জগৎকে দেখেন। এইজন্য এই প্রকারের সাহিত্যকে যথার্থ প্রগতিশীল সাহিত্য বলা চলে না। সামন্ততান্ত্রিক যুগের অবসানের পর বুর্জ্জোয়া যুগের অভ্যুত্থানের সঙ্গে যে নূতন সভ্যতার বিবর্ত্তন হয় তা তৎকালীন সাহিত্যে প্রতিভাত হয়। এই যুগে বুর্জ্জোয়া (মধ্যবিত্ত) শ্রেণী সমাজে ও রাষ্ট্রে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়া জগৎকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে। তখন তাহার ধারণা হয় এই জগৎটা তাহার ভোগের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। এইজন্যই সে বৈপ্লবিক হয়, এইজন্যই সে সমস্ত অতীতকে মুছিয়া ফেলিয়া নূতন রাষ্ট্র ও সমাজের সৃষ্টি করে যার কেন্দ্রস্থল হয় সে নিজে। এই বুর্জ্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী নির্দ্দেশসূচক সাহিত্যকে বুর্জ্জোয়া সাহিত্য বলা হয় (১)। এবম্প্রকারের সাহিত্য এখনও হিন্দী ভাষায় বিবর্ত্তিত হয় নি। অর্থাৎ হিন্দী সাহিত্য-ধারার

(১) উদাহরণস্বরূপ ফরাসী বিপ্লবের পরের ফরাসী সাহিত্য এবং আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্রের সাহিত্য।

মধ্যে এখনও বুর্জ্জোয়া সাহিত্যের উদয় হয় নি। অবশ্য এই ধারা ভারতের কোনও সাহিত্যেই এখন বিকাশ পায় নি। তাহার কারণ ভারতীয় সমাজে একটী বুর্জ্জোয়া শ্রেণী বিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এখনও সমাজে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে একটী বিশেষ কাল-ব্যতিক্রম (anachronism) হইতেছে যে ইহা এখনও সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার ছায়ায় আছে। রাষ্ট্রগত আদর্শ বিষয়ে হয় আমরা "রামরাজত্ব" না হয় "পাকিস্থানের" স্বপ্ন দেখি এবং সমাজকে অতি প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাই। এই সব কারণের জন্য ভারতীয় সাহিত্যের কোন শাখার মধ্যেই একটী যথার্থ প্রগতিশীল বুর্জ্জোয়া সাহিত্য দেখিতে পাই না। ভারতের পূর্ব্বভাগে বাঙ্গলা সাহিত্যের অনেক সুনাম শুনা যায় কিন্তু এই সাহিত্য এখনও যে জমিদার বাড়ীর ফটক পার হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ভাবে বলা যায় না (১)। অবশ্য বাঙ্গলায় একদল তরুণ সাহিত্যিকের উদয় হইয়াছে, তাঁহারা বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর অধস্তন স্তরের, অর্থাৎ গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত স্ত্রী ও পুরুষের বিষয় নিয়া লেখেন। কিন্তু তাঁহাদের লেখার মধ্যে নূতন সামাজিক আদর্শের কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। তাঁহাদের লেখার মধ্যে বরং Morbidity পাওয়া যায়, অর্থাৎ কেবল আদিরসের বর্ণনায় তাঁহাদের লেখনী পর্য্যবসিত হইতেছে এবং Oedipus Complex-এর অনুসরণ করিয়াই তাঁহারা পরিশ্রান্ত হইতেছেন। তাঁহাদের লেখার মধ্যে একটা বিজাতীয় ভাব স্পষ্টই ধরা পড়ে। এই সাহিত্যিক ভাবধারাও হিন্দী সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। হিন্দী মাসিক পত্রিকাসমূহে হাল ফ্যাসানের যুবক যুবতী সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে যা পড়িলেই অনুমিত হইবে যে ইহা বিলাতীর নকল মাত্র। হিন্দীভাষী হিন্দু সমাজের মধ্যে এ প্রকারের সামাজিক পরিস্থিতি এখনও হয় নি। অন্যপক্ষে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে যাহার মধ্যে 'জন' ও 'গণের' জীবনী অঙ্কিত হইয়াছে। যথা "হংস" দশম বর্ষ দ্বিতীয় অঙ্ক—"রাধা ও

(১) স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বিপ্রদাস' দ্রষ্টব্য।

রাধা"—গল্প ; "সরস্বতী" (১) ১৯৩৬ ডিসেম্বর, "ধরণী কা রাজা" শীর্ষক কৃষক জীবনের করুণ কাহিনী ; "হংস" দশম বর্ষ—৩য় অঙ্ক ; "ভাগ্যতারা"—ইহা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাল ফ্যাসানের যুবক যুবতীর জীবনী অঙ্কন করার জন্য ইহাকে আপেক্ষিকভাবে প্রগতিশীল বলা যাইতে পারে কিন্তু এবম্প্রকারের প্রবন্ধ দ্বারা একটা বুর্জ্জোয়া ও একটা প্রলেটারীয় সাহিত্য সৃষ্ট হয় না। শেষে আসে প্রেমচন্দ্রজীর উপন্যাসসমূহ। তাঁহার লেখার বিপক্ষে ও স্বপক্ষে অনেক সমর্থক আছেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে প্রেমচন্দ্রজী বর্ত্তমান সময়ের হিন্দী সাহিত্যের একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন। একজন লেখক তাঁহাকে Maxim Gorkyর সঙ্গে সমান দরের লোক বলিয়া তুলনা করিয়াছেন (২)। গর্কী সমাজ ও রাষ্ট্রে একটি বিশিষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন কিন্তু প্রেমচন্দ্রে তাহা পাই না। অন্যপক্ষে আর একজন সমালোচক বলিয়াছেন যে, প্রেমচন্দ্রের লেখা পড়িয়া বোধ হয় যে জায়গীরদারী সভ্যতার প্রতি কিঞ্চিৎ স্নেহ তাঁহার হৃদয়ে এখনও বর্ত্তমান। এই স্নেহ পুরাতন সভ্যতার ধ্বংসের বর্ণনায় প্রকাশ পায় (৩)। আবার বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা যাহা 'মহাজনী সভ্যতা' বলিয়া প্রেমচন্দ্র নামকরণ করিয়াছেন —তাহার বীভৎসতা তিনি নগ্নরূপে লোকের কাছে ধরিয়াছেন। এই জন্য ইহাকে আপেক্ষিকভাবে প্রগতিশীল বলা যাইতে পারে। প্রেমচন্দ্রজীর 'গবন' নামক উপন্যাস গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার রমানাথবাবু, মীরা, রমেনবাবুর স্ত্রী প্রভৃতি কতটা মধ্যদেশের হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি তা বিবেচনা করিবার বিষয়। অন্যপক্ষে 'গোদান' ঐ স্থানের কৃষক জীবনের চিত্র প্রদান করে। আধুনিক হিন্দী গল্প সাহিত্য

(১) বঙ্গভাষাতেও এবম্প্রকারের প্রগতিমূলক সাহিত্য সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকগণ তাঁহাদের অন্যতম।

(২) হংস—দশম বর্ষ ৩য় অঙ্ক ডিসেম্বর—১৯৩৬ চন্দ্রভান জোহরী দ্বারা "মৈক্সিম্ গর্কী ওর উস্‌কি অমর কীর্ত্তি মা"—পৃঃ ২১৪

(৩) মাধুরী—সেপ্টেম্বর পৃঃ ১৯৩৯—শ্রীরামবিলাস শর্ম্মার 'মহাজনী সভ্যতা' দ্রষ্টব্য।

পড়িয়া ইহাই মনে হয় যে, বাঙ্গলা ভাষায় যে অস্বাভাবিক ও বৈদেশিক ভাবপূর্ণ সাহিত্য যা কেবল 'এডিপুস কম্‌প্লেক্স' এর চিত্রণেই ব্যস্ত, তারই হুবহু নকল হিন্দী সাহিত্যে আমদানী করা হইতেছে। এই সব গল্প পড়িয়া পাঠক ঠাহর করিয়া উঠিতে পারেন না যে, আখ্যায়িকাটি কলিকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে সংঘটিত হইতেছে কি পশ্চিমের কোন সহর বা গ্রামে। বুর্জ্জোয়া সাহিত্য এখনও ভারতে উদয় হয় নাই—হিন্দীতেও না। পক্ষান্তরে ভারতীয় সাহিত্য মধ্যে গণসমূহের আদর্শ অনুযায়ী সাম্যবাদীয় গল্প প্রকাশ পাইতেছে। তাহা যুগপৎ সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর বিপক্ষে ভাব প্রকাশ করিতেছে। অবশ্য এ 'প্রলেটারিয়েট' সাহিত্যও নয়। ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের বিবর্ত্তনের উপরেই ভবিষ্যতের সাহিত্য নির্ভর করিবে।

উর্দু সাহিত্যে প্রগতি

এক্ষণে উর্দু সাহিত্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। উর্দু ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বঙ্গভাষীদের জ্ঞান কম। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে ইহা মুসলমানের ভাষা এবং এই ভাষার সাহিত্য তাঁহাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি। বর্ত্তমানের রাজনীতিক বিবাদ এই ধারণা আরও বদ্ধমূল করিয়াছে। কিন্তু ভারতে অনেক হিন্দু আছেন যাঁহাদের মাতৃভাষা উর্দু; অন্যপক্ষে, ভারতের বেশীরভাগ মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দু নহে! এই জন্য, এই বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক আলোচনা এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

উনবিংশ শতাব্দীতেই উর্দু ভাষা পুষ্টি লাভ করে। এই শতাব্দীর শেষাশেষি ৺অধ্যাপক মহম্মদ হুসেন আজাদ প্রথমে "আবেহায়াৎ" নামক পুস্তকে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি বলিতেছেন "ইতনী বাত হর সখস জানতা হ্যায় কি হমারী উর্দু জবান বরজ ভাষাসে নিকলী হ্যায় অউর বরজ ভাষা খাস হিন্দুস্থানী জবান হ্যায়" (পৃঃ ১)। এতদ্বারা আমরা এই সন্ধান পাই যে উর্দু, সৌরসেনী-প্রাকৃতের বর্ত্তমানের অন্যতম সন্তান "ব্রজভাষা" প্রসূত। কিন্তু রাম নরেশ ত্রিপাঠী বলেন উর্দু কখন কোন ভাষা হইতে বহির্গত হয় নাই। "হিন্দী" ভাষারই নাম উর্দু রাখা হইয়াছে; এই ভাষার নাম "মুসলমানী হিন্দী" রাখিলে নামের অধিকতর সার্থকতা হইত (কবিতা কৌমুদী ৪ ভাগ, পৃঃ ৩)। কিন্তু রামবাবু সাকসেনা(১) বলেন দিল্লী ও মীরাটের চতুষ্পার্শ্বে সৌরসেনী-প্রাকৃত উদ্ভূত যে পশ্চিম বিভাগীয় হিন্দী প্রচলিত আছে উর্দু তাহারই একটী উপভাষামাত্র। উর্দু নামটি হালে প্রদত্ত হইয়াছে। দিল্লী মুসলমান বাদসাহদের রাজধানী হওয়ায় ঘটনাচক্রে এই ভাষা সাধারণের

(১) R. B. Saksena "A History of Urdu Literature. P. 7.

ভাষা (Lingua Franca) হইয়াছে। এই জন্য মীর আমন প্রভৃতি যখন বলেন ইহা দিল্লীর বাজারের "খিচড়ী ভাষা" তখন তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। সাকসেনার মতে আজাদও ভুল করিয়াছেন যখন তিনি ব্রজ ভাষাকে উর্দুর জননী বলেন। বরং আর একটী পশ্চিম বিভাগীয় উপভাষা হইতেই উর্দুর উৎপত্তি হয়। এখনকার মত এই যে, পৃথ্বীরাজের সময়ে যে ভারতীয় ভাষা দিল্লী এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত ফার্শী প্রভৃতি মিশ্রিত হইয়া উর্দুর সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভারতীয় ভাষাটির নাম এক্ষণে "খড়ী বোলী" বলা হয়। ইহাও সৌরসেনী-প্রাকৃত প্রসূত একটী উপভাষা মাত্র। কিন্তু এই নাম পূর্ব্বেকার কোন পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ৺পদ্ম সিং শর্ম্মা(১), বলেন সাধারণের ভাষাকে মুসলমান আমীর ওমরাহেরা "ভাষা" বলিতেন, পরে দক্ষিণ হইতে ওয়ালী দিল্লীতে আসিয়া যখন সাধারণের ভাষা ও ফার্শী মিশ্রিত "দীবান" নামক সাহিত্য প্রকাশ করেন, তখন মুসলমান আমীরেরা দেখিলেন, "বাঃ এত আমাদের ঘরের ভাষায় লিখেছে!" তখন তাঁহারা ফার্শী ভাষায় কবিতা লেখার অভ্যাস ত্যাগ করিয়া এই মিশ্রিত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে যাহা "পড়ে" ছিল তাহা "খাড়া" করা হয়! (এই বিষয়ে 'আবেহায়াৎ' দ্রষ্টব্য)! পণ্ডিত চন্দ্রধর শর্ম্মা গুলেরী বলেন, উর্দু রচনাতে ফার্শী ও আরবী তৎসম ও তদ্ভব শব্দ সমুহ বহিষ্কৃত করিয়া সংস্কৃত অর্থাৎ হিন্দীর তৎসম ও তদভব রাখিয়া তাহাকে হিন্দীতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে, এই জন্য উর্দু হিন্দীর একটী বিভাগমাত্র (পদ্মসিংশর্ম্মা দ্বারা উদ্ধৃত পৃঃ ৩৪-৩৫)। এই সব মতানুসারে হিন্দুস্থানী বা উর্দু "উর্দু-ই-মুয়াল্লার" (সৈনিক বাজার) খিচড়ী ভাষা নহে। এই উর্দুর পুরাতন নাম ছিল হিন্দী! এই শব্দের প্রথম সংবাদ আমরা পাই, আমীর খসরুর অভিধান—'খালেক-বারী'তে। তিনি "হিন্দী" আর "হিন্দবী" উভয় শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার অর্থ, ভারতীয় ভাষা।

পূর্ব্বেকার অনেক মুসলমান কবি যথা আতিশ, ইনসা, বাকর আগহ, জুরঅত,

(১) পদ্মসিংহ শর্ম্মা-"হিন্দী, উর্দু ঔর হিন্দুস্তানী।"

মীর, মুসাফী উর্দুকে "হিন্দী" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই শেষোক্তদের যুগে ফার্শী হইতে পার্থক্য দেখাইবার জন্য উর্দুকে "হিন্দী" নামে অভিহিত করা হইত। এতদ্বারা তাঁহারা বুঝাইতে চাহিতেন যে, ইহা দেশজ ভাষা, বৈদেশিক নহে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয়েরা এই ভাষাকে "Indostan" বলিত। পরে ইংরেজ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ডাঃ গিলক্রাইষ্ট ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে "Hindustanee" এই নামটির সৃষ্টি করেন এবং নির্দ্ধারিত করিয়া দেন যে ইহার দুই শাখা-হিন্দী এবং উর্দু! এই সঙ্গে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে হিন্দী ব্যাকরণের সৃষ্টি করেন এবং আরবী ব্যাকরণের উপর উর্দু ব্যাকরণের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। এই প্রকারে সাম্রাজ্যবাদীয় নীতির সার্থকতা স্বরূপ আজ আমরা "হিন্দী" ও "উর্দু" ভাষার উদ্ভব ও কলহ ভারতের ইতিহাসে প্রাপ্ত হই!

ভারতীয় হিন্দী বা হিন্দবী (১) ভাষা কবে হইতে বিদেশীজাত শব্দসমূহ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে এই প্রশ্ন এক্ষণে উঠিয়াছে। অধ্যাপক আজাদ বলিয়াছেন, গোড়া হইতেই আরবী ফার্শী শব্দ সমূহ দেশজ ভাষাতে গৃহীত হইতে থাকে। তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি কবি চাঁদ বরদাইএর "পৃথ্বীরাজ-রাসো" উল্লেখ করেন। আবার, তিনি ইহাও বলেন যে, তখনকার ভাষা এখনকার হিন্দীর সহিত মিলে না (পৃঃ ১৫)। কিন্তু, বর্ত্তমানের সমালোচনা ইহা প্রমাণিত করিয়াছে যে চাঁদ "ডিঙ্গল" ভাষায় আকবরের সময়ে তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন! কাজেই অনেক বিদেশী শব্দ সেই সময়ে হিন্দুদের কথ্য ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। তদ্রূপ, তুলসীদাসের ভাষাও আকবরের সময়ের হিন্দুদের ভাষা, ইহাতেও বৈদেশিক শব্দ অপ্রতুল নহে। তৎপর, আজাদ বলেন, খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে কায়স্থ জাতীয় লোকেরা সিকন্দর লোদীর শাসন কালে রাজকর্ম্ম গ্রহণ করে ভাষাতে ফার্শীশব্দ সমূহ প্রবিষ্ট করায় (পৃঃ ১৬)।

ইহার পর আসে, আকবরের যুগ, তখন উভয় জাতির সম্মিলনের যুগ। আজাদ বলেন, "ওমরাহেরা জোব্বা ও দস্তা পরিধান করিতে থাকে এবং দাড়ীকে

(১) পেশোয়ারের ভাষাকে এখনও "হিন্দবী" বলা হয়।

'খোদা হাফিজ' (বিদায়) করিয়া দেয় এবং খারকীদার পাগড়ী মাথায় দিতে থাকে। অন্য পক্ষে হিন্দু অভিজাতেরা, রাজা এবং মহারাজেরা ইরাণী পোষাক পরিতে থাকে, ফার্শীভাষা শিক্ষা করিতে থাকে এবং "মির্জা" পদবী গ্রহণ করিতে থাকে" (পৃঃ ১৬-১৭)। আকবরের দরবারে যে হিন্দীর প্রচলন ছিল তাহার নানা প্রমাণ আছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ মিঞাঁ তানসেনের গানসমূহ। পুনঃ, 'আকবর নামা' ও বদায়ুনী লিখিত পুস্তক সমূহে আকবরের বাল্যকালের একটী ঘটনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়। ঘটনাটি এই: তাঁহার যখন চৌদ্দ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার দুধ-ভাই (Foster brother) জীঘাংসাপরায়ণ হইয়া বৃদ্ধ অর্থসচিবকে হত্যা করে। ইহাতে রাজপ্রাসাদে গোলমাল পড়িয়া যায়। এই সময়ে তিনি ঘুমাইতেছিলেন, গোলমাল শুনিয়া উঠিয়া ছাতের পাঁচিল থেকে উঁকি মারিযা তাঁহার দুধ-ভাইকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

"আয়—তু (ফলানা) বেচারাকো মারি কিস্তি?" কেহ কেহ বলেন, তিনি জাগিথাই তুর্কিতে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক সঠিক তথ্য এই যে, তিনি উক্ত কথাই বলিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা দেখি যে ইহা স্থানীয় মিশ্রিত হিন্দী ব্যতীত আর কিছু নয়! তৎপর আজাদ বলেন, "আউরঙ্গজেবকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা এক নূতন প্রকারের আম্র উপহার পাঠান। তিনি হিন্দী ভাষায় তাহার নামকরণ করেন।" পুনঃ, তিনি বলেন, মুসলমানেরা এই সময়ে এই দেশে বসবাস করে, এই দেশের ভাষাকে আদর করে; তাহার সাক্ষ্য আমীর খস্রৌ ও মুহম্মদ জায়সীর কবিতা। তাঁহারা এই দেশের ভাষাকে স্বীয় মাতৃ ভাষা বলিয়া গ্রহণ করেন।

পৃথ্বীরাজের পতনের আশী বৎসর পরে ভারতবর্ষে আমীর খস্রৌর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা বলখ সহর হইতে মঙ্গোলদের ভয়ে ভাবতে পলাইয়া আসেন। তিনি তুর্কীবংশীয় ছিলেন। খস্রৌ ফার্শী আর স্থানীয় দেশজ ভাষায় কবিতা লিখেন। এক্ষণে দৃষ্ট হয়, যে দেশজ ভাষায় কবিতা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আজকাল কার "খড়িবোলী" হিন্দী। এইজন্য বর্ত্তমানের হিন্দী সাহিত্যিকেরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ যে তিনি খড়ি বোলীকে সর্ব্বপ্রথমে সাহিত্যে স্থান দেন।

তাঁহার এই দেশজ ভাষা দিল্লীর আশপাশের স্থানীয় "হিন্দী"। বর্ত্তমানের কোন কোন লেখক তাঁহাকে বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বপ্রথম জাতীয় কবি বলিয়া অভিহিত করিতে চাহেন্। কথাটা অতি সত্য। তদ্ব্যতীত, তিনি ভারতবর্ষকে যে চক্ষে দেখিয়াছেন এবং যে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছেন, সেই ভাবে কেবলমাত্র বহুপূর্ব্বে, বিষ্ণুপুরাণে এবং বহুপরে বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরং" সঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে। একটী ফার্শী কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

"চুঁদর চীন দিদ বুলবুল-ই বোস্তাঁরা।
(যারা চীনের পক্ষী দেখিয়া ফুলবাগানের বুলবুল দেখিয়াছে বলে)
ন দানেন্দ তুতি-ই-হিন্দুস্থান রা।
(তারা হিন্দুস্থানের তুতিপাখির সংবাদ কি জানে !)

খোরাসনী ক হিন্দি গরদেশই-ঘুল
(খোরাসানীরা বলে হিন্দুস্থানের লোকেরা বিদ্রোহী ভূত)
কসে ওয়াসৎ নিজদস তাম্বুল।
(যে জঙ্গলের ঘাস মুখে করেছে সে তাম্বুলের আস্বাদন কি জানে !)
সিয়াহ্ গোয়ন্দ হিন্দু হামচুঁনি অস্ত।
(ইহা সত্য যে হিন্দু কৃষ্ণ বর্ণের)
সোয়াদ-ই আজাদ-ই আলম হমী অস্ত।
(কিন্তু এই দেশ সর্ব্বদেশ হতে সেরা)
বেহেস্তে ফরজ কুন ইন হিন্দুস্থান রা
অজকুজা নিসবৎ অস্ত ইন বোস্তাঁরা।
(স্বর্গের সহিত নিশ্চয়ই হিন্দুস্থানরূপ বোস্তাঁর সম্বন্ধ আছে।)
ওয়াগর আদম ওয়া তাউস্ ন আঁ জাযে।
কুজা ইজাঁ সুসন্দে মঞ্জল আঁরায়ে"।

(তাহা না হইলে আদম এবং ময়ুর পক্ষী এই স্থলে আসিয়া
নিজেদের বাসস্থান নির্ম্মান করিত না।) (১)

পুনঃ, তিনি বলিয়াছেন, "অজকুজা গঙ্গা-ই-হিন্দুস্থান ববদ্ দুর।
য নীল ওয়া দিজলা লফদ হস্ত মাজুর।"

(যে হিন্দুস্থানের গঙ্গা হইতে দূরে থাকে, তাহার কাছে নীল ও টাইগ্রিসনদীর জল বড় সুমিষ্ট!)

আমীর খস্রোকে উর্দু ভাষার জনক বলা হয়, কারণ তিনি গোটাকতক গজল লিখিয়াছেন যাহাতে নানা ভাষার সংমিশ্রণ আছে, যথা:

"য হাল, মিস্কিন মকুন তাগাফুল দুরায়ে নৈনা বনায়ে বতিয়াঁ।
কি তাবে, হিজরা নদারম আয়জান নলেহু কাহে লগায়ে ছাতিয়া।
সবানে হিজরা দরাজ চুঁ জুল্ফ উও রোজে ওসলত চু উমর কোতাহ।
সখী পিয়া কো জো ময় ন দেখুঁ তোকৈসি কাটুঁ আন্ধেরী রাতিয়াঁ।
একায়ক অজদিল দো চসমে জাদু বসদ ফেরেবম বেবর্দ তসকিন।
কিসী পড়ী হৈ জো শুনাওয়ে পিয়ারী পিকি হমারী বাতিয়াঁ।
চু সামহ সোজাঁ চু জররহ হায়রান জমহর আঁমহ বগসতিম্ আজর।
ন নিন্দ নৈনা ন অঙ্গচৈনা ন আপ আওয়ে নভেজে পতিয়াঁ।
বেহক রোজ উহসাল দিলবরকি দাদমারা ফরেব খসৌ।
সপিতমনকে দুরায়ে রাখুঁ জো জায় পাউ পিয়াকে খতিয়াঁ।"।

এই গজলে আরবী, ফার্শী, ব্রজভাষা ও খড়ি বোলী এই চারিভাষার মিশ্রণ করা হইয়াছে। কিন্তু এতদ্বারা তাঁহাকে উর্দু ভাষা বা সাহিত্যের জন্মদাতা বলা চলে না। বর্ত্তমানে অধ্যাপক ব্রাউন এক দাবী উপস্থাপিত করিয়াছেন, যে পারস্যের কবি সেখ সাদিই প্রথম হিন্দুস্থানী বা উর্দু ভাষার জন্মদাতা, কারণ কতকগুলি গজলে তিনি হিন্দুস্থানী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন (History

(১) মুসলমান ধর্ম্মমতে শয়তান ময়ুর পক্ষীরূপে আদম ও ঈভকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। এইজন্য আল্লার শাপে তাহারা সারংদ্বীপে (সিংহল) অবতরণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকে।

of Persian Literature দ্রষ্টব্য!) অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার কবি ভারতচন্দ্রও এই প্রকারের মিশ্রিত ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন, যথা :—

'"শ্যামহিত প্রাণেশ্বর বায়দ্‌কে গোয়দ কবর,
কাতর দেখে আদর কর মর বোরোয় কে,
বক্তং বেদং বেদং চন্দ্রমা চূ লালা চে রেমা,
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা মেটিমে কাছে শোয় কে,
যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি দরজানে মন আয়ৎ খোসি,
আমার হৃদয়ে বসে প্রেমকর খোশ হোয় কে,
ভূয়ো ভূয়ো রুরোদসি ইয়াদৎ নমুদা জাঁ কোশি,
আজ্ঞাকর মিলে বসি ভারত ফকীরী খোয়কে"

এই কবিতায় বাঙ্গলা, সংস্কৃত, ফার্শী ও হিন্দী শব্দসমূহ মিশ্রিত হইয়াছে। কিন্তু এতদ্বারা ভারতচন্দ্রকে একটি নূতন ভাষার স্রষ্টা বলা যায় না, বা ইহাকে "মুসলমানী বাঙ্গলা"র অন্তর্গত করা যায় না।

খস্রৌ গুটি কতক গজল মিশ্রিত ভাষায় লিখিলেও উর্দু ভাষার সৃষ্টি তখনও হয় নাই। আকবরের সময়ে তাঁহার রাজস্বসচিব টোডরমল্ল প্রত্যেক গভর্ণমেণ্ট কেরানীকে ফার্শী শিখিতে বাধ্য করান। এই সময়ে কায়স্থেরা ফার্শী শিক্ষা করিয়া তখনকার হিন্দীতে ফার্শী শব্দ প্রবেশ করাইতে থাকে। কিন্তু এতদ্বারা একটা খিচড়ী কথা ও ভাষার সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু একটা পৃথক সাহিত্যের তখনও সৃষ্টি হয় নাই। বরং এই সময় থেকে হিন্দী এত ফার্শী ও আরবী শব্দে ভারাক্রান্ত হয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে রাজা শিবপ্রসাদ যখন সাধারণের ভাষা থেকে হিন্দী সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন, তখন সেই "আমফাম্" ভাষা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, দৃষ্ট হয় যে তাহা 'উর্দু' হইয়াছে! কিন্তু, মুসলমান আমীর, ওমরাহদের মধ্যে "ভাষা" ও ফার্শী, তুর্কি প্রভৃতির সহিত একটা মিশ্রিত ভাষা কথিত হইতে থাকে। এই যে সর্ব্বত্র মিশ্রিত একটা ভাষার উদ্ভব হইতে থাকে, তাহাকে 'রেখতা' (Scattered) এই নাম প্রদান করা হয়। মীরজফর

জটলের লিখিত এই রেখতা ভাষার কবিতাকে মহম্মদ সাহের যুগের পূর্ব্বের রেখতার নমুনা বলা যায় (আবেহায়াৎ পৃঃ ২৩)। এই সময়ে, এই মিশ্রিত ভাষা সহরে কেবল চলিতেছিল। কখন কখন আমীররা এই ভাষাতে কবিতা লিখিতেন। কিন্তু কেহ তাহাদের সংশোধন করিয়া দিত না। তখন সকলে ফার্শীতে কারবার করিতেন। মুসলমান কবিরা বরাবর হয় ফার্শী না হয় হিন্দীতে কবিতা লিখিতেন। হিন্দীর সহিত ফার্শীর মিশ্রিত "রেখতার" প্রতি কেহ নজর দিতেন না। এমন সময়ে দক্ষিণ হইতে ওয়ালী দিল্লীতে আসিয়া তাঁহার "দীবান" প্রকাশিত করেন। তিনি এই রেখতা ভাষাতেই এই সব কবিতা লিপিবদ্ধ করেন। উত্তরের অবস্থা যেমন এই প্রকারের ছিল, দক্ষিণে মুসলমান রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় একটা মিশ্রিত ভাষা ও তাহার সাহিত্য সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহাকে 'দক্ষিনী' ভাষা বলা হইত। এই সাহিত্যে হিন্দী, তামিল, মহারাষ্ট্রীয় ভাষাসমূহের সহিত ফার্শী মিশ্রিত করিয়া একটা সাহিত্য উদ্ভূত হয়। ওয়ালী সেই মিশ্রিত (রেখতা) ভাষায় দীবান লিখিয়া দিল্লীতে উদয় হন। ওয়ালীকে 'রেখতার পিতা' বলা হয়। তিনি (খৃঃ ১৬৬৮-১৭৪৪) দক্ষিণে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দিল্লীর লেখকেরা তাঁহার লেখাকে নমুনা করিয়া লিখিতে আরম্ভ করে। সকলে দেখিল, যে ভাষা তাহাদের গৃহে কথিত হয়, যাহা তাহাদের মাতৃভাষা, সেই ভাষাকেই ত ওয়ালী সাহিত্য মধ্যে স্থান দিয়াছেন। এতদ্বারা ইহাতে দিল্লীতে সাড়া পড়িয়া যায়। তাঁহার ভাষায় ফার্শী শব্দ আছে কিন্তু দেশজ শব্দ বেশী। এই চলিত ভাষাকে উত্তরের লেখকেরা গ্রহণ করেন এবং এই ভাষাতে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্শীকে বিতাড়িত করে। রামবাবু সাকসেনা সত্যই বলিয়াছেন যে ইহা দ্বারা বিজিতেরা বিজেতাকে পরাস্ত করে। ফার্শী তাহার স্থানচ্যুত হইয়া এখন একটা প্রাচীন ক্লাসিকাল ভাষারূপে পঠিত হয়। এই প্রকারেই বিজিত এ্যাংগ্লো-স্যাক্সনের সহিত বিজেতা নর্ম্মানদের ফরাসী ভাষা মিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমানের 'ইংরেজী' ভাষা সৃষ্ট হইয়া ইংলণ্ডের রাজসভা হইতে ফরাসীকে বিতাড়িত করে।

এক্ষণে কথা উঠে উর্দু যদি আসলে হিন্দীই হয়, তাহা হইলে এই পার্থক্য কোথা হইতে আসিল। এই বিষয়ে অধ্যাপক আজাদ বলিতেছেন, দেশে অনেক মুসলমান অভিজাতবংশ বাস করিত, যাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষের দেশ ইরাণ, আরব, তুর্কিস্থান প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে নাই। তাহাদের সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড, বিবাহাদিতে ফার্শী ভাষায় গল্পাদি কথিত হইত। বৈদেশিক চালচলন তাহাদের মধ্যে ছিল, কাজেই সেইসব ব্যক্ত করিতে তাহারা ফার্শীভাষার অলঙ্কারাদি উর্দুতে প্রয়োগ করিতে বাধ্য হন। ইহারই ফলে, "ভাষাকে' ইরাণী পোষাক পরিধান করাইয়া উর্দু করা হইয়াছে (আবেহায়াৎ পৃঃ ২৯)। পুনঃ কতকগুলি হিন্দী অক্ষরও ছদ্মবেশে উর্দু অক্ষর মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

তৎপর, বড় কথা যে, যে সব মুসলমান কবি উর্দুতে কবিতা লিখিতে লাগিলেন তাঁহারা ফার্শীতে বিশেষ পণ্ডিত। এই জন্য, নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য ভাষাতে ফার্শী কবিতার সমস্ত বাকপদ্ধতি (Idioms) প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। লোকেরা ইহাতে অভ্যস্ত হইলে, পুনঃ পণ্ডিতেরা আরবী শব্দ প্রয়োগ করিতে থাকেন। আর বর্ত্তমান যুগে, সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আবর্ত্তে পড়িয়া ইকবাল প্রভৃতি লেখকেরা কোন কোন স্থলে ফার্শীর ক্রিয়াপদও উর্দুতে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। এই সঙ্গে, উনবিংশ শতাব্দী হইতে বিভিন্ন মুসলমান কবিরা হিন্দী বা দেশজ শব্দ সমূহ উর্দু সাহিত্য হইতে বিতাড়িত করিতে থাকেন। এই ব্যাপারের ফলেই, সৌরসেনী প্রাকৃতের অপভ্রংশ তথা-কথিত 'খড়িবোলী' আজ ফার্শী পরিচ্ছদে হিন্দুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে। ইহা উত্তরের রাজনীতিক্ষেত্রে একটা Frankenstein-রূপ ধারণ করিয়াছে! কিন্তু এক্ষণে, উর্দু সাহিত্যে এই ফার্শী করণের বিপক্ষে একটা প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। একদল লেখক উর্দুকে অযথা ফার্শীকরণের বিপক্ষে প্রতিবাদ করিতেছেন (উপেন্দ্র অশকের "উর্দু সাহিত্যমে নয়ী ধারা" দ্রষ্টব্য)। ইহাদের মধ্যে কবি হাফিজ জলন্ধরী, সাগর নিজামী, বকার আম্বাওলী, সংবাদপত্র "রোজানা হিন্দ" (কলিকাতা) প্রভৃতি

আছেন। ইহাঁদের ভাষা এত সরল যে তাহা হিন্দীভাষী ও উর্দুভাষী উভয়েই বুঝিতে পারেন।

এক্ষণে উর্দুর যখন এই অবস্থা তখন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর অবস্থা কি? বর্ত্তমানের সাহিত্যিক হিন্দী একটা কৃত্রিম ভাষা, ইহার রূপ এখনও ঠিক হয় নাই। সাকসেনা মহোদয় বর্ত্তমানের হিন্দীকে "High Hindi" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (পৃঃ ২)। তিনি বলেন, ইহা উর্দু ভাষা সম্ভূত, উর্দু হইতে ফার্শী শব্দ সমূহ বিতাড়িত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করিয়া এই ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি করা হইতেছে। পুনঃ, ইহাও রাজনীতিক সাম্প্রদায়ীক আবর্ত্তে পড়িয়া অসম্ভব ভাবে সংস্কৃত শব্দসমূহ দ্বারা ভারাক্রান্ত হইতেছে। এক কথায়, খড়িবোলীর ইরাণী পোষাক ছাড়াইয়া ধুতি পরিধান করাইয়া তাহাকে আজকালকার "হিন্দী" ভাষারূপে খাড়া করা হইয়াছে। লেখক এই বিষয়ে ঠাট্টা করিয়া বলেন, বিদ্যাসাগরী বাংলা আর উর্দুর সংমিশ্রণে বর্ত্তমানের "হিন্দী"র উদ্ভব হইয়া একদল Chauvinist দ্বারা ইহাকে 'রাষ্ট্রভাষা' করিবার দাবী করা হইতেছে। তবে এই কথা আমাদের জ্ঞাতব্য যে উর্দু-হিন্দী-হিন্দুস্থানী যে রাজনীতিক আবর্ত্তেই ঘূর্ণায়মান হউক না কেন, আসলে ইহা প্রাচীন কুরু-পাঞ্চালের ভাষার বংশধর।

এক্ষণে, আমাদের এই রেখতা বা উর্দু সাহিত্যে প্রগতির অনুসরণ করা যাক। খস্রোর দুই একটী সুফী ভাবপূর্ণ গজলে আমরা প্রগতির কোন চিহ্ন পাই না। উর্দু সাহিত্যের আলোচনা করিতে গেলে এই সাহিত্যের পিতামহ ওয়ালী হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। অবশ্য, মধ্যযুগে দক্ষিণে যাঁহারা 'দখিনী' ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন তাহা এক্ষণে আবিষ্কৃত হইতেছে, কিন্তু উর্দু সাহিত্যে দখিনী প্রভাব ওয়ালী হইতেই আরম্ভ হয়। তাঁহার একটি গজলের নমুনা:

ওয়ালী "লিয়া হ্যায় সব সেঁ৷ মোহননে তরিকা খুদনুমাইকা।
চড়হা হ্যায় আরসীপর তবসে রঙ্গ হৈরত ফজাইকা।"

ওয়ালী কেবল কতকগুলি প্রেমের গান গাহিয়াছেন। তাহাতে সাময়িক

বাতাবরণের কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। এই সময়ে মহম্মদ সাহ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই শেষে মোগল সম্রাট। তাঁহাকে "রঙ্গীলা বাদশাহ" বলা হইত। তাঁহার দরবারে আমোদ প্রমোদের তরঙ্গ বহিতেছিল, ওয়ালী সেই বাতাবরণেরই কবি। তাহারই প্রতিধ্বনি তাঁহার কবিতাতে পাওয়া যায়। মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে কি ভীষণ কাল আসিতেছে, তাহার সময়ের সাহিত্যে তাহা প্রকাশ পায় নাই। তারপরই, মহম্মদ সাহের সময়ে বজ্রাঘাতের ন্যায় নাদির সাহের সৈন্যদল দিল্লী রক্তাপ্লুত করিয়া চলিয়া গেল। সেই দৃশ্যের নজীর আমরা সৈনিক-কবি নাজীতে পাই। তিনি মোগল সৈন্যদের দুর্গতির কথা নিম্নলিখিত কবিতায় ব্যক্ত করেছেন :

"লড়ে হুয়ে তো বরস বিস উনকো বীতে যো।

*　　　*　　　*

নাজী　　সরাবেঁ ঘরকী নিকালী মজেসে পীতেথে।

*　　　*　　　*

কজা সে বচ গয়া মরনা নহীতো ঠাণা থা।

*　　　*　　　*

ন পাণী পীনেকো পায়া বহাঁ ন খানা থা।
মিলে যে ধান যো লস্কর তমাম ছানা থা"।

তৎকালের হিন্দু ও মুসলমানেরা অঙ্গাঙ্গি ভাবে বাস করিতেন তাহার প্রমাণ আমরা নাজীর আর একটী গজলে পাই :

"বজীকা রাগিনীকে সুর যেঁ জাহিদ কুফ্র উহ মতপড়।
নহী তসবীহ তেরে হাথ মেঁ য়হ রাগমাল হৈঁ"।

ওয়ালীর ভাষার নকল করিয়া নাজীর সঙ্গে, হাতিম (খৃঃ ১৬৯৯-১৭৯২), খাঁআরজু (১৬৪৯-১৭৫৬), মজমুন, আব্রু প্রভৃতির উদয় হয়। ইহাঁরা কিন্তু দেশজ ভাষার শব্দগুলি তাঁহাদের কবিতা থেকে বহিষ্কৃত করিয়া ফার্শী অলঙ্কার ও কল্পনা তাহার মধ্যে আমদানী করেন। দক্ষিনী কবিদের অপেক্ষা ইহাঁদের লেখায় ইহা বেশী দৃষ্ট হয়। হিন্দী দোহারার চিহ্ন ইহাঁদের কবিতায় প্রকাশ পায়।

উত্তর ভারতের ভূমিতে আকবর প্রসূত সম্মিলনের ভাব তখনও কার্য্য করিতেছে। তাই আমরা হাতিমে নিম্নলিখিত কবিতাটি পাই:

হাতিম "হর স্থবে উঠ বুতোঁসে মুঝে রাম রামহৈ।
জাহিদ তেরী নমাজ কো মেরা সলামহৈ"॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে আমরা ইকরঙ্গ নামক কবির উদয় দেখি। ইনি উর্দ্দু বা রেখতা এবং হিন্দী উভয় ভাষাতেই কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। শুনা যায় তাঁহার হিন্দী গানগুলি এখনও দিল্লীর বাইজীরা গাহিয়া থাকেন। ইনি বলিতেছেন:

ইকরঙ্গ "রৌণকে ইসলাম তেরে রু সেহৈ।
কুফ্র কা রিস্তা তেরে গেসুসে হৈ"।

অর্থাৎ ইসলামের জ্যোতি তোমার মুখে, আর কাফেরের ধর্ম্ম তোমার জুলফির কোঁকড়া চুল! ইহার অর্থ, উভয় ধর্ম্মই তোমাতে বিদ্যমান।

তৎপর আসেন ফুঁগা। ইনি ভাগ্যান্বেষণের জন্য কিছুদিন আজমগড়ের রাজার কাছে ছিলেন। ফুঁগা বলেন;

ফুঁগা "আয় সেখ! আগর কুফ্র সে ইসলাম জুদা হোতা।
পস চাহিয়ে তসবিহমেঁ জুন্নার নহোতা"।

এই প্রকারে আকবরের পত্তন করা জমিতে রেখতা ভাষার যে অদৃষ্ট হউক না কেন, সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের কোন আভাস সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। তৎকালের সামাজিক মনস্তত্ত্ব এই সব গজলে প্রকাশ পায়। ইকরঙ্গই হিন্দীতে গাহিয়াছিলেন।

"নিশিদিন যো হরিকাগুণ গায়েরে,
বিগড়ী বাত বাকী সব বন জায়েরে"!

এইজন্য এই সব কবিতাকে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল বলিতে হইবে।

ইহার পর, মজহর ও তাঁবা, সোজ, দরদ, সৌদা প্রভৃতি বড় কবিদের আবির্ভাব হয়। ইঁহারা সকলেই পারসীক ভাষাতে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা দেশজ শব্দগুলিকে কর্কশ, পুরাতন বলিয়া নিন্দা করিতেন, এবং পারসীক ভাষার

কল্পনা, বুলবুল, গুল, কুমু, সমসদ বৃক্ষের বর্ণনা তাঁহাদের কবিতার মধ্যে প্রবেশ করান।

মজহর "হরম বেশ ছোড় রহঁ কেঁ ন বুতকদে মেঁ সেখ।
কিয়াঁ হর এককো উহ মর্তবা খুদাইকা"।

সৌদা "নরকশ অনীও সীনম আলম কা ছান মারা।
মিজগাঁনে তেরে পিয়ারে অর্জুন কা বান মারা"।

এই সময়ে মোগল রাজত্ব ভাঙ্গিয়াছে, মুসলমান শাসনের পতনের পর লোকেরও মন চঞ্চল হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আফগানেরা কয়েক বার দিল্লী লুণ্ঠন করিয়াছে, মহারাষ্ট্রীয়েরা বেশীর ভাগ ভারতে নিজেদের প্রভুত্ব-বিস্তার করিয়াছে বা শক্তি প্রকাশ করিতেছে। ভারত আর 'দার-উল-ইসলাম' নহে। আর অসঙ্কোচে মুসলমান গোঁড়ামী ও ধর্ম্মান্ধতা প্রকাশের সুবিধাও নাই। মহম্মদ সাহের সময় হইতে শেষ বাহাদুর সাহের সময় পর্য্যন্ত দিল্লীর দরবারে হা-হুতাস রব প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কবিরা ভাগ্যান্বেষণে দিল্লী ত্যাগ করিয়া হয় লক্ষ্ণৌ, না হয় আজমগড়, না হয় মুর্সিদাবাদ, না হয় হাইদারাবাদ গমন করিতেছেন। সর্ব্বত্রই 'হায়, হায়' শব্দ। এই সময়ে মুসলমানের মনস্তত্ত্ব কি ছিল তাহা সাহিত্যেই প্রকাশ পায়। অনেকেই সুফী ধর্ম্মের অতীন্দ্রিয়-বাদে (Mysticism) আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদল, তৎকালীন বাদসাহ, নবাবদের মন যোগাইবার জন্য নিম্নরুচির কবিতাসমূহ রচনা করিতে থাকেন। ইহাতে সুন্দর তরুণ, তাহার মুখ, জুল্‌ফ, গালের আঁচিল, সুন্দরীর ভ্রূ, কোমর প্রভৃতির বর্ণনা থাকে। বস্তুতঃ এই পতনের যুগের উর্দু সাহিত্য কেবল বুলবুল, গুল, চমন, গুলবদন, জনগদা (গালের আঁচিল), জুল্‌ফ, কোমর প্রভৃতির বর্ণনাতেই ভরপুর। 'বেকসে বুলবুল চমসমে মস্ত হ্যায় কুএইয়ার মেঁ' (একাকী বুলবুল বাগানে কামোন্মত্ত হয়ে আছে) ইহাই সব কবিদের প্রতিপাদ্য ছিল। যাঁহাদের মাতৃভাষা উর্দু নয় তাঁহাদের কাছে শুনা যায় যে, উর্দু সাহিত্যে কেবল Joy and pleasure of life (আনন্দ ও জীবনের সুখের কথা) আছে। এই আদিরসপূর্ণ কুরুচির পরিচায়ক কবিতাগুলি

একটী জাতির সমৃদ্ধির পরিচায়ক না পতনের ফলে মস্তিষ্কের বিকৃতির পরিচায়ক ?

অধ্যাপক মাহাফি বলেন, হিন্দুর পতন কালে সে ধর্ম্ম আঁকড়াইয়া নিজেকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু গ্রীক তাহার পতন কালে সেই বিষয়ে অপারগ-ছিল। (ধর্ম্মনামে বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান তাহার সমাজে বিবর্ত্তিত হয় নাই) বলিয়াই সে পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিজের পৃথক অস্তিত্বের বিসর্জ্জন দেয়। ভারতের মুসলমান তাহার পতন কালে হয় ধর্ম্মান্ধতা ও কুসংস্কার আঁকড়াইয়া থাকে, না হয় নাস্তিক হইয়া ইন্দ্রিয় ভোগের গল্পে নিমজ্জিত হয়। এই জন্যই erotic poems উর্দু সাহিত্যে এত প্রবল! হিন্দুর পতন কালে, সে ব্রজভাষায় ও গৌড়ীয় ভাষায় তাহার মর্ম্মবেদনা রাধার বিরহে ব্যক্ত করিয়াছে। তাহার হা-হুতাস রাধার মাথুরের বিরহে ঘনীভূত হইয়াছে। তাহার জীবনের সমস্ত হাহাকার রব একটী নায়িকার বিরহ বেদনাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া পরিব্যক্ত হইয়াছে; এইসব ভাব ধর্ম্মের আকারে অভিব্যক্ত। কিন্তু মুসলমান তাহার হৃদয়ের হাহাকার নানা আদিরস ও অন্যান্য কবিতা দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছে। তাহার মনোবেদনা একস্থলে কেন্দ্রীভূত হইয়া পরিব্যক্ত হয় নাই। ধর্ম্ম বিষয়ে ঠাট্টা, গোঁড়াদের উপর বিদ্রূপ, বিকৃত রুচি দ্বারা মনকে ভুলাইবার চেষ্টা, শেষে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া নিয়া ব্রিটিশ অধীনেই ভারত 'দার-উল-ইসলাম', এবং বর্ত্তমানের 'পাকীস্থান' পরিকল্পনা একই হাহাকার-মনস্তত্ত্বের বিভিন্নরূপ। এই প্রকারের সাহিত্য সম্বন্ধে নবাবদের মনস্তুষ্টির জন্যই কুরুচিপূর্ণ কবিতা লেখা হইত, আর পারসীক সাহিত্য হইতে Homo-sexual ভাব আনয়ন করা হয়—সমালোচকেরা ইহা বলিয়াই খালাস! কিন্তু পারস্যের সাহিত্য একটী গোলামের জাতিদ্বারা সৃষ্ট, এই জাতি আলেক-জাণ্ডারের সময় হইতে বিদেশী দ্বারা পরাজিত, বিপর্য্যস্ত এবং নিজের ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিসর্জ্জন দিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। অন্য দিকে, কুরুচিপূর্ণ প্রেমের কবিতা এবং সুফী অতীন্দ্রিয়বাদে নিজেকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রাণের মনো-বেদনা গোপন করিয়াছে। বস্তুতঃ ঐতিহাসিকেরা বলেন, মঙ্গোলদের ভীষণ

নরহত্যাও প্লাবনের পরই পারস্যে সুফী অতীন্দ্রিয়বাদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় (Arnold—Preaching of Islam দ্রষ্টব্য)। ভারতের মুসলমানরা এই গোলাম জাতির সাহিত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভাল করেন নাই এবং উচ্চতর ভাবও সাহিত্যে আনয়ন করিতে পারেন নাই। কিন্তু কেন এই প্রকার হইয়াছিল তাহাই অনুসন্ধানের বস্তু। বিজিত, বিপর্য্যস্ত ও পতিত উত্তরের মুসলমানের অবিদিত মনের পশ্চাতে কি মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা সমূহ লুকাইত ছিল যদ্বারা এই হাহাকার রব সাহিত্যে প্রকাশ পায় তাহা সাহিত্যেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই প্রকার সাহিত্যের প্রমাণ আমরা সৌদাতে পাই :

সৌদা : "হিন্দু হৈঁ বুতপরস্ত, মুসলমান খুদা-পরস্ত।
পুজুঁ মৈঁ উস কিসিকো জো হো আশানা-পরস্ত"॥

ইনি প্রেমের পূজারী হন। পুনঃ, ইনি বলিতেছেন :

"গর হো শরাব খিলবতো মাশকে খুবরু।
জাহিদ তুঝে কসম হৈ জো তুহো তো কেয়া করে"॥

এই স্থলে নিষ্ঠাবানকে ঠাট্টা করা হইতেছে।

এই দলের পর, 'মীর' মহম্মদ তকী আবির্ভূত হন। ইনি বলেন :

মীর : "পয়ম্বর হৈ, শাহ হৈ, কি দরবেশ হৈ।
সভোঁকী য়হি রাহ দরপেশ হৈ"॥

ইনি বলেন, পয়গম্বর, বাদসাহ আর দরবেশ, সকলেরই শেষে এক গতি। ইহা উচ্চ ধরনের কথা হইতে পারে বটে, কিন্তু গোঁড়ারা একথা স্বীকার করিবেন না। ইহা defeatist mentality-রই পরিচয় প্রদান করে। পুনঃ, আর একটী কবিতায় ইনি গোঁড়াদের কটাক্ষপাত করিয়াছেন :

"বুদপরস্তীকা তোই সলাম নহীঁ কহতে হৈঁ।
মাতবিদ কৌন হৈ 'মীর' এই সি মুসলমানী কা"।

পুনঃ, সৌজ বলিতেছেন :

সৌজ : "বুলবুল কহীঁন জাইয়ো জনহার দেখনা।
আপনে হী বন মেঁ ফূলেগী গুলজার দেখনা॥

নাজুক হৈ দিল ন ঠেস লগানা উসে কহীঁ।
গমসে ভরা হৈ ইয়ে মেরে গমখ্বার দেখনা" ॥

ইনি বুলবুলকে ফুলবাগান দেখিতে বলিতেছেন এবং তাহাকে নিজের মনোবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন। এই সময়ের দর্দ্দ নামক কবিতে আমরা সুফীমতবাদ স্পষ্ট পাই। দর্দ্দ বলিতেছেন :

দর্দ : "বুতখানা বরহমানকা মুকরর দেখা।
কাবাকোভী শেখকো মৈঁ অকসর দেখা॥
দিল লাগানেকি সুরত ন কহীঁ দেখ হায়।
জো কুছ দেখা সো খাক পাথর দেখা" ॥

ইহাঁদের দলের পর, আনার, হাসান, জুঅরত, ইনসাউল্লা প্রভৃতির উদয় হয়। ইহাঁদের দ্বারা হিন্দী শব্দ বিতাড়ন চলিতে থাকে। ইহাঁরা বলেন (১) এতদ্বারা ভাষাকে পরিমার্জ্জিত এবং দানাবদ্ধ করা হয় (refinement and crystallization) ইহাঁদের কবিতায় তৎকালের সময় এবং দিল্লীর কলুষিত সমাজ প্রতিবিম্বিত হয়। শারীরিক সৌন্দর্য্য বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়। জুঅরত, রঙ্গীন প্রভৃতি কবিরা নিম্নতর ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয় প্রকাশ্য ভাবেই গাহিতে থাকেন। জুঅরত আস্থক (প্রেমাস্পদ) ও মাস্থকের (প্রেমী) ব্যাপার বেশ ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জঅরত গাহিতেছেন :

জুঅরত "বুলবুল শুনে না কেঁও কফসমেঁ চমনকী বাত।
আবরএ বতন কো লগে খুশবতনকী বাত॥
সরদিজে রাহে ইশকমে পর মুঁহ ন মোড়িয়ে।
পথর কীসী লকির হৈ যহ কোহকনকী বাত" ॥

ইনি খাঁচায় বদ্ধ বুলবুলকে রাস্তায় প্রেমের সহিত শির প্রদান করিতে বলিতেছেন।

(১) R. Saxsena পৃঃ ১৫

ইনসাউল্লা বলিতেছেন :

ইনসাউল্লা "খেয়াল কিজিয়ে কেয়া আজ কাম মৈঁনে কিয়া।
জব উননে দো মুঝে গালী সলাম মৈনেঁ কিয়া ॥
জুহুঁ য়হ আপকী দৌলত হুয়া নসীব মুঝে।
কি নংগী নামকো ছোড়া য়ঁ নাম মৈনেঁ কিয়া" ॥

ইনি বলিতেছেন, উন্মত্ততারূপ দৌলতই তাঁহার কপালে হইয়াছে।

ইত্যবসরে লক্ষ্ণৌতে একটি কবির দল উদিত হন। ইহাঁদের মধ্যে নাসিখ ও আতিস প্রসিদ্ধ হন। ইহাঁরা উর্দুভাষা হইতে বাকী হিন্দী শব্দগুলি বিতাড়িত করিয়া বিদেশ জাত শব্দের আমদানী করেন। ইহাঁদের ভাষায় লক্ষ্ণৌর কুরুচি প্রতিবিম্বিত হয়।

নাসিখ বলিতেছেন :

নাসিখ "বায়জা মসজিদ সে অব জাতে হৈঁ মৈখানেকো হম।
ফেঁককর জর্ফে বজুলেতে হৈঁ পৈমানে কোহম ॥

*　　　*　　　*

বোসএ খালে জনখদাঁ সে শফা-হোগী হমেঁ।
ক্যায়া করেঙ্গে এই তবীব বসতেরে বুহদানে কো হম" ॥

পুনঃ, ইনি গাহিতেছেন :

"তেরেজ্যতে হী হয়া রঙ্গে চমনহো জায়না।
নর্গগুল জোহৈ উয়ো বর্গে আসমান হো জায়না ॥
বামপর নর্গেনা আও তুম শবে মহতাবমেঁ।
চাঁদনী পড় জায়গী মৈলা বদন হো জায় গা" ॥

আবার, আতিস গাহিতেছেন :

আতিস "জামে সরাবে ইস্কমে দোনোঁ হৈঁ বেখবর।
বুলবুল চমনমেঁ মস্ত হৈ কুএ ইয়ারমেঁ" ॥

এইসব কবিতায় erotic expressions চূড়ান্ত রূপেই বর্ণিত হইয়াছে।

এইসব কবিতা তৎকালের সমাজের পতন এবং কুরুচিরই পরিচায়ক। এই গুলিতে আমরা কোন প্রগতির সন্ধান পাই না।

এই লক্ষ্ণৌ সাহিত্যে (মরসিয়া) কবিতার উদ্ভব হয়। ইহা ইমাম হাসেন ও হোসেনের মৃত্যু স্মরণার্থ শোক সূচক গীতি। ইহা খৃষ্টানদের Passion plays ন্যায়। লক্ষ্ণৌর নবাবেরা সিয়া ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া, সেই ধর্ম্মগত মরসিয়ার ছাপ তদানীন্তনের সাহিত্যে বিবর্ত্তিত হয়। এই সময়ের লক্ষ্ণৌতে অনীশ ছিলেন বড় কবি। তিনি বালক, স্ত্রী, পুরুষ, যোদ্ধা, রাগ, প্রেমী এবং সেবকাদি সর্ব্বপ্রকারের মানুষের মনোভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অনীশ:

"দিল সে তাকত বদন সে কস জাতা হৈ।
আতানহীঁ ফির করজো নফস জাতা হৈ॥
জব সাল গিরাহ হুই তো উকদ ইয়খুলা।
যা ঔর গিরহ সে যক বরস জাতা হৈ" ॥

অনীশ অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল বলিয়া গণ্য হইবেন।

আর একটী গজলে জগতের ব্যবহার বর্ণনা করিয়াছেন:

"গর জিস্তমে ফাকাহো তো গম কোই না খায়।
আউর ওয়াক্ত-ই-মুসিবত মেঁ কোই পাশ না আয়ে॥
ইউঁ পিয়াস মেঁ লাকর কোই পাণি না পিলায়ে।
আউর বাদ-ই-ফণা, ফতিহা সরবৎ পা দিলায়ে" ॥

এই সময়ে লক্ষ্ণৌতে দয়া শঙ্কর কৌল "নাসীম" নাম গ্রহণ করিয়া একজন হিন্দু বড় কবি হন। ইহাঁর "গুলজার-ই-নাসিম" আজও আদৃত হইতেছে। ইনি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ছিলেন, নবাবের কমিসেরিয়েট বিভাগে কর্ম্ম করিতেন।

মানুষ ইহ জগতে যাহা চাহে তাহা সবই ইনি পাইয়াছিলেন। তত্রাচ সময়ের হাওয়ার প্রভাবে ইঁহার কবিতাতেও বুতের প্রতি অনুরক্তি ও নৈরাশ্যের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। একটি কবিতায় ইনি বলিতেছেন:

"বুতোঁকো জো দেখা গুনাহা হামারা।
খুদাই খোদাকী তামাসা হামারা॥

বুতোঁকী গলী ছোড়কর কৌন জায়ে।

য়হী সে হৈ কাবে কো সিজদা হামারা"।

এই কবিতায় 'বুত' শব্দ তিনি দেবপ্রতিমা এবং প্রেমাস্পদ এই দুই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। শেষে কাবাকে নমস্কার করিয়া অন্য ধর্ম্মের প্রতি হিন্দুর শ্রদ্ধার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। আর একটি গজলে নিজের মনোবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কথিত হয় ঐ গজলটি একবার একটী বাইজী নবাব আসফকদ্দৌলার নিকট গাহিতেছিল।

নাসিম: "জব ন জীতে জী মেরে কাম আয়গা।

[(মতলা)-বাঙ্গলা অন্তরা]

ক্যায়' দুনিয়া আকিবত বথসায়গী॥

* * *

জান নিকাল জায়গী তনসৈ ইয়ে নসীম'।

গুল কো বুএ গুল হাওয়া বাতলাএগী"॥

[(মকতা)-অস্থায়ী]

নবাব সমজদার ব্যক্তি ছিলেন, শেষের দু'চরণের মধ্যে যে পরিবেদনার খোঁচা লুক্কায়িত ছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। সভাসদদের জিজ্ঞাসা করেন, এ কোন নাসীম? এ কি গুলজারে নাসিম? জবাব প্রদত্ত হইল, হাঁ। তিনি সভাসৎদের হুকুম দিলেন, যেমন করিয়া পার, ইহাকে আমার নিকট হাজির কর। তখন তিনি প্রত্যুত্তর পাইলেন—সে অনেকদিন মরিয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই নৈরাশ্য (Pessimism)-এর ভাব নাসীমের কোথা হইতে আসিল? ইহা কি ব্যক্তিগত বা হিন্দুর জাতিগত? জগতে তাঁহার কোন অভাব ছিল না। অনুমান হয় ইহা "নকল" (Imitation) রূপ সমাজতাত্ত্বিক ধারা ধরিয়া প্রকাশ পায়। তৎকালের মুসলমানের Pessimism ছিল স্বাভাবিক। বুত, গুল প্রভৃতির অনুকরণের সহিত ইহা তাঁহার মধ্যে আসিয়াছিল। যে সব হিন্দু উর্দুতে কবি হইয়াছেন, তাঁহারা মুসলমান কবিদের হুবহু নকল করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর দিল্লীতে এক বড় কবির দল উত্থিত হয়; ইঁহাদের মধ্যে নাসীর, জৌক, গালীব, মোমীন এবং জাফর ছিলেন। শেষোক্ত নামটি শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের তখল্লুস (non-de-plume)। ইহারা উর্দু হইতে বাকী দেশজ শব্দ সমূহ বহিষ্কৃত করিতে লাগিলেন। গালীব ও মোমীন বিদেশী শব্দ সমূহ অতি ক্ষতিজনকরূপে উর্দুতে আমদানী করেন। ইহাদের কবিতায় মৌলিকত্ব আছে। কিন্তু ফার্শি শব্দ প্রণালী উর্দুতে ব্যবহার করিয়া তাহা এত কঠিন করিয়া তুলিলেন যে গালীব আজও সহজ বোধ্য নয়।

ইহাদের মধ্যে নাজীর সুফী, তজ্জন্য পূর্ণমাত্রায় বেদান্তী ছিলেন। তিনি, হিন্দীতে অনেক ধর্ম্মবিষয়ক কবিতা লিখিয়া যান। কথিত হয়, তাঁহার মৃত্যুর পর, গোঁড়ারা তাঁহার শব সমাহিত করিতে যায় নাই। ইনি বিশেষ ভাবে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। ইনি জনতার কবি ছিলেন, ইনি কোন বাদসা বা রাজার প্রশংসা করিয়া এক পংক্তিও কবিতা লিখেন নাই।

নাজীর বলিতেছেন :

নাজীর : "ঝগড়া না করে মিল্লতে মজহব কা কোই য়াঁ।
জিস রাহমেঁ জো আন পড়ে খুস রহে হরআঁ।
জুন্নার গলে য়া কি বগলবীচহো কুরআঁ।
আশিক তো কলন্দার হৈঁ ন হিন্দু ন মুসলমাঁ" ॥

ইনি তৎকালের প্রগতিশীল কবি ছিলেন।

আর একজন বড় কবি ছিলেন জৌক।

জৌক বলিতেছেন :

জৌক : "বীমার ইস্কৰা জো ন তুঝসে হুয়া ইলাজ।
কহ এ তবীব তুহী কি ফির তেরা কেয়া ইলাজ।
রেশা সফেদ শেখে মেঁ হৈঁ জুল্মতে ফরেব।
ইস মক্র চাঁদনী পৈ ন করনা গুমানে সুবহ" ॥

ইহার কবিতার মধ্যে একটা cynicism এর ভাব আছে। ইনিও

প্রেমের কাহিনী গাহিয়াছেন। ইঁহাকে প্রগতিশীল কবি বলিয়া গণ্য করা যায় না।

এই দলের মোমীন একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন। ইনি প্রেম বিষয়েই লিখিয়া গিয়াছেন।

মোমীন বলেন:

মোমীন: "জাঁয়ে ওয়াশত মেঁ স্থএ সহরাকেঁ
কম নহী অপনে ঘরকী বীরানী॥
মৈ উহ সময়ায়ে বলাগত হুঁ।
জিসকে দরকা গদা হৈ খাকানী"॥

ইনি প্রগতিশীল কবি ছিলেন না।

এই দলের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন গালীব। ইনি উর্দু কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। (১৭৯৬-১৮৬৯)। ইঁহার ভাষা এত ফার্শীতে ভরপুর যে, অনেকের কাছে তাহা সহজবোধ্য হয় না। ইনি জীবন এবং তাহার বিভিন্ন স্তরের বিষয় লিখিয়াছেন। কাব্য অলঙ্কারের সর্ব্বলক্ষণই ইঁহার কবিতার মধ্যে আছে। ইনি একজন অতীন্দ্রিয়বাদী এবং সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতার উর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন। ইনি প্রাচীন পারস্যের জনশ্রুতির রাজা ফরিদূনের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন এবং মোগল বাদসাহ বংশেরও সহিত সম্বন্ধ ছিল। এই জন্য সিপাহী বিদ্রোহের পর, তাঁহার উপর গভর্ণমেন্টের নজর পড়ে, তাঁহাকে অনেক কষ্টভোগ করিতে হয়। এই জন্য তাঁহার কবিতাতে দুঃখ ও অশ্রুজলের সম্মানের উপদেশ আছে। তাঁহার কবিতার বিয়োগান্ত ভাব ও অন্ধকারের মধ্যে কখন কখন আশার আলোকপাত হইয়াছে

গালী বলিতেছেন:

গালী "দে মুঝকো শিকায়তকী ইজাজতকি সিতমগার।
কুছ তুঝকো মজা ভী মেরে আজার মে আওয়ে"॥

ইহার অর্থ—হে অত্যাচারী! আমাকে নালিশ করিবার অধিকার দাও। তোমার মজার কিয়দংশও আমার কষ্টে আসিবে!

পুনঃ, গালীব একস্থানে বলিতেছেন ঃ

"বুলবুল কো কারওয়ায়ীপর পয়দাই খন্দয়ায়ে গুল।
ইস্ক যিসকা কহতা হ্যায় খলল হ্যায় দেমাককা"।

ইহার অর্থ বুলবুলের বিষ্ঠার উপর গোলাপ ফুলের জড় গজায়। যাহাকে প্রেম বলা হয় তাহা মাথার পাগলামী মাত্র! ইহাতে Cynicismই প্রকাশ পাইয়াছে। 'দীবান-ই-গালীব' নামক পুস্তকের একস্থানে ইনি বলিতেছেন,

"দরদ সে মেরে হ্যায় তুঝকে বেকরারী হায় হায়।
কিয়া হুয়ি জালিম তেরে গফলত সা'রী হায় হায়"॥

তৎকালের বাতাবরণ গালীবে সম্পূর্ণভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। কিন্তু তিনিই প্রথম উর্দু সাহিত্য থেকে পারস্যের বোস্তান ও বুলবুলকে নির্ব্বাসিত করেন। এই বিষয়ে তিনি প্রগতিশীল ছিলেন।

গালীবের জীবদ্দশাতেই 'সিপাহী-বিদ্রোহ' হয় এবং ইহার প্রতিকল্পে যে অশনি ও ঝঞ্ঝাবাত উত্তর-ভারতে মুসলমান সমাজের উপর পড়ে তাহাতে তৈমুর বংশ প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি সৌধের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। মুসলমান-উত্তর ভারতে হাহাকার পড়িয়া যায়। এই সময়কার কবি ছিলেন—দাঘ। ইনি বাদসাহের সংসারে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, এই জন্য এই বিপ্লব তাঁহাকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছিল। ইনি অনেকগুলি কবিতা পুস্তক রচনা করিয়া যান, সেগুলি হতাশ প্রেমেরই কথা ব্যক্ত করিয়াছে। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার গভর্ণমেন্টের কাছে আর্জি করিবার জন্য ইনি একবার কলিকাতায় আসেন। প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে এক বাইজীর সহিত ট্রেনে আলাপ হয়। পরে, তাঁহার 'মসনবী' এই প্রেমীকার উদ্দেশ্যেই লিখিত হয়। 'মসনবী'তে সর্ব্ব প্রথম দাঘ বলিতেছেন ঃ

দাঘ ঃ "আল্লা রহে মরতবা মেরে আজিজ উও নিয়াজ কা
গোয়া জোয়াব হ্যায় ইয়ে তেরী কিবরত নাজকা॥

*   *   *   *

আয় দাঘ কিস আফতমেঁ হুঁ কুছ বন নেহী আতি।
উও চিমতী হ্যায় মুঝসে যুদা দিল নেহী হোতা'' ॥

পুনঃ, ইনি একটী "দীবান" ও লিখেন।"

"বরঙ্গ বুই গুলহৈ হর নফস্ ইয়াদ আলীমেঁ।
কিয়ামত তক ফিরেগী দম নসীম সিজদম মেরা ॥
সলামত মঞ্জিল মকস্থদ তক আল্লা পোঁচাওয়ে।
মুঝে আঁখিয়ে দেখাতা হ্যায় হরেক নকস বাদম মেরা" ॥

ইহাঁর একটী পুস্তকের নাম "গুলজ্জার দাঘ"। ইহার একস্থলে ইনি বলিতেছেন :

"দাঘ সাদ উও সরা ন দেখোগি।
গুল হজারোঁমে এক স্থরত হ্যায়" ॥

এই পুস্তকে নানা প্রকারের কবিতা সন্নিবেশিত আছে, তন্মধ্যে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় দিল্লীর পতন উপলক্ষে যে 'মরসিয়া' লিখেছেন তাহা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাতে তৎকালীন মুসলমানের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইয়াছে। এই শোকপূর্ণ কবিতার নাম "সহর আসুব" (ভীত নগর):

"ফলক জনাব উও মালায়েক জনাব গী দিল্লী।
বেহস্ত উও খুলদসেভী ইনতিখাবগী দিল্লী।
জোয়াবকা হী কো লাজোয়াব থা দিল্লী।
মগর খেয়ালসে দেখাতো খোয়াব থী দিল্লী।

*　　*　　*　　*

ইয়ে সহর উওথা কী ইনসান উও জানকা দিল থা।
ইয়ে সহর উও হ্যায় কী হরকদর দানকাদিল থা।
ইয়ে সহর উও হ্যায় কী হিন্দুস্থান কী দিল থা।
ইয়ে সহর উও হ্যায় কী সারে জহানকা দিল থা।

*　　*　　*　　*

জমীনকে হাল প অব আসমান রোতা হ্যায়।

হরেক ফরাক মকীন মেঁ মকান রোতা হ্যায়।

গদা উও শাহ, জৈফ উও নওজোয়ান রোতা হ্যায়"।

দাঘ রাজনীতিক বিয়োগান্ত নাটকের কবি, তাঁহার জীবনের tragedy তাঁহার বিভিন্ন কবিতার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই জন্য তাঁহাতে গঠনমূলক এবং প্রগতিশীল ধ্বনি উত্থিত হয় নাই। কিন্তু যে জমিতে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, আকবর দ্বারা কর্ষিতভূমির শেষ চিহ্ন তাহাতে ছিল, এইজন্য তিনি অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তিনি এক গজলের শেষাংশে বলিতেছেন:

"কিস লিয়ে আয় গাবরোঁ মুসলমানোঁ মুঝে এতনা তপাক।

কাবিলে মসজিদ ন হরগিজ, লায়েকে বুতখানা হু"।

ইহার অর্থ, কেন কাফেরের সঙ্গে আমার এত ভাব, কারণ মসজীদ যাইবার উপযুক্ত আমি নই, মন্দিরে (প্রেমাস্পদের) যাইবার উপযুক্ত।

সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের পর, একদল নূতন লেখক নূতন দৃষ্টি কোণ দ্বারা জগতের গতিকে দেখিবার জন্য উত্থিত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে সার সৈয়দ আহমেদ, অধ্যাপক আজাদ, গদ্যলেখক সরুর, কবি হালী, পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস লেখক অধ্যাপক সিবলী, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিতর্কযুক্ত প্রবন্ধাদি লেখক চেরাগ আলী, মোহসিন-উল মুল্ক, উপদেশযুক্ত গল্পলেখক নাজির আহমেদ, ইতিহাস লেখক জাকাউল্লা প্রভৃতির উদয় হয়। ইঁহারা গোঁড়ামীর ও সংরক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব উর্দুতে ইঁহারা বিস্তার করেন; এতদ্দ্বারা উর্দুসাহিত্য উদার হয় এবং নূতন প্রকারের গদ্যসাহিত্য উদ্ভূত হয়।

আজাদই প্রথমে উর্দুসাহিত্যের ইতিহাস (আবে হায়াৎ) লিখিয়াছিলেন। হালী স্বীয় কবিতাসমূহদ্বারা সৈয়দ আহমদের সংস্কারনীতি সমর্থন করেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল ও কাটমোল্লাদের কষাঘাত করিয়া কলম ধরেন; এই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের একতা এবং জাতীয়তাবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হালীর কবিতা রচনার মধ্যে 'রুবাইত', 'কাতাৎ', 'মুসদ্দস'

ও 'শিকোয়া' (বিক্ষোভ)। তাঁহার রুবাইতের একটী কবিতাতে তিনি বলিতেছেন—

হালী :—"হিন্দু সে লড়েঁ না গেবরসে বৈর করেঁ,
সোরসে বচেঁ আউর সোর কে আওয়াজ খৈর করেঁ।
জো কহতে হেঁ ইহ কি হ্যায় জহন্নম দুনিয়া,
উও আয়েঁ আউর উম বেহস্ত কি সৈর করেঁ" ॥

এই কবিতাতে আমরা প্রগতির আওয়াজই শ্রবণ করিতে পাই। কিন্তু স্বধর্ম্মীদের আচরণে নিজের মনের তিক্ততা নিম্নলিখিত কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন :

"জব এক কিহ নহো মুসলমান আখোয়া পক্কা,
হোতা নহি মোমিনকা অব ইমানপক্কা।
হম কৌম কি খৈব মাঙ্গতে হৈঁ হককে,
সুনতে হেঁ কিসি কো যব মুসলমান পাক্কা"।

বাহিরে 'মুসলমান বেরাদারান' বলা ও অন্তরে পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করার জন্য একজন ইরাণী কবিও বহুপূর্ব্বে নিম্নলিখিত চরণে স্বীয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, "মজ্দ গানী! কহ গুরবাহ সুদ জাহদ ওয়া মোমীন ওয়া মুসলমান"। (বড় খবর, যে বিড়াল তপস্বী এবং বিশ্বাসী ও মুসলমান হইয়াছে)! দেশ ও কালভেদে একবাতাবরণের মনস্তত্ত্ব পৃথক হয় না। হালীর মনের ও মতের প্রগতিশীলতার পরিচয় নিম্নলিখিত হইতে কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে :—

"হুর বেহুনরোঁ মেঁ কাবালিয়ত কে নিসান
পোসিদা হ্যায় ওয়াসিয়োঁমে আকসার,
আরি মেঁ লবাস তরবিয়ৎসে ওয়ারনা
হ্যায় তুসও রাজই নহি সকলোনমি নহাঁ"।

ইহার তাৎপর্য্য এই, কর্ম্ম করিবার শক্তি অশিক্ষিতের ভিতরও আছে, জঙ্গলী লোকের ভিতর মানুষ লুক্কাইত থাকে যদিচ সে শিক্ষার পোষাকে আচ্ছাদিত থাকে না; তাহা না হইলে তুস ও রাজের নাগরীকেরা (পুরাতন ইরাণের এই

দুই নগর সভ্যতার কেন্দ্র ছিল) এই প্রকার পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত থাকিত না। শিক্ষার প্রশংসায় তিনি বলিতেছেন:

"আয়ে ইলম কলিদি গুনজি সাদি তো হৈ।
সরচসমাহ ন'মা উও আয়াদিতো হৈ।
আসাইসি দো জহানহৈ সায়ি মেঁ তেরে
দুনিয়া কা ওয়াসিলাহ দীনকা" ॥

ইহার অর্থ, হে জ্ঞান, তুমিই সুখের ভাণ্ডারের চাবী, তুমিই সমস্ত ধনও সাহায্যের উৎপত্তি স্থল, তোমার ছায়াতেই দুই ভুবনের আনন্দ থাকে, তুমিই এই জগতের সম্পদ ও ধর্ম্ম প্রদর্শক।

রাজনীতি সম্বন্ধে পূর্ব্বেকার মুসলমানীয় প্রথার বিরুদ্ধে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন:

"দেখো জিস সলতানতকি হালত দরহম,
সমকো কি উহা হৈ বরকত কা কদম,
ইয়া তো কোই বেগমহৈ মুসিরে দৌলত,
ইয়াহৈ কোই মৌলিয়ী ওজিরে আজাম ॥"

ইহার অর্থ, যখন কোন রাজত্বকে ভাঙ্গিতে দেখিতেছ, তখন বুঝিবে যে উহাতে ভগবানের আশীর্ব্বাদ আবির্ভাব হইয়াছে, বা কোন বেগম পরিচালিকা হইয়াছেন বা কোন মৌলুবী প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন।

ইহাঁর 'কাতা'আট' নামক পুস্তকে একটী কবিতায় 'নেশন' কাহাকে বলে এই বিষয়ে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন:

"ইহ মানিহুয়ি জমহোর কি রায়,
উসিপর হ্যায় জহানকা ইতফাক অব,
কহ 'নেশন' উও জমাইয়ৎ হ্যায় কম অজকম,
জবান জিসকি হো এক আউর নসল উও মজহব,
মগর ওয়াসিত উসে বাজোঁনে দি হ্যায়,
নেহিজো রায়মে আপনে মহাবজাব,

উও 'নেশন' কহতে হেঁ উস ভিড় কোভি,
কহ জিসমেঁ উহদতি মফকুঁ হেঁ সব
জবান উসকে নহো মফৌম উ কো
হেঁ আদমতক জুদা সবকে জাদ উও আব
হো ওয়াহদ লা সে এক উসকা খদাহো,
তো লাখোঁ উসকে হুঁ মাবুদ আউর রব ॥"

ইহার অর্থ—ইহা সকলে গ্রহণ করিয়াছে যে, একটী 'নেশন' বলিলে একটী লোক সংঘকে বুঝায়। তাহার একটী সাধারণ ভাষা, উৎপত্তি এবং ধর্ম্ম আছে। কিন্তু 'অনেকে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া গোঁড়ামী করেন যে একটা "ভীড়" একটা নেশন যাহাদের মধ্যে সাধারণ বন্ধনের অভাব, ভাষার পার্থক্য আছে, এবং আদম পর্য্যন্ত যাহাদের পিতৃপুরুষের পার্থক্য আছে, এবং যদিও একজন একেশ্বর উপাসনা করে, আর একজন লক্ষদেবতা পূজা করে।

এইস্থলে তিনি নেশনের রাজনীতিক ব্যাখ্যার উপর ব্যঙ্গ করিয়া মূল জাতিগত এবং জাতিতত্ত্বগত একতার দ্বারা নেশনের উদ্ভব বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। এই তর্ক জগতের বহুকালের, কিন্তু তাঁহার এই ব্যাখ্যানুসারে কোন 'নেশন' সংগঠিত হয় নাই।

তাঁহার 'ইসলামের উত্থান ও পতন' (মুসদ্দস) নামক পুস্তকে ইসলামের কি প্রকার উত্থান হইল, তাহার উন্নতি কি প্রকারে হইল এবং শেষে ভারতের মুসলমানের তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি আরবদের খুব বাড়াইয়া চিত্রিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন এই সময়ে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। ভারত ও পারস্যের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"ইধর হিন্দমেঁ হরতরফ থা অন্ধেরা
ক থা গিয়ান গুনকা লডা ইয়াঁ সে ডেরা।
ন ভগবানকা গিয়ানকা ধিয়ান থা গিয়ানোঁমে
ন নিরয়ান পর সতি থি নিরওয়ানিয়োঁমে।" (পৃঃ২৯)

আর ইরাণ বিষয়ে বলিতেছেন :

"উধর থা আজমকো জহালতনে ঘেরা।"

ভারতবর্ষ বিষয়ে এই উক্তিতে কোন কোন হিন্দু আপত্তি করিয়া প্রতিবাদ স্বরূপ পুস্তক লিখিয়াছেন। যথা মুন্সী জগত কিশোর 'হুস্ন'। কিন্তু নিরপেক্ষ ইতিহাস কি ইহার সত্যতা সমর্থন করে না? কেন এক ঝড়েই এই দুই প্রাচীন দেশ পড়িয়া যায় তাহার কারণ অনুসন্ধান করা কি প্রয়োজনীয় নহে? এই পুস্তকের শেষে আক্ষেপ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"উও দীনে হজাজীকা বেবাক বেড়া।
নিশাঁ জিসকা অকসায়ে আলম মেঁ পহুঁচা॥
মজাহম হওয়া কোই খতরা ন জিসকা।
ন অম্মাঁমেঁ ঠিঠকা ন কুলজম মেঁ ঝিককা॥
কিয়ে হুয়ে সফর জিসনে সাতোঁ সমন্দর।
উহ ডুবা দহনে মেঁ গঙ্গাকে আকর॥"

ইহার অর্থ, ইসলামের নৌবাহিনী যাহার পতাকা সর্ব্বত্র উপনীত হইয়াছে, শেষে সাত সমুদ্র পার হইয়া গঙ্গার মুখে আসিয়া ডুবিয়া গেল! এই স্থলে কবি ভারতে ইসলামের অবস্থায় নৈরাশ্য প্রকাশ করেন।

এই সঙ্গে তাঁহার "সিকোয়া-ই-হিন্দ" (ভারত বিলাপ) উপরোক্ত পুস্তকের পরিপোষক (Complementary)। ইহাতে, তিনি ভারতে মুসলমানদের পূর্ব্বেকার সুখের অবস্থা এবং বর্ত্তমানের দুর্গতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিত কথাতেই এই পুস্তক আরম্ভ করিয়াছেন :

"রোখসত আয় হিন্দুস্তান! আয় বোস্তানে বিখজান,
রহ চলে তেরে বহতদিন হম বিদেশী মইমান,

* * *

স'ব বুয়াঁ উও সমরকণ্ড উও দমস্ক উও ইসফাহান,
ইয়াদ কুছ জিউ রহা হমকো ন দিজলাহ আউর ফরাত,
তেরি গঙ্গাজলনে জবসে তরকিই কামউও জবান,
তেরি কাসি কি কাসিস নে করদিই হমসে জুদা।"

এই স্থলে তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেছেন : "হে হিন্দুস্থান এখন বিদায়ের সময় আসিয়াছে, আমি বিদেশী অতিথি তোমার মধ্যে অনেক দিন থেকে ছিলাম; তোমার গঙ্গাজল আমার কার্য্য ও ভাষা ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছে, তোমার কাশীর পার্থক্য আমায় পৃথক করিয়া দিয়াছে। পুনরায় তিনি বলিতেছেন :

"কিস মুঁসে দিঁ ইলজাম হাম,
ফির গয়ি সরহদ সে তেরী ফৌজি ইউনান যিসতরা,
কাস ফিরযাতে ইউহিদরসে তেরী নাকাম হাম,
রহতে কানি আপনি মেহনত আউর মজদূরী সে কাস,
আকে ইয়া পাতে ন জৌকি রাহত উহ আরাম হাম।"

এই স্থলে তিনি পুনঃ বলিতেছেন, "কোন মুখে আমি দোষ দিই, যেমন গ্রীক সৈন্যদল তোমার সীমানা হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল, তেমনি আমরা যদি এই স্থল হইতে ফিরিয়া যাইতে পারিতাম! নিজের মেহনৎ মজুরী করিয়া দিন কাটাইতাম কিন্তু এই স্থলে আসিয়া পছন্দসই শান্তি পাইলাম না"।

এই দুই পুস্তকে তাঁহার defeatist mentalityর পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে তৎকালের শিক্ষিত মুসলমানের মনস্তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সময়ে তাঁহাদের মন নৈরাশ্য ও হাহাকারে পরিপূর্ণ তাই পূর্ব্ব স্মৃতি স্মরণ করিয়া এত তীব্র বেদনা মনে জাগ্রত হইয়াছে। এই পুস্তকে তিনি পূর্ব্বেকার মুসলমানদের জাঁকজমক, সামাজিক আড়ম্বরের কথা খুব উৎসাহের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সব ধুমধাম ও নবাবী চাল কি সাধারণ মুসলমানের ছিল? তাঁহাদের অবস্থার কথার কোন উল্লেখ এই সব মুসলমান লেখকদের কাছ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সামন্ততান্ত্রিক বাদসাহ, নবাব ও ওমরাহদের ঐশ্বর্য্য ভোগ সাধারণ ও শ্রমজীবী মুসলমানের ভাগ্যে কখন হয় নাই। সেই জন্য, জনকতকের ঐশ্বর্য্যের পূর্ব্ব স্মৃতি স্মরণ পূর্ব্বক "ইসলামের অধঃপতন হইয়াছে" বলিয়া অশ্রুপাত করা, সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক।

এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে এই দুই পুস্তকে তিনি ভারতীয়-মুসলমানদের অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছন। তিনি এবং নবোত্থিত

দল, বর্ত্তমানের শিক্ষাকে গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মুসলমান সমাজকে আরবের মরুভূমিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। আর বলিলেন, অতীতে মনিব ধার্ম্মিক ছিল এবং বর্ত্তমান যুগ হইতেছে পাপের যুগ। ইহার ফল একে "মনসা তায় ধুনা" হইল! সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের পর হইল একটি খাঁটি ভারতীয়-মুসলমানের দল, যাঁহারা সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে উত্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা আরবের অতীতকে আঁকড়াইবার জন্য স্বধর্ম্মীদের উপদেশ দিলেন। একেই ভারতীয় মুসলমানের স্বদেশপ্রীতি নাই—কাশীর বৈশিষ্ট তাহাকে পৃথক করে নাই, ইসলাম তাহার জাতিতাত্ত্বিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া তাহাকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে—তার পর, এই উপদেশ। যাঁহারা রক্তে খাঁটি ভারতীয়, তাঁহারা নিজেদের 'বিদেশী মইমান' বলিতে লাগিলেন। এই জন্যই ভারতের সঙ্গে দেশজ মুসলমানের নাড়ীর যোগসূত্র আজও স্থাপিত হইল না। ইহা কথিত হয় যে, বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তি স্টালিন একবার একটী প্রাচীন গ্রীক গল্পের উদাহরণ দিয়া তাঁহার স্বদলস্থ লোকদের বলিয়াছিলেন; "Those who are not rooted in the soil will die out" (যাহারা জমিতে শিকড়বদ্ধ নহে তাহারা শুকাইয়া মরিয়া যাইবে)। এই তথ্যই ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে খাটে, এই ব্যাপার লইয়াই ভারতীয় রাজনীতির যত গোলমাল।

পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া হিন্দুর মধ্যে সংস্কারকের দল উত্থিত হইয়া প্রাচীন হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই radicalism সর্ব্বজন দ্বারা গৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু সেই প্রচণ্ড আঘাত হিন্দু সমাজকে সচেতন করিয়া দেয়। স্বামী বিবেকানন্দই ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—Those electric shocks galvanized the sleeping Leviathan (Appeal to Young Bengal দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মুসলমান সমাজ পুনঃ জাগরণের প্রাকালে শুনিলেন যে, তাঁহারা বিদেশী এবং তাঁহাদের আদর্শ আরবজাত সভ্যতা! ইহার ফলও ভারতের পক্ষে বিষময় হয়। এই জন্য, হালীর এই দুই পুস্তক এবং এই দলের

মতকে আমরা প্রগতিশীল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। অবশ্য ভারত সম্বন্ধে হালী জাতীয়তাবাদী ছিলেন, একস্থলে তিনি বলিয়াছেন:

"রাম কে হামরাহ চড়ী রণমেঁ তু।
পাণ্ডবোঁকে সাথ ভিরী বনমেঁ তু॥
*   *   *
তু আগর চাহতে হো মুল্ককী খৈর।
ন কিসী হম ওয়াতন কো সমঝো গৈর॥"

ইহার অর্থ

হে মুসলমান! তুমি রামের সঙ্গে তাহার লড়াইয়ে সহযোগী ছিলে, তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে বনে বনে ফিরিয়াছিলে, তুমি যদি দেশের ভাল চাহ তাহা হইলে স্বদেশবাসীর মন্দ চাহিও না।

এই স্থলে তিনি আবার প্রগতিশীল হইয়াছেন।

এই সময়ে উর্দুতে গদ্য পুস্তকও লিখিত হয়, ইহার পূর্ব্বেই ওয়াজিদ আলীসার সময়ে আমানতের (খৃঃ ১৮১৫-১৮৫৮) "ইন্দ্রর সভা" নামে একটী নাটক লিখিত হয়। ইহাতে স্বর্গে ইন্দ্রের সভাতে পরীদের নৃত্যগীত প্রভৃতির কথাই আছে। ইহা একটী বাদসাহ বা নবাবের দরবারের প্রতিচ্ছবি মাত্র। কিন্তু হিন্দুর "ইন্দ্র" নাম ইহাতে থাকায় অনেকে ভুল বুঝেন; হিন্দি সাহিত্যিক ভারতেন্দু ইহার পাল্টা জবাব দিবার জন্য "বান্দর সভা" নামে এক পুস্তক লেখেন! (লেখকের কোন মুসলমান বন্ধু একবার বলিয়াছিলেন, তিনি হিন্দুদের ধর্ম্ম বিষয়ে পুস্তকাদি পড়িয়াছেন যথা 'ইন্দ্রর সভা")! এই নাটক প্রগতিশীল নহে। এই সময়ে রজ্জব আলী "সরুর" "ফিস নাই—আজাইব" নামক গদ্য পুস্তক লেখেন। ইহাতে তুকতাক, ডাইনী প্রভৃতির গল্প এবং পতনোন্মুখ নবাব বাড়ীর গল্প লেখা হইয়াছে। লক্ষ্ণৌর সামাজিক জীবন ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সবই কল্পনা প্রসূত।

এই সময় হইতে উর্দুতে নাটক লিখিত হইতে থাকে। কিন্তু ফার্শীতে নাটক না থাকায় লেখকেরা সেক্সপীয়ার প্রভৃতি ইংরেজী লেখকদের নকল করিতে

থাকেন। সংস্কৃতের কোন ধার তাঁহারা ধারিলেন না। বাঙ্গলা নাটকেও এই প্রকারের বিবর্ত্তন হইয়াছে।

ইহার পর আসেন দুর্গা সহায় 'সরুর' (খৃঃ ১৮৭৩-১৯১০)। ইনি দুঃখ ও করুণতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইনি ছিলেন; একজন স্বদেশপ্রেমী জাতীয়তাবাদী কবি তাঁহার "খাক-ই-ওয়াতন", "উরুস-ই-হুবলী-ওয়াতন"; "হসরত-ই ওয়াতন"; "ইয়াদ-ই-ওয়াতন", "মাদার-ই-ওয়াতন" প্রসিদ্ধ। শেষোক্তটি বঙ্কিম চন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" এর প্রতিধ্বনি বলিয়া প্রতীত হয়। নাদীরও এই সুরে "মুকদ্দস সরজমীন" (পবিত্রভূমী) এবং "মাদার-ই-হিন্দ" লেখেন। এইগুলি তৎসময়ে রাজনীতিক ও স্বদেশপ্রেমিকের মনস্তত্ত্ব ব্যক্ত করে, এই জন্য অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল বলা যায়। নাসীর আহমেদ "মিরাতুল উরুস" পুস্তকে একজন অশিক্ষিত বালিকা উচ্চশ্রেণীয় মুসলমানের সংসারে বিবাহ করিয়া কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা চিত্রিত করিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমান কন্যারাই ইহা পাঠে উপকৃত হন। ইহা প্রগতিশীল পুস্তক। তদ্রূপ, 'বিনত-উম-নাস' পুস্তকে নারী শিক্ষার উপকার প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাও প্রগতিশীল পুস্তক। মনোহর লাল জুটসী (খৃঃ ১৮৭৬ জন্ম) "গুলদস্তা-ই-আদাব" (ব্রিটিশ-ভারতে শিক্ষা) বিষয়ক পুস্তক লিখেন। ইনি পূর্ব্বেকার উর্দু কবিদের ভাষার তীব্র সমালোচনা করেন। দয়ানারায়ণ নিগম (জন্ম খৃঃ ১৮৮৪) "জমানা" সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং সামাজিক, রাজনীতিক, সাহিত্যিক নানা আন্দোলনের কেন্দ্র স্বরূপ। ইঁহার লেখায় প্রগতির সন্ধান পাওয়া যায়। লালা শ্রীরাম "ঘুমখানা-ই-জয়ীদ" নামক চারিখণ্ডে (এখনও অসম্পূর্ণ) অপ্রকাশিত উর্দু কবিদের কবিতাসমূহ উদ্ধার করেন। এই সঙ্গে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের "আল-হিলাল" বিশিষ্ট ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়কার মুসলমান লেখকেরা লম্বা চওড়া আরবী ও ফার্শী শব্দ সমূহ উর্দুতে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। "আল-হিলাল" ধর্ম্ম সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে লেখে। "আউধ পাঞ্চ" (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত, এক্ষণে বন্ধ) সজ্জদ হাইদার দ্বারা লক্ষ্ণৌতে স্থাপিত। এই পত্রিকা, কংগ্রেস, হিন্দু ও মুসল-

মানের একতা সমর্থন করিত। এই হিসাবে ইহা প্রগতিশীল ছিল, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা, পাশ্চাত্য বিদ্যা এবং পর্দার কড়াকড়ি উঠান বিষয়ের প্রতিপক্ষে ছিল। এই জন্য এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়াশীল। তৎপর, ঢাকার নবাব সৈয়দ মহম্মদ আজাদ (জন্ম খৃঃ ১৮৪৬) নভেলাকারে "নবাবী দরবার" নামক পুস্তকে একজন পুরাতন ধরনের অলস নবাবের দোষ ও দুর্ব্বলতার উপর কশাঘাত করিয়াছেন। এই বিষয়ে পুস্তকটি প্রগতিশীল।

তৎপর, একজন বড় গদ্য লেখক ছিলেন রতন নাথ ধর "সারসার" (খৃঃ ১৯০২ মৃত)। ইহাঁর বিখ্যাত পুস্তক হইতেছে, "ফিসানা-ই-আজাদ"; ইহা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লিখিত। লক্ষ্ণৌর সামাজিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গেরই চিত্র এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। মহরম, চিল্লাম, আয়েসবাগের মেলা, আফিংখোর, উদ্ভট পোশাকপরা নবাব ও তাহার কাঠ শুকনা দ্বারবানের দল, ফিটনে চড়া নর্ত্তকী, ভিক্ষুক, সর্ব্ব বয়সের সুশ্রী ও বিশ্রী স্ত্রীলোক, পুলিশ, রেলওয়ে বাবু, ঠাকুর (রাজপুত), লালা যে ফার্শী শিখিয়া পানওয়ালীর কাছে তাহা ব্যবহার করিতেছে, তুর্কী ফেজধারী নূতন ঢং-এর মুসলমান, ধুতীপরা বাঙ্গালী ইত্যাদির হুবহু বর্ণনা এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। ইনি অপ্রাকৃতিক পরিত্যাগ করিয়া মানুষের সাধারণ জীবন বর্ণনায় অনুরক্ত ছিলেন। ইহাঁর পুস্তকে আমরা সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সংবাদ পাই, এই জন্য ইহা অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল। পুনঃ, ধনপতরায় "প্রেমচাঁদ" "জলওয়া-ই-আইসর", বাজার-ই-হুসন" পুস্তক সমূহে সাধারণ ব্যক্তি বিষয়ে লিখেন। ইনি সর্ব্বপ্রথম লেখক যিনি কৃষক বিষয়ে মনোযোগী হন। ইহাঁর সাহিত্য প্রগতির ছাপ বহন করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশশতাব্দীর প্রথম যুগে কবি আকবর প্রকট হন। ইনি জাতীয়তাবাদী কবি।

একস্থলে ইনি বলিতেছেন:

আকবর: "কেয়া গণিমত নহীঁ য়' আজাদী,
সাঁসলেতে হৈঁ বাত করতে হৈঁ"।

পুনঃ, ইনি বলিতেছেন :

"হিন্দু মুসলমান এক হৈঁ দোনোঁ।
য়ানী য়ে দোনোঁ এসিয়াই হৈঁ ॥
হমওয়াতন হমজবাঁ উও হম কিস্মত।
কেঁও ন কহ দুঁ কি ভাই ভাই হৈঁ" ॥

হিন্দু ও মুসলমানের মিলন কেন হয় না সেই বিষয়ে ইনি জবাব দিতেছেন— "মৌলিবী কো পুছ"। তার পর, যখন খয়ের খাঁর দল, ভারতকে 'দার-উল-ইসলাম' বলিতে লাগিল, তখন তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে জবাব দেন :

"য়ে বাত গলৎ দারে ইসলাম হৈ হিন্দ।
য়ে ঝুট কি মুল্কে লছমনো রাম হৈ হিন্দ ॥
হম সব হৈঁ মুতী উও খৈরখায়ে ইঙ্গলিস।
য়ুরোপকে লিয়ে বস এক গোদাম হৈ হিন্দ" ॥

আবার, যাহারা স্বদেশ ভূলিয়া কেবল ইরাণ ও তুরাণের কথায় মসগুল হয় তাহাদের কশাঘাত করিয়া ইনি বলেন :

"পেট মসরূপ হৈ কলর্কীমেঁ।
দিল হৈ ইরান ঔর টর্কীমে" ॥

১৯২১ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইনি গান্ধীজির প্রশংসা সূচক একটী কবিতা তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্বন্ধে ইনি প্রগতিশীল ছিলেন কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী এবং পুরুষের পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হওয়া বিষয়ে ইনি বিশেষ ভাবে বিপক্ষতা করিতেন এবং ব্যঙ্গ করিয়া কবিতাও লিখিয়াছেন। এক জায়গায় ইনি বলিতেছেন :

"হুস্নে-মিসপর কর নজর মজহব অগর জাতা হৈ জায়।
কদরদাঁকো নির্থ কি কেয়া বহম আকবর মাল দেখ" ॥

ইনি বাঙ্গালীদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :

"বাত বঙ্গালীকে স্থন বঙ্গালিনোঁ কে বাল দেখ" ॥

আর এক স্থানে ইনি বলিতেছেন :

"সুক্তায়ে সুনা হৈ এক বঙ্গালীসে।
করনা হো বসর জো তুমকো খুশহালী সে।
খালী হো জগহ তো আপনে ভাইকো দিলাবে।
গুস্‌সা আয়তো কামলো গালী সে" ॥

রুষ বিপ্লবের পর, সাময়িক পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া ইনি বলিতেছেন :

"হমে কেয়া বোলশেভিক ফিরগয়া য়া রুষ আতা হৈ।
য়হাঁ তো ফিক্রে সরমাই হৈ মাহে পুস আতা হৈ" ॥

অধ্যাপক আজাদ 'আবে হায়াৎ' পুস্তকে কি প্রকারে 'ভাষা' হইতে উর্দুর বিবর্ত্তন হইল এই প্রসঙ্গে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন যে, কালে উর্দুতে ইংরেজী শব্দ সমূহ প্রবেশ লাভ করিবে। কবি আকবরে তাহা সত্য হইয়াছে, ইনিই প্রথম উর্দুতে ইংরেজী শব্দ প্রবেশ করান। যথা :

"মুবারিক হো তুম্‌হীঁ কো চাটনা লড্ডুকে ফোটোকা" !

ইহাঁরই সাময়িক ছিলেন কবি মহম্মদ ইকবাল। ইনি প্রথমে হৃদয়োন্মাদক জাতীয়তাবাদী এবং স্বদেশ-প্রেমিক কবিতা ও গান সমূহ রচনা করিয়া বিখ্যাত হন ; পরে সাম্প্রদায়িক ও "পাকীস্থান" পরিকল্পনার দার্শনিক হন।

ইহাঁর বিভিন্ন যুগের রচনার ও মনস্তত্ত্বের কিঞ্চিৎ নমূনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'তসইর দরদ' কবিতার একস্থলে ইনি দেশের দুর্গতি স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিয়া বলেন :

ইকবাল : "রুলাতা হৈ তেরা নজ্জারা ইয়ে হিন্দোস্তাঁ মুঝকো।
কি ইবরত খেজ হৈ তেরা ফিসানা সব ফিসানোমেঁ" ॥

পুনঃ, ইনি বলিতেছেন :

"ওতন কী ফিক্র কর নাঁদা মুসীবত আনেবালী হৈ
তেরী বর্ব্বাদিয়োঁ কে মশুরে হৈঁ আসমানোঁ মেঁ ॥
ন সমঝোগে তো মিট জায়েগা ইয়ে হিন্দোস্তানবালো
তুম্‌হারী দাস্তাঁতক ভী ন হোগী দাস্তানোঁমেঁ" ॥

এতদ্বারা তিনি স্বদেশবাসীকে নিজের অবস্থা বিষয়ে সচেতন করিয়া দিতেছেন। কিন্তু এই সব পদ্যে আক্ষেপেরই সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

তৎপর, "হিন্দোস্তান হামারা" নামক সঙ্গীতে তিনি সিংহ-গর্জ্জনে বলিয়াছেন:

"সারে জাহাঁসে আচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হামারা।
হম বুলবুলে হৈঁ ইসকা য়হ গুলসিতাঁ হমারা॥
এ আবে রৌদে গংগা উও দিন হৈ য়াদ তুঝকো।
উতারে তেরে কিনারে জববাকারবাঁ হমারা।
মজহব নাহি শিখাতা আপস মেঁ বৈর রখনা।
হিন্দী হৈঁ হম ওয়াতন হৈ হিন্দোস্তাঁ হমারা॥
য়ূনানী মিশ্রী রোমাঁ সব মিটগয়ে জগাঁ সে।
আবতক মগর হৈ বাকী নামো-নিশাঁ হমারা॥
কুছ বাত হৈ কি হস্তী মিটতী নহীঁ হমারী"।

এতক্ষণ সিংহ-গর্জ্জনে স্বদেশ প্রেমের বর্ণনা চলিতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই হতাশায় অভিভূত হইয়া তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন:

"সদিয়োঁ রহাহৈ দুসমন দৌরে জহাঁ হমারা।
"ইকবাল" কোই মহরম আপনা নহী জহাঁ মে।
মালুম কেয়া কিসী কো দর্দে নিহাঁ হমারা"।

তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 'আমাদের ইতিহাসের গতিতে শতাব্দী ধরিয়াই শত্রু থাকিয়া গিয়াছে। হে ইকবাল! আমার দুঃখে সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই। কি জানি কাহার হৃদয়ে আমার জন্য দরদ আছে"। "পুনঃ, তসইর-দরদ" নামক কবিতাতে তিনি বলিয়াছেন:

"তাসসুবনে মেরে খাক ওয়াতনমে ঘর বনায়া হ্যায়,
উও তুফান হুঁ কি ময় উস ঘরকো বিরান করকে ছোড়ুঙ্গা"।

ধর্ম্মান্ধতা বা কুসংস্কার আমার মাতৃভূমিতে বাসা বাঁধিয়াছে। আমি তুফানের ন্যায় তাহাকে ভাঙ্গিয়া দিব।

পুনঃ, তিনি বলিতেছেন :

"পরোনা একহী তসবিহমেঁ ইন বখেরে দানোঁকো।
যো মুসকিল তো উস মুসকিল কো আসান কর কে ছোড়ুঙ্গা।

*　　*　　*

আগর আপসমে লড়না আজকাল কি হ্যায় মুসলমানী
মুসলমানোকো আখর না-মুসলমান করকে ছোড়ুঙ্গা॥

*　　*　　*

দেখাতুঙ্গা জহানকো যো মেরে আখেঁসে দেখা হ্যায়।
তুঝে ভি স্থরতে আয়না হয়রান করকে ছোড়ুঙ্গ"া॥

এই স্থলে ইনি বলিতেছেন, "এই বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীদের এক সূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য যে কষ্ট তাহা আমি স্বীকার করিব। আমি মাতৃভূমিকে জগতের আশ্চর্য্যজনক বস্তু করিয়া তুলিব।" এই স্থলে আমরা পুনঃ সিংহগর্জ্জন ও গঠনমূলক (Constructive) আশার বাণী শ্রবণ করি। এতক্ষণ তিনি স্বদেশ ও স্বজাতিকে জাগ্রত করিয়া বড় করিবার জন্য জাতীয়তার তূর্য্যনিনাদ করিতেছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি অনেক অপ্রিয় সত্য দেশবাসীকে শ্রবণ করাইয়াছেন। "নয়া শিবালা" নামক কবিতায় তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন।

"সচ কহ দুঁ ইয়ে বেরামন গরতু বুরা ন মানে
(সত্য কহি হে ব্রাহ্মণ তুমি মন্দ ভেবো না)
তেরে সনমকদোঁকী বুত হো গয়ে পুরানে।
(তোমার মন্দিরের দেবতাটি পুরাতন হইয়া গিয়াছে)
আপসমেঁ বৈর রাখনা তুনে বুতোঁসে শিখা।
(তুমি তোমার দেবতার কাছ হইতে পরস্পরের সহিত ঝগড়া করিতে শিখিয়াছ)
জঙ্গ-জদল শিখায়া ওয়াইজকো ভী খোদানে।
(মুসলমান ধর্ম্মোপদেশককে খোদা লড়াই করিতে শিখাইয়াছে)

পাথর কী মূর্ত্তোমেঁ তুনে সমঝা হ্যায় খুদা হ্যায়।
(পাথরের মূর্ত্তিতে তুমি ভাবিতেছ ভগবান আছে)
খাকে ওয়াতনকা মুঝকো হরজর্রা দেওতা হ্যায়।
(মাতৃভূমির প্রত্যেক ধূলিকণা আমার কাছে দেবতা)

* * *

শুনি পড়ি হুয়ি মুদ্দতসে দিলকা বস্তি।
(শুনেছি অনেক দিন থেকে মন চর্চ্চাবিহীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে)
আঃ ইক নয়া শিবালা ইস দেশমে বনাদে"।
(আঃ এই মন-ভূমিতে একটি নূতন শিবালয় নির্ম্মাণ কর)।

এই সব কবিতায় তাঁহাকে প্রগতিশীল বলিয়া নিরীক্ষণ করা যায়। সাহিত্যের ভিতর দিয়া তিনি দেশকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু ইউরোপ পরিভ্রমণের পর থেকে তাঁহার সঙ্গীতের সুর পরিবর্ত্তিত হয়। ইউরোপ যাত্রা কালে পথে সিসিলী দ্বীপে আরবদের এক সৌধের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া তিনি শোকাপ্লুত হইয়া এক "মরসিয়া" লিখিয়া বলিলেন:

"রোয়ে আয়ে লাখ দিলকর আয় দিদাখুন বহানা কর,
উও নজর আতা হ্যায় তহজিব হেজাজীকা মজার"।
[চক্ষুতে রক্ত বাহির করিয়া প্রাণ ভরিয়া ক্রন্দন কর, হেজাজীদের
(আরব) সভ্যতার কবর ওই দেখা যাইতেছে]।

পুনঃ, এই উপলক্ষে তিনি বলিতেছেন:

"শুনা হ্যায় কদসিয়োঁসে ময়নে উও সের ফির হুঁসিয়ার হোগা"।
[স্বর্গীয় দূতদের কাছ থেকে শুনেছি ওই (আরব) সিংহ পুনরায়
জাগ্রত হইবে।]

শেষে তিনি বলিতেছেন:

"মরসিয়া তেরী তবাহী কা মেরী কিসমতমে থা।
ইয়ে তড়পনা আউর তড়পানা মেরী কিসমতমে থা"।

ইহার অর্থ, আমার অদৃষ্টেই ইহা নির্দ্দিষ্ট ছিল যে তোমার জন্য শোক প্রকাশ

করিয়া কবিতা লিখিব। এই যন্ত্রণা ভোগ করা এবং অপরকেও ভোগ করান আমার অদৃষ্টে ছিল!

প্যান-ইসলামবাদী হইয়া, সারাসেনদের সিসিলিতে প্রভুত্বের চিহ্নস্বরূপ এক ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া তিনি আকুল হন, কিন্তু ভারতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কত কারুকার্য্যের স্মৃতিস্তম্ভের ধ্বংস যে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে তাহার দিকে এই যুগে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই! কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব তিনি, প্রাচীন কাশ্মীরের স্থপতি কার্য্যের ধ্বংসাবশেষগুলির প্রতি তাঁহার নজর যায় নাই, পুনঃ, ভারতীয় লোক হইয়া তিনি এই কথা তেজের সহিত বলিতে পারিলেন না যে, "হিন্দুস্থানকী শের ফির হোসিয়ার হোগা!" এই তথ্য হিন্দু ও ইউরোপীয়ের নিকট অবোধ্য। যাহাই হউক, এই যুগেও তাঁহাকে আমরা নৈরাশ্যের কবিরূপে দর্শন লাভ করি। এই স্থলেও গঠনমূলক কিছু তাঁহার কাছে পাই নাই।

ইউরোপ প্রবাসকালে তিনি তথাকার শ্রমশিল্পজাত ব্যবসায়ী সভ্যতার স্বরূপ দেখিয়া বলিলেন:

"দস্তে-দৌলত আফিরী কী মুজদ ইয়েঁা মিলতী রহী।
অহলে সর্বত জৈসে দেতে হৈঁ গরীবোঁকো জকাত।
নস্ল, কৌমীয়ত, কলীসা, সলতনত, তহজীব, রঙ্গ।
খ্বাবগী নে খুব চুন-চুনকর বনায়ে মুসকরাত।
মক্রকী চালোঁসে বাজীলে গয়া সর্মায়াদার।

* * *

মশরিকো মগরিব যেঁ তেরে দৌরকা আগাজ হৈ॥"

ইহার অর্থ—হাতে ধন থাকার প্রশংসার কারণ এই স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেমন গরীবকে জাকাত দিবার কালে প্রথমে সরবত পান করিতে দেওয়া হয়। বংশ, জাতিত্ব, গির্জা, রাজত্ব, সভ্যতা, আহ্লাদ এইসব সৃষ্টি করিয়া স্বপ্ন খুব খেলা দেখায়! কিন্তু জুয়াচুরীর চালে মূলধনীই জিতিল! পশ্চিম ও প্রাচ্যের দৌড়ের অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আরম্ভ হইয়াছে।

ইকবাল যখন পশ্চিম ভ্রমণ করিতে যান তখন পশ্চিমের পণ্ডিতেরা জগতের সমস্যাকে 'পূর্ব্ব ও প্রতীচ্যের সমস্যা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন (ফরাশী লেখক Gustave Le Bon-এর পুস্তক সমূহ, আমেরিকান Weale-এর Conflict of Colour দ্রষ্টব্য) আর ইহার সমাধানের জন্য সাম্রাজ্যবাদীমত সমূহ যথা: "Control of the Tropics", "White Man's Burden" ইত্যাদি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইত। পুনঃ, এই দেশে তাহা স্কুল কলেজে পঠিত হইত এবং তাহা পাঠ করিয়া revealed truth (আপ্ত বাক্য) বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতাম। এই যুগের ছাঁচ তাঁহার মনে লিখিয়াছিল তাই প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীয়দের কথায় তিনিও বিহ্বল হইয়াছিলেন। এই স্থলেও হতাসতার আভাস আমরা পাই (বাঙ্গালার হেমচন্দ্রেও ইহার আভাস পাওয়া যায়)।

শেষে কিন্তু এই সভ্যতার আসলরূপ দেখিয়া তিনি সিংহ-গর্জ্জনে পুনঃ বলিলেন:

"দিয়ারে মগরেব কি রহনেওয়ালো খোদাকি বস্তি দোকান নেহি হ্যায়,
খিরাজসে তোম সমঝ রহে হো উও আব জোরকম আইয়ার হোগা।
তোমহারি তহজিব আপনে খন্‌জরসে আপহি খোদকুসি করেগী,
জো সাখ নাজক প, আসিয়ানা বনেগা নাপায়দার হোগা" ॥

ইহার অর্থ—হে পশ্চিমের অধিবাসীগণ! ভগবানের রাজত্ব দোকান নয়, তুমি খাজনা খাইয়া সন্তুষ্ট আছ, কিন্তু তাহার মূল্য আজ কম প্রমাণিত হইবে। তোমার সভ্যতা আপনার অস্ত্রেই আত্মহত্যা করিবে। যে নরম ডালে বাসা বাঁধে, তাহা অস্থায়ীই হয়।

বিগত জগতব্যাপী প্রথম যুদ্ধের পর, ইকবালের গুণমুগ্ধ বন্ধুরা (নবাব জুলফিকার খাঁ, সার আবদুল কাদের দ্রষ্টব্য) বলিলেন, তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে।

অবশ্য এই স্থলে আমরা প্রগতির সংবাদ পাই না, তবে যখন তৎকালের শিক্ষিত ভারতবাসী ইউরোপের সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্য দেখিয়া ভুলিতেন এবং Mid-Victorian ideologyর উপর উঠিতে পারিতেন না, তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

তিনি সত্য ধরিতে পারিয়াছিলেন। কার্লমার্ক্স ও এঙ্গেলস যাহা বহু পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছিলেন, ইকবাল কবির দৃষ্টি দ্বারা তাহার স্বরূপ বোধগম্য করেন। এই স্থলে তাঁহার মন উচ্চস্তরে অবস্থিত ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে যদিচ এতদ্বারা প্রগতি বা গঠনমূলক কিছু আমরা পাই না। শেষে তাঁহার "প্রেমের জন্ম" নামক কবিতাটী অতীন্দ্রিয়বাদের ভিত্তিতে একটী কল্পনাপ্রসূত কবিতা:

"আভি ইমকান কি জুলমত খানে সে উভরি হি থি দুনিয়া,
মজাক জিনদেগী পোসিদাহ থা পহনায়ে আলমসে

*   *   *

তড়প বিজলিসে পাই হুর সে পাকেজগী পাই,
হরারত লি নফসলি মসিই-ইবনে-মরিয়মসে,
জরাসে ফের রবোবিয়ৎ সানে বেনিয়াজি লি

*   *   *

খরাম নাজ পায়া আফতাবোঁনে সেতারোঁ নে
চটক গুনচোনে পাই সোয়াগ পাই লাখ জরায়োঁনে"।

ইহার অর্থ—"সম্ভাবনার অন্ধকার গৃহ হইতে পৃথিবী কেবলমাত্র বহির্গত হইয়াছে, জীবনের আনন্দ এখনও বিস্তৃত জগতে লুক্কাইত আছে। বিদ্যুত থেকে চাঞ্চল্য, হুর থেকে পবিত্রতা, যীশুখৃষ্ট থেকে বিশ্বাস, ভগবান থেকে ভক্তি গৃহীত হয়। [ইহার যে মিশ্রণ হয় (মকররব) তাহার নাম—প্রেম (মহব্বত)]। (এতদ্বারা) যাহা খাড়া ছিল তাহা গোলাকার ধারণ করে: যথা তারকা-বৃন্দ ও চন্দ্রাদি, ফুলের কুঁড়ি সব নূতন রঙ্গ ধরে, অসংখ্য ফুলসব সোহাগপ্রাপ্ত হয়।" এই কবিতাতে নৈরাশ্য নাই কিন্তু অতীন্দ্রিয়বাদীয় কল্পনার চূড়ান্ত আছে। ইহাতে আমরা প্রগতির চিহ্ন দেখিতে পাই না।

ইকবাল হতাশার কবি ছিলেন; ক্রন্দন করাই তাঁহার ভাগ্যে ছিল তাহা তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গঠনমূলক কোন আদর্শ তিনি প্রদান করিয়া যাইতে পারেন নাই যদ্বারা তাঁহার দেশবাসীরা প্রগতির

অভিমুখে ধাবিত হইবে। এই জন্য শেষ জীবনে তিনি প্রগতিশীল কবি ছিলেন না।

ইকবালের সঙ্গে আর একজন কাশ্মীরী বংশীয় কবির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি ব্রজনারায়ণ "চাকবস্ত"। ইনি লক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রতিভাপন্ন কবিরূপে উদিত হন। ইনি 'স্বায়ত্ত-শাসন' এবং 'অসহযোগ আন্দোলন' এর সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। ইঁহার "খা:কে হিন্দ" নামক সুদীর্ঘ কবিতা অতি প্রসিদ্ধ।

চাকবস্ত : "ইয়ে খাকে হিন্দ তেরে আজমৎ মেঁ কেয়া গুমান হৈ।
দরিয়ায় ফৌজ কুদরত তেরে লিয়ে রবাহৈ॥

* * *

শময়ে আদব ন থী জব য়ুনাঁ আন্‌জুমন মেঁ।
তাবাঁথা মহরে দানিশ ইস বাদিএ কুহন মেঁ॥

* * *

জমীনহিন্দকী রূতবে মেঁ অরশ আলা হৈ।
যহ হোমরূলকী উম্মীদ কা উজালা হৈ"॥

ইহার অর্থ—হে ভারত মাতৃভূমি! তোমার মহত্বে কি সন্দেহ আছে? সমুদ্রের জীব সকল তোমার গুণগান করে। যে সময়ে গ্রীসে সভ্যতার আলোক ছিল না, তৎকালে এই প্রাচীন দেশে উচ্চজ্ঞান প্রচলিত ছিল। উচ্চ সিংহাসনই হিন্দুস্থানের পদ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, এক্ষণে এই স্থলে হোমরূলের আশা উজ্জ্বল হইয়াছে।

এই কবিতায় আমরা প্রগতির নির্দ্দেশ পাই।

এক সময়ে ক্ষুণ্ণ হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন :

"কৌম কা সিরাজাবন্দী কা গিলা বেকার হৈ।
তর্জে হিন্দু দেখ কর রংগে মুসলমান দেখ কর"॥

ইহার অর্থ—হিন্দুকে তর্কবাগীশ দেখিয়া এবং মুসলমানকে গাত্রবর্ণে চিহ্নিত দেখিয়া মনে হয়, 'নেশন'কে একত্রে বন্ধন করা বিষয়ে নালিশ বৃথা!

পুনঃ, মান যশের প্রতি উপেক্ষা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন :

"কিস ওয়াস্তে জুস্তজু করু সোহরৎ কী।
একদিন খুদ চুঁড়লেগী সোহরৎ মুঝকী"॥

দুঃখের কথা, তিনি অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়াতে এই সুর আর ধ্বনিত হয় না। এক্ষণে আমরা বর্ত্তমানকালে উপনীত হইয়াছি। উপস্থিত সময়ে কতকগুলি মুসলমান কবি উত্থিত হইয়াছেন যাঁহারা জাতীয়তাবাদীয় কবিতা সমূহ লিখিতেছেন। ইহাঁদের কবিতার মধ্যে প্রগতির ধ্বনি উত্থিত হইতেছে।

মৌলানা হাফিজ বলিতেছেন :

হাফিজ "আপনে মনমেঁ প্রীত বসালে,

* * *

ভুলগয়া ও ভারতওয়ালে;
প্রীত হৈ তেরী রীত!

* * *

সেখ বরহমন দোনোঁ রহজন (ডাকাইত) একসে বড়
কর এক লুটেরা,

* * *

ভারতমাতা হৈ দুখিয়ারী, দুখিয়ারে হৈঁ সব নরনারী,

* * *

তু জাগে তো দুনিয়া জাগে, জাগ উঠসব প্রেম পূজারী,

* * *

বসালে; আপনে মনমেঁ প্রীত"।

অখতর শেরাণী বলিতেছেন :

"ভারত সবকী আঁখকা তারা ভারত,
ভারত হৈ জিন্নতকা নজারা ভারত,
প্যারা প্যারা দেশ হমারা ভারত"।

হামিদ আল্লাহ 'অফসর'

"ভারত প্যারা দেশ হামারা, সবদেশী সে প্যারা হৈ,
হররত, হর ইক মৌসমইকা, কৈসা প্যারা প্যারা হৈ,

*   *   *

গঙ্গাজীকী·প্যারী লহরে গীত সুনাতী জাতী হৈঁ,
সদিয়োঁকী তহজীব হমারী ইয়াদ দিলাতী জাতী হৈঁ,

*   *   *

কৃষ্ণকী বংশীমে ফুঁকী হৈ রুহ হমারী জানোঁ মেঁ,
গৌতম কী আবজ বসী হৈ, মহলো মেঁ, মৈদানোঁ মেঁ,
চিস্তী নে জোদীথী ময়, উও অবতক হৈ পৈমানোঁ মেঁ,
ভারত প্যারা দেশ হামারা সব দেশোঁ সে প্যারা হৈ।

*   *   *

মজহব হো কুছ, হিন্দী হৈঁ হম, সারে ভাই ভাই হৈঁ,

*   *   *

ভারত নামকে আশিক হৈঁ হম ভারত কে সৌদাই হৈঁ,
ভারত প্যারা দেশ হামারা সবদেশ সে প্যারা হৈ।"

মৌলানা হামিদ আলি খাঁ 'সরমায়দারী' (পুঁজিবাদ) সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিয়াছেন :

"দৌলতনে কৈসী, শোরিশ (বিদ্রোহ) ক্যায়া বাদসাহী
ঔ'ক্যা গদাই (ফকীরী),
ভুখোঁকী রোটী হথিয়াকে বন্দা, করতাহৈ বন্দী পরকেঁও খুদাই ?
শাহী গদাই, মীরী ফকীরী, জব উঠগয়ে য়হ পর্দে রয়াই (ঝুটে).
য়হ ভী হৈ ইন্সাঁ (মানুষ), উহভী হৈ ইন্সাঁ, উহ ইসকা ভাই,
য়ই উসকা ভাই।"

'অহসান' দানিশ : ইনি মজুরের ছেলেকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন :

"যহ প্যারা প্যারা বাচ্চা, আখোঁ কা তারা বাচ্চা।"

এইসব কবিতাতে আমরা পূর্ণ জাতীয়তাবাদ, এবং বর্ত্তমানের পুঁজিবাদ প্রভৃত মজুর প্রভৃতির এবং সাম্যের সংবাদ পাই। এই জন্য এইগুলি প্রগতিশীল কবিতা।

বর্ত্তমানের একজন কবি হইতেছেন মৌলানা জোস মালিহাবাদী। ইনি সাহিত্যিক প্রগতি আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছেন। ইহার কবিতাতে উপস্থিত প্রগতির সুর ধ্বনিত হইতেছে। এক্ষণে ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের ন্যায় উর্দ্দুসাহিত্যে কৃষক ও মজুর, গরীব গৃহস্থের কাহিনী সংবাদপত্র প্রভৃতিতে উত্থিত হইতেছে। উর্দ্দুভাষীদেরও মধ্যে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে একদল প্রগতিশীল লেখক সমুত্থিত হইয়াছেন যাঁহারা ভারতীয় রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিকে নূতন চক্ষে দেখিতেছেন। আশা করা যায়, কালে উর্দ্দুসাহিত্যে তাঁহারা প্রগতির একটা বিশিষ্টরূপ প্রদান করিবেন।

এইস্থলে আমরা উর্দ্দুসাহিত্য মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া উপস্থিত সময়ে উপনীত হইতেছি। প্রথমে আমরা দেখি একটি মিশ্রিত ভাষারূপে ইহা উত্থিত হয়, পরে ফার্শী, আরবী ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহা গ্রহণ করিয়া ইহাকে ইরাণীরূপ প্রদান করেন। ইহার ফলে এই সাহিত্য মধ্যে ভারতের পক্ষে অপ্রাকৃতিক ভাব ও বস্তুসমূহ আমদানী হয়। উর্দ্দু সাহিত্যে সমসেদবৃক্ষ (poplar), সরো (cypress), নারগীস (Narcissus), সৌসম (Elegantine), সমবুল (spikenard), বুলবুল, বোস্তাঁ, লইলা ও মজনু, ফরহাদ ও সিরিন প্রভৃতির প্রেম, রোস্তাম ও তৎপুত্র সোরাবের বীরত্ব, ইসকানডিয়ার ও আফ্রাসিয়াব নামক রাজারা, হাতেম তাই ও আটকাল প্রভৃতির সংবাদে উর্দ্দু সাহিত্য ভরপুর হয়। ভারতের ভীমের বীরত্ব, নল ও দময়ন্তীর প্রেম, অর্জ্জুন ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধ, ভারতীয় ফুল, বৃক্ষ ও পর্ব্বত প্রভৃতির বর্ণনা তাঁহাদের কাছে হারাম হয়। কিন্তু খৃষ্টান-আরব হাতেম তাই বদান্যতার আদর্শ হন, খৃষ্টান-আরব আটকাল বড় কবি বলিয়া গণ্য হন, অগ্নি উপাসক ইরাণী রাজা খস্রু নৌসিরবান, জামসেদ, বহরাম প্রভৃতি এবং গ্রীক দার্শনিকেরা আদরণীয় হন। শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহারা একেবারেই

স্বাজী নন, কিন্তু কল্পিত এবং পৌত্তলিক ইরাণী রাজা ফরিদুনের বংশধর বলিতে তাঁহাদের গর্ব্বের সীমা থাকে না। ভারতের কোকিল, ভারতের শস্য-শ্যামলা ক্ষেত্র তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিল না, আরব ও পারস্যের মরুভূমি ও বুলবুল তাঁহাদের আদরণীয় হইল। পশ্চিমের আধী এবং উত্তপ্ত ধূলীময় দেশে তাঁহারা বোস্তাঁ, গুলসানের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। ভারতের প্রকৃতি তাঁহাদের কাছে আদরের বস্তু হইল না; কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহাদের মুগ্ধ করিল না। কিন্তু "সব বুই আ" সমরকন্দ, ইসফাহান ও দামাস্কের জন্য তাঁহারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহারা "বিদেশী"! তাঁহারা নিজ বাসভূমে এতকাল প্রবাসী হইয়া আছেন। এই কারণ, অন্যদেশের সামন্তসাহী যুগের গল্প ও বর্ণনাতে উর্দু সাহিত্য ভরপুর হইয়া আছে। এইজন্য, এই অপ্রাকৃত সাহিত্যে প্রগতির সন্ধানপ্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। একেই একটী সম্প্রদায়ের পতনোন্মুখ কালেই এই ভাষার জন্ম হয়; তৎপর, তাহার পতনশীল কালেই ইহার পুষ্টি সাধন হয়, কাজেই সেই ভাষার সাহিত্যে অতীতের কাহিনী এবং হা হুতাস ব্যতীত অন্য কী থাকিতে পারে? এইজন্য আমরা উর্দুতে বুর্জোয়া সাহিত্যের উদয় দেখি না, সামাজিক চিত্র ইহাতে বিশিষ্টভাবে প্রতিফলিত হইতে দেখি নাই; সামন্তসাহীর জের এখনও উর্দু সাহিত্যে চলিতেছে। বাঙ্গলার কবি নজরুলের আক্ষেপ:

> "কবে সে খোয়ালী পাদসাহী, সেই অতীতে আজ চাহি,
> যাস মুসাফির গান গাহি, ফেলিস অশ্রুজল"।

সেদিন পর্য্যন্ত মুসলমান উর্দু সাহিত্যিকদের প্রতি ইহার প্রযোজ্য হইত। কিন্তু আশা নূতন সাহিত্যিকদের দল, যাঁহারা নূতন দৃষ্টি কোণ দ্বারা দেশকে দেখিয়া নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রগতি

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলাসাহিত্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে, এক্ষণে এই স্থলে আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যের আরও কিঞ্চিৎ সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করিব। বাঙ্গলা ভাষা মাগধী-প্রাকৃত প্রসূত; বাঙ্গলার পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত সর্ব্বপ্রাচীন খোদিত লিপি (Inscription) মৌর্য্য যুগে প্রদত্ত হয় এবং তাহা মাগধী-প্রাকৃতে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে "সাম-বঙ্গীয়দের" নেতা গলদনের নামোল্লেখ আছে। তৎপরের খোদিত লিপি সমূহ গুপ্তসম্রাটদের শাসনকালে অনুশাসনরূপে প্রদত্ত হয়। এইগুলি সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত হইয়াছে। এই সময় হইতে খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর দেববংশীয় দনুজমাধব 'দশরথ' পর্য্যন্ত সকল অনুশাসনই সংস্কৃত ভাষায় প্রদত্ত। কাজেই মুসলমান যুগের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষার সঠিক স্বরূপ জানিবার উপায় নাই। নেপাল হইতে আবিষ্কৃত "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা" নামক তিনখানি পুস্তক অপভ্রংশ ভাষায় অর্থাৎ মাগধী-প্রাকৃত ভাঙ্গিয়া যে ভাষা বিবর্ত্তিত হয় তাহাতেই গানগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন, ইহা বাঙ্গলার পূর্ব্বরূপ। অন্যদিকে, "ডাকের বচন" প্রভৃতি ছড়া যাহা বাঙ্গলায় প্রচলিত ছিল তাহা আজকাল বাঙ্গালা-ভাষীর কাছে কতকটা দুর্ব্বোধ্য! এই জন্য কোন শতাব্দীতে বাঙ্গলাভাষা তাহার বর্ত্তমানরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। আবার, এই ভাষার মধ্যে কতকগুলি উপ-ভাষাও আছে। যাহাই হউক মাগধীনিসৃত গৌড়-প্রাকৃত নানা অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া বর্ত্তমানের বাঙ্গলা ভাষার আকার ধারণ করিয়াছে, এই জন্য সাহিত্যিকদের মতে বাঙ্গলা-সাহিত্য অন্ততঃ প্রায় ১০০০ বৎসরের প্রাচীন। বাঙ্গলার স্বকীয় ব্যক্তিত্বের ইতিহাস ঐতিহাসিকদের মতে খৃঃ সপ্তম শতকে শশাঙ্ক নরপতি হইতে গণনা

করা হয়। ইহার পর, নানা আবর্ত্তন ও "মাৎস-ন্যায়" দ্বারা জর্জ্জরিত হইয়া বাঙ্গলা "গোপাল" নামক একজন সামন্তকে রাজপদে বরণ করে। ইহার পুত্র ধর্ম্মপাল উত্তর-ভারত হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অনুশাসন লিপিতে দাবী করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের রাজাদের খোদিত লিপিতে, ধর্ম্মপালকে "গৌড়েন্দ্র বঙ্গপতি" এবং প্রতিহার ভোজরাজের সাগরতাল লিপিতে বাঙ্গলার লোকদের "বঙ্গাণ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, আর প্রতিহার বাউকার যোধপুর লিপিতে "গৌড়ান" শব্দ আছে। এই পাল সম্রাটেরা "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" উপাধি পান। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে এহেন প্রবল পালযুগের কোন নিদর্শন নাই। ব্রাহ্মণদের কুলুজী গ্রন্থসমূহে অবশ্য তাহাদের উল্লেখ আছে। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে ইতিহাসরূপে পাল রাজত্ব সম্বন্ধে কোন বিবৃতি নাই; আমরা আজ তাহাদের বিষয় যাহা জানিতে পারিতেছি, তাহা বঙ্গ-মগধের এবং অন্যান্য প্রদেশের শিলা ও তাম্র-লিপিসমূহের পাঠোদ্ধারেই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কর্ণাটকাগত সেনরাজাদের শাসন কালে ব্রাহ্মণ্যাধিপত্য স্থাপিত হওয়ার ফলে, বৌদ্ধবাঙ্গলার শৌর্য্য-বীর্য্যের ও গুণগরিমার চিহ্ন সমূহ একেবারে নির্লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন "ধান ভানতে মহীপালের গীত"এর পরিবর্ত্তে শিবের গীত গাওয়া হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থে দুঃখের সহিত বলা হইয়াছে—

"যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোকে আনন্দিত॥"

(চৈতন্য ভাগবত অন্ত্য খণ্ড)।

এই উপায়ে বাঙ্গলার বৌদ্ধ কৃষ্টির সমস্ত চিহ্নই ব্রাহ্মণেরা বিলুপ্ত বা রূপান্তরিত করিয়াছে। এই প্রকারেই বারেন্দ্রের মহাপণ্ডিত চন্দ্রগোমিন বা গোস্বামী [ইহারই নামে চন্দ্রদ্বীপের নামকরণ হয়—বর্ত্তমান বাকরগঞ্জ জেলা] যে সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন তাহার অস্তিত্ব বাঙ্গলা হইতে বিলুপ্ত করা হইয়াছে। হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলায় যে প্রবল বৌদ্ধ-রাষ্ট্র ছিল, তাহার কোন চিহ্ন আজ নাই। ইহা ধর্ম্মাকারে ভীষণ-শ্রেণীসংঘর্ষেরই পরিণাম। এই সময়ের সামাজিক ইতিহাস হইতে বৌদ্ধ দলনের নষ্টকুষ্ঠি উদ্ধার করা যায়।

রাঢ়দেশের 'শূর' এবং পূর্ব্ব-বঙ্গের 'বর্ম্মণ' রাজবংশদ্বয় বিদেশাগত এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী। তাহারা বাঙ্গালীর গলায় দাসত্বশৃঙ্খল পরাইতে আরম্ভ করে। পরে কর্ণাটকাগত ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় সেনরা তাহা আরও দৃঢ়বদ্ধ করে। এই সময় হইতে একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদিগের অত্যাচার অন্যদিকে বৌদ্ধ-বাঙ্গালীদের অসন্তোষ এই উভয়াবস্থার সম্মিলনে মুসলমান-তুর্কিদের দ্বারা গৌড় বিজয় সহজ হয়। এই যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের যাহা কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়—"সূর্য্যের পাঁচালী", "শূণ্যপুরাণ" ও "ধর্ম্মপুরাণ" ইত্যাদি, তাহাতে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীয় গণশ্রেণীর ও সেই সঙ্গে ধর্ম্মের তৎকালীন অবস্থার সংবাদ পাই। এই ধর্ম্মগ্রন্থে দেবনিরঞ্জনের মৃত দেহের দাহকালে মহামায়ার সহমৃতা হইবার সময়—

"ললাটে সিন্দুর দিল দেবী সীমন্তে সিন্দুর।

* * *

আগেপাছে যান সবে খৈ কড়ি ছাড়িয়া॥"

বর্ত্তমান আচারের সহিত সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই যুগের চিত্রই ধর্ম্মমঙ্গলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গলা ভাষার Epic বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। ইহাতে ধর্ম্মঠাকুরের ভক্ত লাউসেনের যুদ্ধ বিবরণ আছে:

"নৃপতি কহেন বাপু প্রবল হইল রিপু মনদিল মনস্তাপ দূর।
কাঙুরে কর্পূরধল না দেয় ভূমের কর তায় তুমি কর দর্প চুর॥"

(মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল)

এই যুদ্ধে কাঙুর (কামরূপ) বিজয়ী লাউসেনের সেনাপতি ছিল কালু ডোম। এই মহাকাব্যে দৃষ্ট হয় যে, ডোম সেনাপতি, গৌড়ের সহর কোটাল ইন্দ্রমেটে (বাগ্দী জাতির একটী অংশ), একজন চণ্ডাল ঢেকুরের সহর কোটাল, আর ঢেকুরের সামন্ত ইছাই ঘোষ সম্ভবতঃ গোয়ালা।

এই কাব্য বিষয়ে একটি সমালোচনা উঠিয়াছে যে ধর্ম্মমঙ্গল নামক কাব্যটি দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের মহারাজার অনুরোধে রচিত হয়। ইহা প্রাচীন কালের পুস্তক নয়। ইহা সত্য বটে, এই পুস্তকের ভাষা আধুনিক এবং

মোগল যুগের স্মৃতি ইহা বহন করিতেছে, আর লাউসেনের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন পঞ্জিকাতে কলিযুগের রাজাদের নামের সঙ্গে লাউসেনের নাম উল্লিখিত হইত, এবং তীব্বতের পণ্ডিত তারানাথের "ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস" নামক পুস্তকে লাউসেনের (লবসেনের) নাম বিশেষ ভাবে উল্লিখিত আছে। ইনি চন্দ্রবংশীয় এবং শেষ পালরাজার মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হন। এই বংশ চারি পুরুষ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় রাজত্ব করে। এই বংশের রাজত্ব কালেই তুর্কি বক্তিয়ার খিলিজির আক্রমণ হয় এবং এই বংশ তাহাদের অধীন হয়। তারানাথ বলিয়াছেন তিনি তিনজন মাগধী বৌদ্ধ পণ্ডিত দ্বারা লিখিত ইতিহাস হইতে তথ্য-সমূহ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার ইতিহাস পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার পুস্তকে কর্ণাটকাগত ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় সেন বংশের নামোল্লেখ নাই। অন্য পক্ষে কামরূপের গৌহাটীর ডোম জাতীয় লোকেরা বলে তাহারা কালু ডোমের বংশধর এবং তাঁহার বীরত্বের গাথা তাহারা এখনও গান করে (N. N. Vasu "History of Kamarupa Vol. I. P 211)। পুনঃ, ঢেক্করীয় ঈশ্বর ঘোষ নামক সামন্তের তাম্র লিপিও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইনি বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু জাতি অজ্ঞাত।

তারানাথের এবং ধর্ম্মমঙ্গলের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বিচারসহ কি না তাহা ঐতিহাসিকেরা স্থির করিবেন (৺বসু বলিয়াছেন তাহা কতকটা বিচারসহ বটে; উক্ত পুস্তক দ্রষ্টব্য)। কিন্তু আমাদের ধারণা ইহা বৌদ্ধযুগের অতীত স্মৃতি বহন করিতেছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মপূজা উপলক্ষ্য করিয়াই মাণিক গাঙ্গুলী এই কাব্য রচনা করেন। ইহাতে অতীত জনশ্রুতির ঘটনাবলীর সমাবেশ করা হইয়াছে। এইসব পুস্তকে ও জনশ্রুতিতে তৎকালীন সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে।

আর্য্যমঞ্জুশ্রী কথিত পালরাজাদের জাতি (দাসজীবিনঃ) ও ধর্ম্মমঙ্গল সমূহে উল্লিখিত তাহাদের সামন্ত কর্ম্মচারীদের জাতি (দিব্বোক কৈবর্ত্ত জাতীয় ছিলেন) দেখিয়া তৎকালীন বাঙ্গলার সমাজের স্বরূপ কিঞ্চিৎ বোঝা যায়। আজ যাহারা

অধঃপতিত সেই সময়ে তাহারাই উচ্চবর্ণের ও শাসক শ্রেণীর ছিলেন। পূর্ব্বে সামবঙ্গীয়দের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ডাঃ ভাণ্ডারকারের ব্যাখ্যানুসারে ইহা কতকগুলি কৌমের (Tribe) সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান, ইহার মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পৌণ্ড্রজাতিও ছিল। কিন্তু আজ যাঁহারা প্রাচীন পৌণ্ড্রদের বংশধর বলিয়া দাবী করেন এবং পদ্মরাজ, পোদ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি নামে নিজেদের পরিচিত করেন তাঁহারা আজ ব্রাহ্মণদের কাছে পতিত বলিয়া গণ্য! এই যে বাঙ্গলার সামাজিক পট সেনযুগ হইতে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, সেই নির্ম্মম পরিবর্ত্তনের কোন স্মৃতিই বাঙ্গলা সাহিত্যে নাই। তৎপরে ব্রাহ্মণাধিপত্যের যুগে আমরা উচ্চশ্রেণীর শৈবধর্ম্ম ও গণ শ্রেণীদের ধর্ম্মের সংগ্রাম 'মনসার ভাসান' পুস্তকে দেখিতে পাই।

ঐতিহাসিকদের মতে বাঙ্গলার পালরাজারা মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা বুদ্ধ ভট্টারকের নামে ব্রাহ্মণদের দান করিতেন (মদন পালদেবের মনহলি, লিপি), "আর ভগবান সিদ্ধার্থদেবের সিদ্ধি প্রজাবর্গের সর্ব্বোত্তম সিদ্ধি বিধান করুক" (ধর্ম্মপালের খালিমপুর লিপি) বলিয়া অনুশাসন প্রদান করিতেন। এই মহাযানেরই একটী শাখার নাম ছিল "মন্ত্রযান"; এই সম্প্রদায়টি তান্ত্রিক নাগার্জ্জন, কাহ্নুপাদ, সরোরুহপাদ, শবরী ও তাঁহার দুই ডাকিনী (সিদ্ধা যোগিনী, প্রকৃতি বা শক্তি) গুণি ও লোগী, মীননাথ, মচ্ছেন্দ্রনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধেরা ভারতে সর্ব্বত্র তন্ত্রের প্রচার করিতেন ও আলকেমী দ্বারা পিত্তলকে সোনাকরা, পারাভস্ম দ্বারা ব্যাধি আরোগ্য করা, চক্ষুর ঔষধ আবিষ্কার করিয়া ব্যায়রাম আরোগ্য করান, অমৃতসিদ্ধি, আকাশে উড়িয়া যাওয়া প্রভৃতির অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করিয়া নিজেদের সিদ্ধত্ব প্রদর্শন করিতেন এবং শেষে সশরীরে স্বর্গে অন্তর্ধান করিতেন। এই সব যোগীদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তীর্থিক তান্ত্রিকেরা (অ-বৌদ্ধ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদীয় তান্ত্রিকেরা)। ইহাদের সিদ্ধির তেজাপেক্ষা বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সিদ্ধির তেজ বেশী ছিল বলিয়া বৌদ্ধেরা দাবী করিতেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ম্যাজিক (অলৌকিক ক্রিয়া) বেশী কার্য্যকরী হইত বলিয়া তাঁহারা গর্ব্ব করিতেন। কিন্তু এই সব দলের মতের কলহ

বাঙ্গলা সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হয় নাই। ব্রাহ্মণ্যবাদীয়েরা তাঁহাদের তন্ত্রমত সংস্কৃতে লিখিয়াছেন, বৌদ্ধেরাও তদ্রূপ হয় সংস্কৃত না হয় তৎকালের প্রাকৃতে লিখিয়াছেন।

এই সময়ে "সহজ যান' নামে আর একটি শাখা মহাযান হইতে বিনির্গত হয়। তাঁহাদের মত যাহা তৎকালীন অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত হয়, তাহাই ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দ্বারা "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা" বলিয়া প্রকাশিত হয়। এই সব ধর্ম্ম কলহের কোন সংবাদ আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যে পাই নাই। এই মন্ত্রযানী বৌদ্ধদের কার্য্যের সংবাদ তিব্বতের লামা তারানাথ (ইনি ত্রিপুরা জেলার শূদ্রবংশীয় সিদ্ধ জ্ঞান মিত্রের প্রশিষ্য) তাঁহার "মণিকের খণি"+ নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য আমরা ইঁহাদের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কিন্তু হালে "গোরক্ষ বিজয়" ও "মীন চেতন" নামে পুস্তকসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্তর্গত এবং মহাযানী বৌদ্ধদের কিঞ্চিৎ সংবাদ প্রদান করে। এই সব সংবাদে আমরা 'হাড়ীপ্পা,' 'কানফা' নামক নীচ বংশীয় সিদ্ধদের রাজবংশে গুরুগিরি করিতে দেখি। বৌদ্ধদের পুস্তক হইতে আমরা এই তথ্য সংগ্রহ করি যে এই সব সিদ্ধদের অনেকে নীচ-বংশীয় ও শূদ্রবর্ণের ছিলেন এবং প্রচলিত সামাজিক আচার ভঙ্গ করিয়া জীবন যাপন করিতেন। জনসাধারণের উপরে তাঁহাদের প্রভাব ছিল।

এই যুগের সামাজিক শ্রেণীসমূহের অবস্থা অনুসন্ধান করিলে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদ পাই। বাঙ্গলার অভিজাতবর্গ হয় মহাযানী না হয় ব্রাহ্মণ্যবাদীয় তান্ত্রিক ছিল। আর গণ সমূহ হীনযান, সহজযান, নাম ধর্ম্ম ও অন্যান্য পন্থাবলম্বী ছিল। পরে, সেন রাজাদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণদের, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে বিশ্বাসী ও লোকের কদাচার দূরীভূত করিবার জন্য, রাজা লক্ষ্মণসেন ধর্ম্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ দ্বারা "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" ও পশুপতি দ্বারা

+ এই পুস্তক জার্ম্মানভাষার অধ্যাপক Gruenwedel—"Edelsteinmine" নামে ভাবান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পুনঃ, তাহা বর্ত্তমান লেখকের দ্বারা "Mystic Tales of Lama Taranath" নামে ইংরেজীতে ভাবান্তরিত হইয়াছে।

"মৎসসূক্ত" প্রণয়ণ করান। অবশ্য এই দুই পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়। প্রথম পুস্তক হইতে আমরা এই সংবাদ পাই যে বাঙ্গলার বারেন্দ্র ও রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণেরা বৈদিকাচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তান্ত্রিকাচারে নিমজ্জিত হইয়াছিল; আর দ্বিতীয়টিতে আমরা এই সংবাদ পাই যে, বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ব্যবহারিক আচার ও রীতি, কদাচার বলিয়া বর্ণাশ্রমীয়দের কাছে নিন্দনীয় হইত। এতদ্বারা ইহা স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় যে, বর্ণাশ্রমী এবং সনাতনী ব্রাহ্মণ্য শাসনাধীনে বাঙ্গলায় ধর্ম্মকলহের দুন্দুভী বাজিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এই ধর্ম্ম কলহের পশ্চাতে শ্রেণী সংঘর্ষ লুক্কাইত ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদীয় শাসনের প্রতিষ্ঠার সময়ে আমরা স্পষ্ট দেখি যে অভিজাতদের সহিত গণসাধারণের সংঘর্ষ হইতেছে। বাঙ্গলা সাহিত্যে ধর্ম্ম সংঘর্ষের নজীর পূর্ব্বোক্ত ছড়ায় যেমন পাওয়া যায়, এই যুগের সাহিত্যেও এই প্রকারের ধর্ম্ম-সংগ্রামের দৃষ্টান্ত আছে। এই সময়ের অভিজাতেরা হয় শৈব নয় শাক্ত ছিলেন, তাই "মনসার ভাসান" গ্রন্থে ধনী চাঁদ সওদাগর ঘৃণায় বলিতেছেন :—

"যে হাতেতে পূজি আমি দেবশূল পাণি।
সে হাতে পূজিব আমি কাণি চ্যাঙ্গমুড়ি॥"

পুনঃ, ছদ্মবেশী দেবতা বেহুলাকে বলিতেছেন :

"ব্রাহ্মণ না চিন তুমি বণিক জাতির দোষে।"

(নারায়ণ দেবের "পদ্মপুরাণ")

এইসব পুস্তকে শ্রেণী-সংঘর্ষকে ধর্ম্মসংঘর্ষরূপে প্রকট করা হইয়াছে। মনসাপূজা (মনসা বাঙ্গলায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই পূজা পাইতেছে) লোক-সাধারণ মধ্যে প্রচলিত ছিল, কিন্তু পৌরাণিক ধর্ম্মাবলম্বী অভিজাতেরা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া সাধারণের এই ধর্ম্মকে তাচ্ছিল্য করিত, সেই জন্য মনসাদেবীও নিজের শক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য ধনীদের প্রতিনিধি চাঁদ সওদাগরের প্রতি নির্য্যাতন আরম্ভ করেন। চাঁদও নাছোড় বন্দা, সে বলিল,

"যা করেন শিবশূল, এবার পাইলে কূল।
মনসারে বধিব পরাণে!"

কিন্তু অবশেষে মনসারই জয় হয়। এই আখ্যায়িকার মধ্যে আমরা এই তথ্য পাই যে বাঙ্গলার প্রাচীন কৌমগত ধর্ম্ম (Tribal Religion বা Animistic Religion) আর্য্যভাষীদের বেদপ্রসূত ধর্ম্ম দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইতেছিল ; আর্য্য সভ্যতাপ্রাপ্ত অভিজাতেরা নিজেদের কৃষ্টি লোক সাধারণের উপর চালাইতেছিল। কাজেই এই সংঘর্ষ ধর্ম্ম-সংগ্রামরূপে "ভাসান" গ্রন্থসমূহে পাই। এইসব পাঁচালী ও গ্রন্থসমূহ মধ্যে আমরা গণশ্রেণীগুলির সংবাদ পাই। এই যুগে ব্রাহ্মণ-দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যকে পুষ্ট করিতে দৃষ্ট হয় না। হালে, "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" বা (কৃষ্ণধামালী) নামে অনেক কৃষ্ণ-বিষয়ক গান আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা উত্তর বঙ্গে প্রচলিত ছিল। এইগুলি জনসাধারণের মধ্যে গীত হইত। কিন্তু এইগুলি মধ্য থেকে আমরা বাঙ্গলার সামাজিক কোন সংবাদ উদ্ধার করিতে পারি না। তবে এইটুকু বোধগম্য হয় যে বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গলায় চৈতন্যের পূর্ব্ব থেকেই ছিল। সম্ভবতঃ গণশ্রেণীর মধ্যে ইহার প্রসার হয়।

ঐতিহাসিকেরা বলেন, মুসলমান রাজারাই বাঙ্গলা সাহিত্যের স্রষ্টা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা গৌড়-প্রাকৃত ভাষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। মুসলমান রাজাদের প্রচেষ্টাতেই রামায়ণ প্রভৃতি বাঙ্গলায় লিখিত হয়। কবি কৃত্তিবাস বলিয়া গিয়াছেন গৌড়ের এক হিন্দু রাজার অনুজ্ঞাতেই তিনি রামায়ণ বাঙ্গলায় লিখিতে আরম্ভ করেন। আবার সম্রাট হুসেন সাহের সভাসদ গুনরাজ খাঁ "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" নামক গদ্যে এক বাঙ্গলা পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহার দেখাদেখি "রসুল-বিজয়" নামে এক পুস্তক সেখ চাঁদ নামক এক মুসলমান কবিদ্বারা লিখিত হয়। এই পুস্তক পাঠেই বোধগম্য হয়, কি প্রকারে হিন্দুকে মুসলমান করিয়া তাহাকে 'অভারতীয়' করা হইত। ইহাতে তৎকালের একটি চিত্র পাওয়া যায়। এই সমসাময়িক কালেই মহাভারত বিভিন্ন লোক দ্বারা বাঙ্গলা কাব্যে লিখিত হয়।

এইসব পুস্তকে আমরা তৎকালীন সামাজিক মনস্তত্ত্বের এক চিত্র পাই। কিন্তু এইসব সাহিত্য আদর্শবাদীয় ছিল, তজ্জন্য ইহারা Ideational লক্ষণ যুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। রামায়ণ ও মহাভারতের মূলের ওজঃ ও স্পর্দ্ধা অনুবাদে

নাই, স্বদেশ ও স্ববংশদ্রোহী বিভীষণ বাঙ্গলা রামায়ণে পরম বৈষ্ণব মহাপুরুষে পরিণত হইয়াছেন, বিধবা মন্দোদরী পুনরায় বিভীষণের ভার্য্যা হন; কারণ "রাজার স্ত্রীকে রাজায় নিবে, ইহা নহে অপরাধ।" এই বাক্য রামের মুখ দিয়া বাহির করা হয়। ইন্দ্রজিত মৃত্যুকালে বিভীষণকে স্বধর্ম্ম ও জাতিদ্রোহী বলিয়া অনুযোগ করে (মাইকেলের মেঘনাধ বধেই আসল অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে)। কিন্তু বাঙ্গলায় তাহা নাই। তখন হিন্দুর ঘর ঘর বিভীষণ হইতেছে, আর ভারতে বিজেতা রাজা বিজীতের রাণী ও অন্তঃপুর লুণ্ঠন অনেকদিন থেকেই করিতেছে; এইসব অনুষ্ঠান লোকের গা সওয়া ব্যাপার হইয়াছে। পুনঃ, তখন রাজত্বসমূহ কিয়ৎ দিনের জন্য সমৃদ্ধিশালীরূপে বিরাজ করিতেছে, তৎপরই বিজেতা আসিয়া তাহা ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। কীর্ত্তিবাসের রামায়ণে তাহার প্রতিবিম্ব পাই:

"লঙ্কায় আসিয়া দেখে ছিন্নভিন্ন সব।
নাহিক সে নৃত্যগীত নাহিক উৎসব।"

বাঙ্গলায় পাল ও সেন রাজাদের কীর্ত্তিচিহ্ন সমূহ বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের জনশ্রুতিও লোকে ভুলিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে যে করুণ সুর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন বাঙ্গলার বিজীত হিন্দুর মর্ম্মবেদনার প্রতিধ্বনিই তাহাতে পরিদৃষ্ট হয়। পুনঃ, এই যুগের রাজনৈতিক সামাজিকচিত্র আমরা বিজয় গুপ্তের "পদ্মাপুরাণ' গ্রন্থে পাই। তাহাতে বিজেতৃ শাসক-শ্রেণীর অত্যাচার বর্ণিত আছে, এবং সমসাময়িক সামাজিক চিত্রও তাহাতে পাওয়া যায়। এই প্রকারের সাহিত্যকে Mixed লক্ষণযুক্ত বলা হয়। বাঙ্গলার মুসলমান যুগের বড় সাহিত্যিক সৃষ্টি হইতেছে—বৈষ্ণব সাহিত্য। ইহা চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ হইয়া শ্রীচৈতন্যের শিষ্যদের দ্বারা পরিপুষ্ট। উত্তর-ভারতে হিন্দুর রাজনৈতিক পতনের পরই, বৈষ্ণব-সাহিত্যের আবির্ভাব হয়। পশ্চিমে হিন্দিভাষীদের মধ্যে রাজপুত বীরগাথা সমূহ "ডিঙ্গল" নামক উপভাষায় লিখিত হয়; কিন্তু হিন্দুর পতনের পর মার্জ্জিত "পিঙ্গল" ভাষায় (ব্রজ ভাষা) কৃষ্ণ-বিষয়ক ধর্ম্মসংক্রান্ত গাথা সমূহ রচিত হইতে থাকে। এতদ্বারা ব্রজভাষায় একটী মহান

বৈষ্ণবসাহিত্য সৃষ্টি হয়। তদ্রূপ পূর্ব্বে, মৈথিলী ভাষায় বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের অভাবে শ্রীমতীর বিরহ বিষয়ক পদাবলী রচনা করিতে থাকেন। সেই সময়ে বাঙ্গলায় চণ্ডীদাসও রাধার বিরহ বিষয়ে পদাবলী লিখিতে থাকেন। সমালোচকেরা বলেন, পূর্ব্বোক্ত অনেক কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পদসমূহ মার্জ্জিত করিয়া চণ্ডীদাস স্বীয় পদাবলীতে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহাই হউক, মুসলমান বিজয়ের পরই আমরা উত্তর ভারতে বৈষ্ণব-সাহিত্য রচিত হইতে দেখি।

এক্ষণে কথা, এই বৈষ্ণব-সাহিত্যের স্বরূপ কি? ইহা গুপ্তসম্রাটদের যুগের, বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাহিত্য নয়। এই সাহিত্যের তথ্য হরিবংশ ও শ্রীমদ্ভাগবতগীতার সহিত এক নয়। ইহা রাজনীতিককার দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণকে জানে না। ইহা "চিকণ কালা, গলায় মালা, বাজে নুপুর পায়ে" (মহাজন পদাবলী) কৃষ্ণের কথাই জানে। ইহা বৃন্দাবনের বালগোপাল, যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর প্রেমিকের প্রেম বর্ণনায় পূর্ণ। এই সাহিত্যে উভয়ের প্রেম, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনের সঙ্গীত আছে। একদল গবেষক, বলেন, এই নব-বৈষ্ণব ধর্ম্মে ও সাহিত্যে মুসলমানীয় সুফীদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুফীতত্ত্বীয় আশক্ ও মাসুকের প্রেমকেই হিন্দু আকারে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম কাহিনীতে সমূর্ত্ত করা হইয়াছে। এই বিষয়ে যে সত্যই থাকুক, এইস্থলে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হইতেছে, হিন্দুর মধ্যে কেন নব-বৈষ্ণব ধর্ম্মানুযায়ী সাহিত্যের উদ্ভব হয়। উত্তরের হিন্দুর পরাধীনতার কালেই এই সাহিত্যের উদ্ভব দেখিয়া তাহার বিশ্লেষণ করিলে আমরা হিন্দুর পরাধীনতার মনোবেদনাই ইহাতে পরিস্ফুট হইতে দেখি। শ্রীমদ্ভাগবতে রাধা নাই, জয়দেবে রাধা আছে কিন্তু অন্যরূপে আছে। অন্য দিকে চণ্ডীদাস হইতে খাঁটি বাঙ্গলা সাহিত্যে আমরা ক্রন্দনরতা বিরহী রাধার আবির্ভাব হইতে দেখি। রাধার বিরহই পরাধীনতার যুগ হইতে বৈষ্ণব সাহিত্যে বড় স্থান অধিকার করে। এই সাহিত্যের প্রতিপাদ্য হইতেছে, রাধার অভিসার এবং প্রিয়ের অদর্শনে বিরহ, অবশেষে পুনর্মিলন। এই পদাবলীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিলে দুই অর্থই ধরা পড়ে। হতাশ প্রেমিকা যে বিলাপ করিতেছেন, তাহা হতাশ স্বদেশ

প্রেমিকের বিলাপ রূপেও গ্রহণ করিতে পারা যায়। চণ্ডীদাসে প্রেমিকা বলিতেছেন—

"সুখের লাগিয়ে এ ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল...
সাগর শুখাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম দোষে"।

এই দুঃখ হতাশ স্বদেশপ্রেমিকও করিতে পারেন। এই যুগে পরাধীনতার মনোবেদনা ধর্ম্মের ভাষায় প্রিয়জনের অদর্শনে (স্বাধীনতার বিলুপ্তি) বিরহীর (হিন্দুজাতি) মাথুরের (বিচ্ছেদ) হা-হুতাস ক্রন্দনের মধ্য দিয়া প্রকট হইয়াছে। যখন বিদ্যাপতি গাহিলেন—

"হরি কি মথুরা পুরে গেল,
আজ গোকুল শুন্য ভেল।
রোদিতি পিঞ্জরে শুকে,
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে।
অবসোই যমুনার কুলে।
গোপগোপী নাহি বুলে॥"

তখন স্বাধীনতার বিলুপ্তি কি এই বিরহের অবিদিত মনে (Unconscious mind) কার্য্য করে নাই? বিদ্যাপতির মাথুর বাঙ্গলার মহাজন পদাবলীতে আরও বিষদভাবে পরিস্ফুট হয়। সেই জন্য ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "বৈষ্ণবের মাথুর গান...অপর দিকে বঙ্গের তৎকালিক ইতিহাস সেই বিয়োগান্ত দৃশ্যের উপাদান যোগাইয়াছে। কত বিয়োগান্ত নাটকের সার নিংড়াইয়া যে "মাথুর" গান রচিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে।...বিজয় সেনের (প্রথম সেনবংশীয় রাজা) প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী প্রমোদ উদ্যানে অভিসারিকাগণ...যে লীলা করিয়াছিলেন, জয়দেবের চক্ষে ছিল সেই দৃশ্য। কিন্তু পরবর্ত্তী কবিগণের শ্রেষ্ঠ নায়িকার নিরাভরণা যোগিনীর বেশ...কৃষ্ণবিরহে তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগিণী...এই 'সর্ব্বত্যাগিণীর নিরাভরণরূপ

তখন বঙ্গের আকাশে বাতাসে খেলিতেছিল" (বৃহৎ বঙ্গ—২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৯৮—৯৯৯)।

পরাধীনতার শৃঙ্খল যে তৎকালীন হিন্দু ভাবুকের মনে জগদ্দল পাথরের চাপ বসাইয়াছিল, তাহা জয়দেবের ও চণ্ডীদাসের কল্কি অবতারের বর্ণনার পার্থক্যেই প্রকাশ পায়। যে স্থলে জয়দেব গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং" সেই স্থলে চণ্ডীদাস গাহিলেন,

"পুন তা ত্যজিয়া, কল্কি অবতার
ধরেন মূরতি কায়া
অশ্বের উপরে, ধরি দুই করে,
সংহার অনুপ ছায়া ॥"

এতদ্বারা আমরা দেখি ভাবধারা কত সঙ্কুচিত হইয়াছে। আবার, পরবর্ত্তী সাধক কবি যখন গাহিলেন,

"আজি কালি করি, দিবস গোঙইতে,
জীবন ভেল অতি ভার ॥

* * *

দিবস দিবস করি, মাস বরখি গেল,
বরিখে বরিখে কত ভেল ॥"

(জ্ঞানদাস পদাবলী)

তখন আমরা ইহাতে স্বদেশ প্রেমিকের আক্ষেপেরই প্রতিধ্বনি বলিয়া অনুমান করি। ফলতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতিজনিত ব্যবহারিকদুঃখ যাহা কবিদের অবিদিত মনে পুঞ্জীভূত ছিল, তাহা পদাবলীর মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই অনুষ্ঠান জগতে নূতন নহে। পারস্যেও আরব আক্রমণের পরে সুফী-বাদের উদ্ভব হয় এবং মঙ্গোল আক্রমণে পারস্য জর্জ্জরিত হইবার পর অতিন্দ্রীয়বাদী সুফী কবিদের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়।

এই সঙ্গে বাঙ্গলায় চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব আন্দোলন যখন গঠনমূলক কার্য্য-

দ্বারা সংঘবদ্ধ হইতে লাগিল, তখন আমরা একটা নূতন সুরধ্বনিত হইতে দেখি। ভক্ত দেবকীনন্দন গাহিলেন—

"জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব বর্ণনে···
যত যত হীনজাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব।
সভারে বন্দিব,
সভে জগত দুর্ল্লভ"
(বৈষ্ণব বন্দনা)।

পুনঃ, দীন কৃষ্ণদাস গাহিলেন—

"ব্রাহ্মণে যবনে মিলি, করাইল কোলাকুলি,
পরতেকে দেখ একবার"।

বাঙ্গলার বৈষ্ণব সাহিত্যকে আমরা সনাতনী প্রথা মতে Idealistic এবং সোরোকিনের ভাষায় Ideational বলিয়া গণ্য করি।

এইসব সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গলার সমাজে চৈতন্য নিত্যানন্দের আন্দোলন কি প্রকারে খাম্বিরের (Ferment) ন্যায় কার্য্য করিয়া একটা নূতন ভাবধারার উদ্ভব করিতেছিল তাহা আমরা জানিতে পারি। পুনঃ, এই সময়কার বৈষ্ণব সাহিত্যে বাঙ্গালীত্বের গর্ব্ব (Chauvinism) লক্ষিত হয়। এখনকার বাঙ্গলা আর বৈদিক ঋষিদের গালির পাত্র নয় এবং স্মৃতির অনুজ্ঞানুযায়ী বর্জ্জনীয় নহে। এখনকার বাঙ্গলাকে "পুণ্যময় স্থান" বলা হইয়াছে ('চৈতন্য ভাগবত'); আর জৈনতীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান মহাবীর বর্ণিত জঙ্গলপূর্ণ রাঢ় দেশ বহুদিনই অন্তর্হিত হইয়াছে। খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে ভবদেবভট্ট বালবলভী রাঢ়কে আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত বলিয়াছেন (Inscription of Bengal Vol III), এবং সমসাময়িক শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র অত্যুত্তম গৌড় রাষ্ট্রের অন্তর্গত রাঢ় দেশ বলিয়াছেন, ("প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক") আর চৈতন্য ভাগবতে "রাঢ়দেশের গ্রামসব দেখিতে সুন্দর" বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। পুনঃ, "ভক্তি-রত্নাকর" নামক বৈষ্ণব পুস্তকে হিন্দুর সব দেবদেবীও ঋষি এবং অবতারেরা নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্যের জন্মস্থানকে প্রণতি করিয়াছেন। এই সময়ে, বর্ত্তমান বাঙ্গলার

হিন্দু সমাজ গঠিত হইতেছে, লেখক এই যুগকে বাঙ্গলার সমাজের দ্বিতীয় সমীকরণকাল (Second Social Integration) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাই বাঙ্গালী Chauvinism এই যুগের সাহিত্যে কিঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সম্পর্ক বিষয়ের একটী বিশিষ্ট সংবাদ তৎকালীন বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায়। কাজী যখন মুলুকপতির কাছে ঠাকুর হরিদাসের বিপক্ষে নালিশ করেন তখন মুলুকপতি বলিতেছেন :

"আমরা হিন্দুরে দেখি নাই খাই ভাত।
তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশ জাত॥"

(চৈতন্য ভাগবত, আদিকাণ্ড, ১৬।৭২)

এতদ্বারা দৃষ্ট হয় যে মুসলমানদের হিন্দুর সঙ্গে খাইতে আপত্তি ছিল। ইহাতে শ্রেণী লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মুসলমান শাসনের প্রাক্কালের বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে, দেশের জন সাধারণ নানা প্রকারের পালা গান শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইত। চণ্ডী ও মনসার "মঙ্গল" কাব্য ও গীতিকাসমূহ সমগ্র বাঙ্গলায় নানা কবির দ্বারা লিখিত হইয়া গীত হইত। একই মনসার মাহাত্ম্য বর্ণনাজন্য, চাঁদ সওদাগর ও তৎপুত্র লখীন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু এবং পত্নী বেহুলাদ্বারা দেবীর প্রসাদে পুনঃ জীবিত করার গল্প পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গে নানা কবির দ্বারা নানা ভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহার পর, পূর্ব্ব-বঙ্গের নানা গীতিকামধ্যে রাজনীতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়া নানা গীতিকাব্য লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় নানা রাজনীতিক ও সামাজিক সম্বন্ধীয় কাহিনী ও কবিতা এখনও প্রচলিত আছে। বাঁকুড়া ও রঙ্গপুর জেলাদ্বয়ের এই প্রকারে বহু তথ্য অনিসন্ধিৎসুদের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সে সব আজও মুদ্রিতাকারে লোকের চক্ষুগোচর হইতে পারিতেছে না।

এই সঙ্গে ইহা বক্তব্য যে বাঙ্গলার সামন্ততান্ত্রিক যুগের গীতিকাব্য বা কবিতাসমূহ এখনও অনিসন্ধিৎসুদের কর্ণগোচর হয় নাই। নিশ্চয়ই রাজপুতনার চারণ-গাথার ন্যায় বাঙ্গলাতেও যুদ্ধ-বিগ্রহের গল্প ও গাথা রচিত হইয়াছিল।

দশম বা একাদশ খৃষ্টীয় শতাব্দীর ঈশ্বর ঘোষের তাম্রলিপিই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আজও রঙ্গপুরে মহীপালের পালাগান মুসলমান গায়কদের দ্বারা গীত হয়, আজিও ময়ূরভঞ্জে পালরাজাদের গান গীত হয়। (N. N. Vasu "Buddhism in Modern Orissa, Preface দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সেনরাজদের সময়ের কোন পালাগান আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই, হয়ত বা রচিতই হয় নাই। কেবল সংস্কৃত ভাষায় "বল্লাল-চরিত" রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যের সময়ে তাহা শেষ হয় বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিকতা কতটা প্রামাণিক তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোনও উপায় নাই। ইহা সত্য যে, এই যুগে তুর্কি-আক্রমণ ও তাহাদের শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনীর বড়াই করিবার অবকাশ ছিল না কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। দনুজ মাধব (দশরথ) দেবের তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, পরের শতাব্দীর দনুজমর্দ্দন দেব ও তৎপুত্র মহেন্দ্রের টাকা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র আবিষ্কৃত হইতেছে। এই যুগেই গৌড়ের স্বাধীন নরপতি গনেশের আবির্ভাব হয়। এই সব রাজনীতিক সুবিধা সত্ত্বেও বীরগাথা বাঙ্গলা ভাষায় রচিত হইল না ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। হঠাৎ বাঙ্গালীর বীণা কেন নীরব হইল তাহার সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রয়োজন।

এই যুগে অর্থাৎ মোগল শাসন বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলায় "বীর গাথা" রচিত হইবার পরিবর্ত্তে বিভিন্ন "কুলুজী" গ্রন্থ বিরচিত হয়। ইহার সংগৃহীত পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এইসব পুস্তক কেবল "জাতি মারা" গল্পেই পর্য্যবসিত! তদ্দ্বারা তৎকালের ব্রাহ্মণ সমাজের ভয়াবহ অবস্থা বেশ বোধগম্য করা যায়। সকলেই ভীষণ স্পর্শদোষ ভয়ে ভীত। হিন্দুজাতির আর কোন উদ্যম নাই, কেবল কি প্রকারে "জাতি" রক্ষা করা যায় তাহার চেষ্টাতেই সমাজের লোক ব্যস্ত! এতদ্দ্বারা একটা ভীষণ ছুঁচি বাই যেন জাতিকে পাইয়া বসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় এই ছুঁচি বাই ভারতে অন্য কোন প্রদেশে আবির্ভূত

হয় নাই। বিধর্ম্মীর খাদ্যের গন্ধ শুঁকিলে বা তাহার অঙ্গের সহিত নিজ অঙ্গের স্পর্শ হইলে লোকের জাতিনাশ হয় এই বিধান হিন্দুর শাস্ত্রে নাই, হিন্দুসমাজের অন্যত্রও নাই। এই অনুষ্ঠানের ধর্ম্মের ভিত্তি যখন নাই, তখন ইহার মূল ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যায় দেখিতে হইবে।

এই ব্যাপার সম্বন্ধে নবদ্বীপের এক অতি বৃদ্ধ শ্রীপাদগোস্বামী লেখকের কাছে যে আলোক সম্পাত করিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন, মুসলমান বাদশাহদের কাছে হইতে উৎকোচ খাইয়া অনেক ব্রাহ্মণ লোকদের জাতিচ্যুত করিয়া বেড়াইত। এই বিষয়ের প্রমাণও আছে এবং সেই বিষয়ে এক সময়ে তিনি সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন বলিয়া লেখককে বলেন। কথাটা অসম্ভব নয়, অনেক ব্রাহ্মণ বাদশাহদের কাছ হইতে "লাখেরাজ" জমি ও মোগল যুগে "মদত্‌মাস" জমি প্রাপ্ত হইত। ইহা তাহাদের পাট্টাতেই প্রমাণিত হয়। ইহা আশ্চর্য্যের কথা নয় যে, পরাধীনতার যুগে একদল ধূর্ত্তলোক উৎকোচ খাইয়া অজ্ঞ লোকদের এই প্রকারে জাতি মারিত। এই যখন অবস্থা তখন, স্থানীয় বীরদের গাথা ও প্রসিদ্ধ লোকদের পালাগান রচনা করিবে কে? সামন্তেরা, ভূস্বামীরা নিজেদের স্থায়িত্ব বিষয়েই সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত (সপ্তগ্রামের রাজা হিরণ্য দাস ও ঠাকুর হরিদাসের জমিদার রামচন্দ্র খানের অবস্থাই ইহার প্রমাণ)। কাজেই অস্থায়ী সামন্তের বিষয়ে পালা গান গাহিবার উদ্যম কোন স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া লোকে করিবে? তৎপর সাধারণ গৃহস্থ জাতি রক্ষার চেষ্টাতেই ব্যস্ত। এতৎব্যতীত, একটা বড় কথা, তৎকালীন সমাজের অভিজাতেরা বৌদ্ধ কৃষ্টির সর্ব্বচিহ্ন বাঙ্গলা হইতে মুছিয়া ফেলিতে বাধ্য হন; এই বিষয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ভূস্বামীও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সহযোগে কার্য্য করিয়াছেন।

নগেনবাবু বলিয়াছেন কান্দি রাজবাটীর কারিকায় লিখিত আছে :—

"বৈদিক আচারে রাজা মহা সুখী হৈল।
বৌদ্ধাচারিগণ প্রতি নির্য্যাতন কৈল॥"

(উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড)।

অন্যদিকে, স্বাধীন পূর্ব্ববঙ্গের সংবাদ কৃত্তিবাসই বলিয়া গিয়াছেন,

"পূর্ব্বেতে আছিল শ্রীদনুজ (বেদানুজ) মহারাজা।
তার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভোগে ভূঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার।"

এতদ্বারাই বোধগম্য হয় যে তুকি আক্রমণের পর, হিন্দু জনসাধারণে কি অবস্থা হইয়াছিল। কাজেই বীরগাথা বা পালা গান কোন হৃদয় হইতে উত্থিত হইবে? তৎপর, ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারীরা বলেন, মানসিংহ ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ী-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণদের মোগলের বিপক্ষতাচরণকারি কায়স্থ সামন্তদের বিপক্ষে লাগান। রাঢ়ীব্রাহ্মণেরা সেই সময় হইতে বিত্তশালী শ্রেণীরূপে গণ্য হন (৺রজনী চক্রবর্ত্তী 'গৌড়ের ইতিহাস' এবং ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবন্ধাবলী, ৺কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মধ্য যুগের বাঙ্গলা' দ্রষ্টব্য)। অনেক রাঢ়ী ব্রাহ্মণ জমিদার হইলেন, অনেকে ভূমিদান পাইলেন ইত্যাদি। কাজেই কবিকঙ্কন যে মানসিংহকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইয়া তাঁহার পুস্তক উৎসর্গ করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। মানসিংহ এবং তদানীন্তন মোগল গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গলার পূর্ব্বের অভিজাতশ্রেণী ধ্বংস করিয়া নূতন একটি তাঁবেদার অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করেন এবং হিন্দীভাষী পশ্চিমের হিন্দুদের বাঙ্গলায় বাস করান, যাহাতে ভবিষ্যতে আর বিদ্রোহ না সমুত্থিত হয়। এই সব শ্রেণী সংঘর্ষের সংবাদ আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যে পাই না। তৎকালীন হিন্দুর পরাজিত মনস্তত্বই আমরা কবিকঙ্কনে ও তৎপরবর্ত্তী সাহিত্যে পাই।

অন্যদিকে কবিকঙ্কনের চণ্ডীকাব্যে পশ্চিম বাঙ্গলার তৎকালীন একটি বাস্তব (realistic) চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে নিখুঁত ভাবে পশ্চিমে বঙ্গের সামাজিক চিত্র পাওয়া যায়। ইহাতে ডিহিদার মামুদ সরিফ নামক মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচার, হিন্দুজমিদার দ্বারা বিপন্ন ব্রাহ্মণকে আশ্রয় প্রদান করা, বেণে জাতির সামাজিক প্রথা, ধনীর ধনগর্ব্ব প্রসূত ধর্ম্মতত্ব, ব্যবসায় উপলক্ষে ব্যবসায়ীর সিংহলে গমন, বণিকপুত্রের সিংহলের রাজকুমারীকে বিবাহ,

কালকেতুর রাজধানীতে বিভিন্ন জাতির বাসস্থান, নির্দ্দেশদ্বারা হিন্দু ও মুসলমান জাতিদের চিত্র, পর্ত্তুগিস বোম্বেটেদের অত্যাচার, কারণ "রাত্রিদিন বহে যায়, হার্ম্মাদের ডরে," ইত্যাদি অনেক বাস্তব ও অবাস্তব চিত্র প্রচত্ত হইয়াছে। এই সময়কার সমাজচিত্রের মধ্যে জমিদারের কর্ম্মচারীদের অত্যাচার কবি চণ্ডীর কাছে পশুদের আক্ষেপ মধ্য দিয়া, তৎকালের বাঙ্গলার রাজনীতিক—সামাজিকচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যথাঃ ভালুক বলিতেছে—

"নেউগি চৌধুরী নহি না রাখি তালুক"

পুনঃ দরিদ্রগণের সংবাদ কবি বারমাসই "অভাগী ফুল্লরাকরে উদরের চিন্তা" দ্বারা আমাদের জানাইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে যদিও বাঙ্গলায় সামন্ততন্ত্রের অবসান হইয়াছিল, তত্রাচ সেই প্রাচীন যুগ হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিতেরা যে খাত কাটিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়া কবিকঙ্কণের চণ্ডীও প্রবাহিত হয়। সেইজন্য যেমন একদিকে চণ্ডীর মহিমা বাড়াইবার জন্য কালকেতু নামক অস্পৃশ্য ব্যাধকে রাজা সাজাইয়াছেন, তেমনই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবধারা নকল করিয়া রাজাধিরাজ কলিঙ্গরাজকেও খাড়া করিয়াছেন, আর কালকেতু হইয়াছেন তাঁহার সামন্ত। কিন্তু তৎকালের হিন্দুর পরাজিত মনস্তত্ব অনুসারে কালকেতুকে যুদ্ধকালে স্ত্রীর পরামর্শে প্রাণের ভয়ে ধানের মরাইয়ের মধ্যে লুক্কাইত করাইয়াছেন।

মুকুন্দরামে তৎকালীন রাজনীতিক ও সামাজিক সংঘর্ষের সংবাদ নাই বটে, কিন্তু এইকাব্যে কায়স্থ ভাঁড়ুদত্তকে যে ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে তদ্বারা কি ইহা প্রতীত হয় না যে তৎকালীন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের শ্রেণী সংঘর্ষ এবং মোগল দ্বারা কায়স্থের দুর্দ্দশাকরণ, রাঢ়ী ব্রাহ্মণ কবির অবিদিত মন থেকে তাহারই প্রতিধ্বনিরূপে এই বর্ণনা নিসৃত হইয়াছে! ইহাকে আমরা সনাতনী মতে Realist-impressionist এবং সোরোকিনের মতে Sensate সাহিত্য বলিতে পারি।

মুকুন্দরামের পর, বাঙ্গলা ভাষার বড় কবি ভারতচন্দ্র। ইনি সুবেদার

আলীবর্দ্দীখাঁর সমসাময়িক ব্যক্তি। ইঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যে আমরা প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের ছাপ দেখিতে পাই। ইনি তৎকালের কৃষ্ণনগরের জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রিত ব্যক্তি ছিলেন, সেইজন্য মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ বর্ণনাকালে তাঁহাকে বড় করিয়া অঙ্কিত করা স্বত্বেও অনেক ঐতিহাসিক ব্যাপার গোপন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হয়। ইহার কারণ, প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী ও পরে তাঁহার পতনে মানসিংহ দ্বারা পুরস্কৃত ভবানন্দ মজুমদারই কৃষ্ণনগরের জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তত্রাচ তৎকালীন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কিঞ্চিৎ তাঁহার লেখার মধ্য দিয়া ধরা পড়ে। যুদ্ধের বর্ণনা কালে যখন তিনি বলিয়াছেন,—

"বুঝিয়া অহিত, গুরু পুরোহিত,
মিলে মানসিংহ সনে"।

তখন আমরা কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের শ্রেণী সংঘর্ষ ও মোগল দ্বারা রাঢ়ী ব্রাহ্মণকে কায়স্থের বিপক্ষে লাগাইবার তথ্যের ইঙ্গিত পাই। এই যুদ্ধ বর্ণনার একটি বিশেষ তথ্য হইতেছে যে ইহাতে সেই যুগের হিন্দুর defeatist mentality প্রকাশিত হইয়াছে, তাই কবি বলিয়াছেন :

"পাতশাহি ঠাঠে কবে কেবা আঁটে
* * *
বিমুখী অভয়া, কে করিবে দয়া,
প্রতাপাদিত্য হারে"।

সাহিত্যমধ্যে এই যুগের লক্ষ্য করার বস্তু এই যে, এই যুগের সাহিত্যিকের এই সাহিত্যকে সনাতনী ভাষায় Realistic-impressionist এবং সোরোকিনের ভাষায় আমরা Mixed বা Idealist সাহিত্য বলিতে পারি। বাঙ্গলা ভাষায় একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য রচনা করিলেও সেই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যিকদের ছাপমুক্ত তাহারা হইতে পারে নাই। তদানীন্তনের ব্যবহারিক বিষয়ের চিত্র তাঁহাদের কাব্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই, তাই ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের সহিত মোগলের যুদ্ধে "সৈন্যেরা মুচড়িয়া গোঁফে শূলশেল লোফে" বলিয়াছেন।

আর একজন সাহিত্যিক সংস্কৃতে প্রতাপাদিত্যের জীবনী রচনাকালে "চন্দ্রবাণ, বায়ুবাণ" প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। এই কালের ঘনরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার ধর্ম্মপুরাণে লাউসেনের কীর্ত্তি গাহিতে গিয়া সংস্কৃত মহাভারতের ঢং তাহাতে ঢুকাইয়াছেন। এতদ্বারা একদিকে যেমন চিন্তা শক্তির অনুর্ব্বরতার পরিচয় প্রদান করে, অন্যদিকে সনাতন ধারাকে অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টাও এই সব ব্রাহ্মণ লেখকদের মধ্যে ছিল বলিয়া অনুমান হয়। এতদ্বারা এইসব লেখকদের কাল ব্যতিক্রম (Anachronism) দোষযুক্ত হইতে দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ, সময়ের বস্তুতান্ত্রিকাবস্থার চিত্র না দিয়া অতীতের ভাবধারা দ্বারা তাঁহারা নিজেদের ভাব ও লেখার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। এতদ্বারা তাঁহাদের সাহিত্যে আমরা প্রগতির নিদর্শন পাই না। এই জন্যই জার্ম্মান সমাজতাত্ত্বিক Oswald Spengler বলিয়াছেন যে, গ্রীক, হিন্দু প্রভৃতি প্রাচীন জাতিরা space and time (জায়গা ও সময়) অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছিলেন।

বাঙ্গলায় তুর্কি-মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর থেকে বাঙ্গলায় শক্তি পূজার বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। ভূদেববাবু প্রভৃতি বলিয়া গিয়াছেন, "হিন্দু ধর্ম্ম গুরুরা তাঁহাদের শিষ্যদের শক্তি উপাসক হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন"। "মার্কণ্ডেয় পুরাণ" হইতে সুরথ রাজার দূর্গা পূজার অধ্যায়টি পৃথক করিয়া "চণ্ডী" নাম দিয়া বাঙ্গলায় প্রচার করা হয়। যে সুরথ রাজার রাজধানী "কোলবিধ্বংসীরা" বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল, সেই রাজা মহাকোশলের কান্তারে এক ঋষির উপদেশে অকালবোধন করিয়া শক্তি পূজার দ্বারা স্বীয় রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। এই পূজার উদ্দেশ্য ষড়ৈশ্বর্য্য লাভ করা—"যশংদেহি' ধনংদেহি, দ্বিষোযোহি"—হইতেছে এই পূজার কাম্য। ইহা রাজসিক পূজা, এই শক্তি পূজা নাকি বাঙ্গলার হৃতরাজ্য হিন্দু অভিজাতদের অতিপ্রিয় হয়। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা" তাহার উপাসনাদ্বারা শক্তি আহরণ করাই ছিল এই শক্তিপূজার কাম্য। ইহার জন্য কয়েকজন আগমবাগীশ দ্বারা তন্ত্র পুস্তক সমূহ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হয়। এই শক্তিপূজা (শিবপূজা ইহার আনুষঙ্গিক)

অভিজাতদের পূজা। কবিকঙ্কনের "চণ্ডী" এই আন্দোলনেরই ফল স্বরূপ, বাঙ্গলায় এই দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে।

গৌড়ের সুলতানদের সময়ে বাঙ্গালীর ভাগ্যে যদি কখন কখন শিকা ছিঁড়িত, (কারণ তুর্কি ও পাঠানের সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া হিন্দু বাঙ্গলা ভোগ করিত) মোগল যুগে তাহা অসম্ভব হয়। সামন্ত রাজারা কর আদায়কারী ঠিকাদারে পরিণত হইলেন। কেন্দ্রীভূত মোগলশাসন বাঙ্গলার ক্ষত্রিয় শক্তির অবসান করায়। সেই সময় হইতে সর্ব্বদিক দিয়া নৈরাশ্যপূর্ণ সুর বাঙ্গলার সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মোগল যুগে বৈষ্ণব সাহিত্য পূর্ণতালাভ করে। এই সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের সুর মিশিয়া যায়। এই যুগের শতাবধি মুসলমান কবির বৈষ্ণব কবিতা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। সর্ব্বত্র একই সুর, একই রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম ও বিরহের ক্রন্দন। মোগল শাসন শৃঙ্খল বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমানের গলায় দৃঢ় ভাবেই বসিয়াছিল, উভয় সম্প্রদায়ের পুরাতন অভিজাতেরা বিনষ্ট প্রায়। "সীতারাম চরিত" গ্রন্থে (বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রণীত) উল্লিখিত আছে যে, যখন পাঠান ডাকাত বক্তার খাঁ সীতারামের কাছে "দ্বৈরথ" সমরে পরাজিত হয়, তখন সীতারাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন সে আর লড়িতেছে। তাহাতে তিনি উত্তর করেন, "কি করিব? স্বাধীনতা গেছে, আর করিবার কি আছে!" তখন সীতারাম বলেন যদি হিন্দু ও পাঠানে এক হয়? তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করেন, "তাহা হলে সবই হয়।" এই বক্তার খাঁই পরে সীতারামের প্রধান সেনাপতি হন, এবং সীতারামের রাজধানী মামুদপুরে আজও তাঁহার কবর আছে।

বাঙ্গলার যখন এই পরিস্থিতি তখন অতিন্দ্রীয়বাদ ও কৃষ্ণে সর্ব্ব সমর্পণ করার ভাব নৈরাশ্যপূর্ণ লোকের মনে স্বভাবতই জাগিয়া উঠিবে। হিন্দু কবি চণ্ডীদাস পূর্ব্বেই গাহিয়াছেন:

> "ধিক রহুঁ জীবনে যে পরাধীন জীয়ে।
> তাহার অধিক ধিক্ পরবশ হয়ে"।

দুইশত

এখন মুসলমান কবি নাসির মামুদ গাহিলেন :

"আগম নিগম বেদসার,
লীলায় করত গোষ্ঠ বিহার।
নাসির মামুদ করত আশ,
চরণে শরন দানরি"।

আর হিন্দু কবি (জ্ঞানদাস) গাহিলেন :

"সকল ছাড়িয়া মুঞি, শরণ লইনু গো ;
কি করিব ঘরের বসতি।...
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি"।

এক্ষণে অন্য প্রকারের সাহিত্যেও এই দশা। পূর্ব্বেই আমরা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের রাজনীতিকক্ষেত্রে হতাসতার ভাব পরিলক্ষিত করিয়াছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত "পাতসাহী ঠাঠে কবে কেবা আঁটে" এই ভাব বাঙ্গালীর মনে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। উদিতনারায়ণ ও সীতারামের স্বাধীনতার উদ্যম, শোভাসিংহ ও রহমৎ খাঁর সমবেত প্রচেষ্টা (ইহা সাধারণতঃ "বাগদী বিদ্রোহ" বলিয়া অভিহিত হয়) ইহার পূর্ব্বে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। অভিজাতদের এবং গণসমূহের প্রচেষ্টা বৃথায় গিয়াছে। কাজেই পরাজিত মনোবৃত্তি ভাবুকদের অভিভূত করিয়াছে। এমন কি বৌদ্ধ যুগের কাহিনী নিয়া লেখা "ধর্ম্মমঙ্গল"ও এই মনোবৃত্তির হাত এড়াইতে পারে নাই। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী ১৭১০ খৃষ্টাব্দে এই কাব্য রচনা করেন। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, এই কাব্যে অতীত বাংলার ও তৎকালীন বাঙ্গালার অনুষ্ঠানও বাস্তবাবস্থাজনিত মনস্তত্ত্ব উভয়ই বিজড়িত রহিয়াছে। একদিকে যেমন অতীত যুগের বাঙ্গালীর বীরত্বের প্রতিধ্বনি এই পুস্তকে আছে, অন্যদিকে সৈনিকের মুখ দিয়া মৃত্যুকালে ক্রন্দনের রোলও ইহাতে ধ্বনিত হইয়াছে।

ইহাতে বর্ণিত আছে লাউসেন যখন সম্রাট ধর্ম্মপাল দ্বারা গৌড়ে আহুত হইয়া কনিষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে পথ যাত্রা করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ এক ব্যাঘ্র আসিয়া

পথাবরোধ করে। সেই সময় কনিষ্ঠ পালাইয়া এক বৃক্ষারোহণ করিয়া আত্মরক্ষা করে। পরে, লাউসেন যখন ব্যাঘ্র বধ করিয়া পথ নিষ্কণ্টক করে, তখন ভাই আসিয়া বলে, আমি গৌড়ে গিয়াছিলাম তোমার সাহায্যে ফৌজ আনিবার জন্য। তাহাতে লাউসেন বলেন, "ভ্যালা মোর ভাইরে!" এতদ্বারা তৎকালীন এক ভীরু ও সেই সঙ্গে ধূর্ত্তলোকের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। আর একবার, সম্রাটের আদেশে অন্যত্র গমন করিবার কালে, তাহার চিরশত্রু ও মাতুল মহামদ সৈন্য নিয়া তাহার গড়ময়নাবতী অবরোধ করে। লাউসেনের 'কলিঙ্গা' নামক পাটরাণী অশ্বারোহণে শত্রু বিতাড়নে কেল্লা হইতে বহির্গত হন। শত্রুরা তাঁহাকে কিছুতেই পরাজিত করিতে পারে না, অবশেষে দুর্বৃত্ত মহামদ হুকুম দিল, "মোগল ও পাঠান সৈন্য দিয়া উহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া বন্দী করিয়া ফেল"। মামাশ্বশুর হইয়া এই হুকুম দিল, এই ক্ষোভে তিনি "হারিকিরি" করিয়া অর্থাৎ স্বীয় হস্তে পেট কাটিয়া ('অভিমানে হানিল জঠর') আত্মসম্মান রক্ষা করেন। তখন লাউসেনের তৃতীয় স্ত্রী "হরি পালের ঝি," "কানাড়া সুন্দরী" অশ্বারোহণে যুদ্ধে বাহির হন। ইনি হস্তস্থিত লম্বা টাঙ্গী দ্বারা মহামদের মস্তকচ্ছেদন করিতে উদ্যত হন, এমন সময়ে পার্ব্বতী দেবী অনুরোধ করিল, "মামা-শ্বশুরের প্রাণ বধ করো না।" মহামদ পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হইয়া পলায়ন করিল।

বাঙ্গালী মেয়ের অশ্বারোহণে যুদ্ধের এই গল্প ও আত্মসম্মান রক্ষা জন্য 'হারিকিরি' করা মেকলে ও স্টুয়ার্ট প্রভৃতির পুস্তক পাঠ করিয়া যাঁহারা স্বীয় জাতির অতীতের ইতিহাস নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে অবিশ্বাস্য ও গেঁজেলি গল্প বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু চক্ষের perception (দৃষ্টি) না হইলে, মনে conception (ধারণা) আসিবে কোথা হইতে? আগে percept পরে তাহার concept ইহাই মনোবিজ্ঞানের বিধান। বাঙ্গলার সার্ব্বভৌমাবস্থার শৌর্য্যের কাহিনী অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত, তাই বীররসের সংবাদ ইহাতে আছে। তৎপর, শাকা নামক কালু ডোমের সৈনিকপুত্রের রাত্রিকালে যুদ্ধ কালীন নিহত হইবার সংবাদ

আমরা এই পুস্তকে পাই। মৃত্যুকালীন শাকা ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে :—

"গলার কবচ মোর শিঙ্গাদার ধরধর,
দিও মোর যেখানে জননী।
নিশান অঙ্গুরী লয়ে ময়ুরার হাতে দিয়ে,
কয়ো তুমি হলে অনাথিনী।
শুকায় স্বর্ণ ছড়া, বাপেরে ও ঢাল খাড়া,
সমর্পিয়ে সমাচার বলো।
রণে অকাতর হয়ে, শত্রুশির সংহারিয়ে
সম্মুখে সংগ্রামে শাকা মলো।"

এই চিত্রে এক দিকে যেমন, বীরের বীরত্বের সংবাদ পাইতেছি, অন্য দিকে এই স্থানে কান্নার সুর ধ্বনিত হইতেছে। অতীত যুগের বীরত্বের গর্ব্বের সহিত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাস্তবিকতা এই স্থলে মিশ্রিত হইয়াছে। এই জন্য মামাশ্বশুর হইয়া "মোগল পাঠান" লেলাইয়া দিল আর মৃত্যুকালীন ঘর সংসারের জন্য ক্রন্দন, উভয়েই গ্রন্থকারের রচনাকালীন সময়ের মনস্তত্ত্বের ছাপ বহন করিতেছে। ৺দীনেশ চন্দ্র সেন উপরোক্ত বাঙ্গালী সৈনিকের ক্রন্দনের সহিত মাথুরের পদের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, মাথুরের "ললিতা লহ কঙ্কন, বিশাখা লহ অঙ্গুরী, চিত্রা লহ নীলমনি চুড়ি" ইত্যাদি পদ মিলাইয়া পড়ুন; বাঙ্গালীর রণক্ষেত্র ও কামকুঞ্জ একযুগে একই বিয়োগান্ত দৃশ্যের অবতারণা করিয়া ছিল। এইজন্য বঙ্গ সাহিত্যময় সর্ব্বত্র একই সুরের সাড়া পাইতেছি। (বৃহৎ বঙ্গ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৯৮-৯৯৯)।"

বাঙ্গলা ভাষায় ক্লাসিকাল সাহিত্য ব্যতীত গ্রাম্য সাহিত্য বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। সেগুলির মূল্যও কম নয়; তাহার মধ্যে অনেক স্থলে ঐতিহাসিক ও সামাজিক সংবাদ সমূহ লুক্কাইত আছে। উত্তর ভারতে যেমন পোশাকী বা সহুরে ভাষার পশ্চাতে গ্রাম্য 'ঠেঠ' হিন্দীতে কবিতা সমূহ মুখে মুখে প্রচলিত আছে এবং তন্মধ্যে অনেক সামাজিক সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়,

বাঙ্গালায়ও তদ্রূপ। বাঙ্গলার প্রত্যেক জেলায় অনেক প্রকারের জনশ্রুতি আছে যাহা লিখিত ইতিহাসের সঙ্গে মিলে না বা তাহার দ্বারা গ্রাহ্য নয়; কিন্তু এই সব জনশ্রুতি অতীতের কিঞ্চিৎ সংবাদ বহন করিয়া আজও আসিতেছে। ঐতিহাসিক সমালোচকেরাই দেখিবেন, ইহা বিচারসহ কি না।

এই সব গ্রাম্য গীতিকার একাংশ "পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এবং কতকগুলি গীতিকা ৺দীনেশচন্দ্র সেন দ্বারা "মৈমনসিংহ গীতিকা" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলি সবই মোগল যুগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার মধ্যে "দেওয়ান ইশা খাঁ", "দেওয়ান ফিরোজ খাঁ" ও "চৌধুরীর লড়াই" গীতিকা সমূহ আমরা সামন্ততান্ত্রিকযুগীয় যুদ্ধ বিগ্রহের সংবাদ পাই। তদ্রূপ, বাঁকুড়াতে প্রচলিত "চেতোবরদার লড়াই"। ইহা গড়-বেতার জমিদার শোভাসিংহ এবং বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের মধ্যে ঘটিয়াছিল। আশ্চর্য্যের কথা, যেটুকু বীরগাথার সংবাদ আমরা বাঙ্গলা ভাষায় পাইতেছি তাহা মোগলদের দ্বারা সামন্ততান্ত্রিক যুগ অবসানের পরই বিরচিত হইয়াছে। এই প্রকারে ভারতচন্দ্র দ্বারা "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ মোগল যুগের শেষ কালেই লিখিত হইয়াছিল। ইহার কারণ কি?

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে আমারা দেখি বৈষ্ণব সাহিত্য মোগল যুগের পূর্ব্ব হইতেই বিরচিত হয়। পুনঃ, বৈষ্ণব আন্দোলন একটা গণশ্রেণীয় আন্দোলনরূপ ধারণ করে। গণকে ধর্ম্ম দ্বারা জাগ্রত করিয়া তাহাদের ব্যবহারিক অবস্থার উন্নতি করাই ছিল এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য (১)। আর, এই সাহিত্যের লেখকগণ "জনের" লোক। কাজেই সামন্ত ও জমিদারদের শৌর্য্য বীর্য্য ও কীর্ত্তিকলাপের গুণ কীর্ত্তন করিবে কি? কিন্তু অনুমিত হয় মোগল যুগের মধ্যভাগে বৈষ্ণব সাহিত্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে ("প্রেমবিলাস" সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত হয়)। তখন যেসব কবি উদয় হইলেন, তাঁহারা অনেকেই জমিদারের আশ্রিত ব্যক্তি (মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র; মৈমনসিংহ গীতিকার কোন কোন কবিও

১। লেখকের "বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

এই প্রকারের ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়, তঁ:হাদের লেখার প্রতিপাদ্য বস্তু হইতেই তাহা ধরা পড়ে)। কাজেই তাঁহারা রাজরাজড়ার ঘটনাবলী স্বীয় স্বীয় মাতৃভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহারই ফলে আমরা বীর-গাথার কিঞ্চিৎ নিদর্শন ক্লাসিকাল ও পল্লী সাহিত্যে পাই। এই পল্লীগীতিকায় আমরা প্রচুর তৎকালীন সামাজিক সংবাদ পাই। একটিতে কবি বন্দনা কালে বলিতেছেন, "হিন্দু আর মুসলমান একই পিণ্ডর দড়ি।
কেহ বলে আল্লারসুল কেহ বলে হরি" (নুরন্নেহা ও কবরের কথা। পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ, ৯৪)। পুনঃ, আর একটিতে কবি বলিতেছেন: "মক্কামদীনা বন্দুলাম কাশী গয়া থান" (পীরবাতাসী: বন্দনা পৃঃ ৩৪১)। আবার আর একটি পালাতে অত্যাচারী রাজার বিরূদ্ধে প্রজাদের সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বিদ্রোহ করে তাহাকে হত্যা করার কথা আছে ("বীর রামায়ণের পালা," পৃঃ ৫৩০)। পুনঃ, "কঙ্ক ও লীলা" পালা করুণ বিয়োগান্ত রসে পূর্ণ। ইহাতে দৃষ্ট হয় যে মাতৃহারা ব্রাহ্মণ বালক চণ্ডালিনী দ্বারা পালিত হয়; কিন্তু পরে তাহাকেও হারায়। এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করিয়া রাখালের কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। তিনি এতটা সামাজিক উদারতা প্রদর্শন করেন। কঙ্ক নামে এই বালক প্রত্যহ চণ্ডালিনী মাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিত। কিন্তু যৌবন প্রাপ্ত হইলে এই বালক আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের কন্যা লীলার প্রেমে আসক্ত হয়। লীলাও তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছিল, কিন্তু পিতার তাহাতে ঘোর আপত্তি। ফলে, কঙ্ক বিতাড়িত হয় কিন্তু, লীলার পীড়া হয়, তখন পিতার চৈতন্য হয়। কিন্তু তখন অতি দেরী হইয়াছে শ্মশানে লীলার পিতার ঘোর অনুতাপ হয়।
এই গীতিকায় কবি প্রদর্শন করিয়াছেন যে প্রেম সামাজিক ব্যবধান করে না, অন্যপক্ষে মানুষগড়া গণ্ডী মানবের কত ক্ষতিকর। এই প্রকারে "ফিরোজ খাঁ" গীতিতে দেওয়ান ইশা খাঁর বংশ পরিচয়, তাহার বংশধর ফিরোজ খাঁর দিল্লীর বাদশাহের বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা করার মনোভাব প্রকাশ, মাতা তাহা নিবৃত্তি করিবার জন্য অন্য এক মুসলমান জমিদারের কন্যার সহিত বিবাহ প্রস্তাব পাঠান।

কিন্তু ফিরোজের হিন্দুবংশে উৎপত্তি বলিয়া এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়; ফলে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই গীতিকাতে উল্লেখ আছে যে ইশাখাঁর সহিত কেদাররায়ের ভগ্নী বা ভাইঝী সোনামণির প্রেমপত্র বিনিময় হইবার পর শেষোক্তটি ইশা খাঁর গৃহে যাইয়া তাঁহার ধর্ম্ম পত্নী হন। "চৌধুরীর লড়াই" গীতিকায় নোয়াখালীর ভূঁইয়া বংশের খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্রের লড়াই, ইহাতে ভ্রাতুষ্পুত্রের পিতার বন্ধু এক মুসলমান জমিদার তাহাকে সাহায্য করেন। "মহুয়া" গীতিকায় এক ব্রাহ্মণ কন্যা বেদের ঘরে পালিত হয়, এক রাজপুত্র তাহার প্রেমে পতিত হয়, এবং উভয়ে পলায়ন করে। অবশেষে মহুয়ার বেদে ধর্ম্মপিতা রাজপুত্রকে হত্যা করে এবং প্রথমোক্ত আত্মহত্যা করে। এই চিত্রে বেদে জীবন এবং পরের কালের দাম্পত্য প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রেম ধর্ম্মের ও সমাজের গণ্ডীর বাঁধন মানে নাই। "মলুয়া" গীতিতে এক প্রলুব্ধ কাজী দ্বারা বিবাহিতা মলুয়া হরণ বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু যখন সে আত্মরক্ষা করিয়া স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন সে হয় ত্যাজ্য। শেষে সে স্বামীর প্রতি পতিনিষ্ঠার প্রেম জানাইয়া জলে ডুবিয়া মরে। এই স্থলে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার ইঙ্গিত প্রদত্ত হইতেছে।

এই প্রকারের পল্লী গীতিকা সম্বন্ধে ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, —"বঙ্গসাহিত্যের সংস্কৃত চিহ্নিত যুগের উপর ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্বের যে ছাপ পড়িয়াছে, এই পল্লী সাহিত্যে তাহার কিছুমাত্র নাই।...এত বড় সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিলে আমরা কয়টা নায়ক ও নায়িকার মহিমান্বিত চিত্র দেখিতে পাই?...কিন্তু পল্লী গাথার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে আমরা তদনুপাতে বহুসংখ্যক চরিত্র-চিত্রণ দেখিতে পাইতেছি, তাহাদের প্রত্যেকটী এক একটা স্বতন্ত্র গৌরবের আসনে স্থিত। চাষাদের কবিত্বশক্তি অদ্ভুত" ("হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন-লেখমালা" পৃঃ ১৬১-১৬২)।

মোগল যুগের এই গীতিকাসমূহে আমরা জমিদারদের যুদ্ধ বিগ্রহের কথা, কেনারামের মতন ডাকাতের ধর্ম্মবুদ্ধি উদয় হইয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করার কথা, প্রজাদের হিতার্থে রাণী চন্দ্রাবতীর প্রাণ দান ও লম্পট কাজীর

গল্প, অন্য পক্ষে হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের বন্ধুত্ব, মুসলমান কবিদের মুসলমান ও হিন্দুর আরাধ্যকে একই মনে করিয়া বন্দনা প্রভৃতি দ্বারা আমরা তৎকালের বাঙ্গালায় অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির সংবাদ পাই। এই সাহিত্য নানা শ্রেণীর লোকের কথা, এবং ইহাতে কতকটা বাস্তবিকতার উপর ও কতকটা আদর্শ ভাব বিজড়িত আছে। এই জন্য এই সাহিত্যকে আমরা Impressionist বা Idealistic Mixed লক্ষণ যুক্ত বলিয়া অভিহিত করি।

ভারতচন্দ্রের পর ইংরেজ শাসনের যুগ আরম্ভ হয়। এই যুগে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভূত হয়। বাঙ্গলার সর্ব্ব বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব এই শ্রেণী দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু উপরোক্ত কালব্যতিক্রম দোষজন্য উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরাও সামন্ততান্ত্রিক যুগের মোহ কাটাইতে পারেন নাই। তাই এই যুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের নায়কেরা কেহ হয়ত ভূস্বামী, না হয় তিনি একজন তাহার substitute জমিদার। এই যুগের লেখকেরা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান কালের বুর্জ্জোয়া অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী বা মোগল আমলের জমিদারের স্থান আর নাই, আর আজকালকার জমিদারেরা ইংরেজের জন্য প্রজার কাছে খাজনা আদায়কারী এজেন্ট মাত্র।

ইংরেজী যুগের একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁহার "মেঘনাদবধ কাব্য" তাঁহাকে অমর করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, বাঙ্গলা সাহিত্যে এই ভাব নূতন। এই কাব্যে ইউরোপীয় ইলিয়াডের ছাপ পড়িয়াছে; তৎপর অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভঙ্গী; ইহাও নূতন। মেঘনাদ বধ কাব্যের শরীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথম শ্লোক হইতে 'সপ্তদিন লঙ্কা কাঁদিল বিষাদে' পর্য্যন্ত ইলিয়াডের ভাবের নকল হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার নায়ক নায়িকারা হিন্দু বেশেই অঙ্কিত হইয়াছেন। লেখকের মতে, হোমারের রাজা প্রায়াম, পুত্র হেক্টর ও তৎপত্নী আন্দ্রোমাখী অপেক্ষা মাইকেল রাবণ, ইন্দ্রজিত ও প্রমীলার চিত্র উন্নততর ভাবে আঁকিয়াছেন, অর্থাৎ হোমারের নায়কও নায়িকাদের অপেক্ষা মেঘনাদ বধ কাব্যের নায়ক ও নায়িকারা উন্নততর শ্রেণীর লোক।

এই কাব্য ইলিয়াডের হিন্দু আকারের সংস্করণ বলিয়াই এত মনোরম ও জনপ্রিয় হইয়াছে। এই সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে Romantist এবং Ideational। তৎপরে তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'কৃষ্ণ কুমারী নাটক' প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় গল্প লইয়া লিখিত হইয়াছে। এইজন্য ইহাতে আমরা প্রগতি মূলক কিছু পাই না। এইগুলিও Romantist ও সম্পূর্ণ Ideational। ইহার পর "বুড়া শালিকের ঘাড়ে রোঁ" নাটকে এবং "একেই কি বলে সভ্যতা" নামক সামাজিক নাটকদ্বয়ে ব্যঙ্গই করা হইয়াছে, তাহাতে আমরা প্রগতির সংবাদ পাই না। তবে, শেষোক্ত সমসাময়িক একদল "অতি" শিক্ষিত যুবকদের মনস্তত্ত্বের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে; এইজন্য ইহাকে Idealist এবং mixed লক্ষণ যুক্ত বলা যাইতে পারে। ইহা আধুনিক কালের চিত্র প্রদান করিয়াছে, সেইজন্য প্রগতিশীল। তদ্রূপ দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর বেশীর ভাগের theme (প্রতিপাদ্য) অপেক্ষাকৃত: প্রাচীন সাহিত্যের নকলে লিখিত হইয়াছে, কেবল "সধবার একাদশী" নাটকে সমসাময়িক ধনীর পুত্রের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এইজন্য এই পুস্তক অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল। আবার "নীল দর্পণ" বাস্তবিক ঘটনাবলীর উপর চিত্রিত। এই দুই পুস্তক Realist এবং Sensate ভাবযুক্ত। আবার বাঙ্গলার তৎকালীন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তক সমূহের সাধারণতঃ আমরা প্রগতির কোন ধারা পাই না। তবে "বিষবৃক্ষ" পুস্তকে কুন্দ নন্দিনীর বিধবা বিবাহ প্রদান করায় তাঁহার মনের তৎকালীন প্রগতির ধারা নিরীক্ষণ করি। এই পুস্তক Romantist এবং mixed বা ideal বলা যাইতে পারে।

পুনঃ, "সাম্য" নামক প্রবন্ধে তিনি ইউরোপীয় তৎকালীন চিন্তাধারার সাহিত্যের সম্যক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে তিনি সোসালিষ্টদের দ্বারা ইউরোপে "প্রথম শ্রমিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন" (First International) সংস্থাপিত হইবার সংবাদ দিয়াছেন। আর দিয়াছেন ফ্রান্সের Auguste Comte দ্বারা Positivism নামক মতবাদের সংবাদ। এই মতবাদ তাঁহার সময়ে ভারতের অনেক শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনিও

তদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। এই প্রবন্ধে আমরা প্রগতির পরিচয় পাই। "কৃষকের কথা" নামক প্রবন্ধ সমূহে আমরা তাঁহার তৎকালীন Realist মনের পরিচয় পাই। কিন্তু 'ধর্ম্মতত্ত্ব,' 'শ্রীকৃষ্ণ,' 'আনন্দমঠ' সম্পূর্ণভাবে Ideational।

এই সময়ের ব্রাহ্ম সমাজের সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রগতির সংবাদ পাওয়া যায়। এই সমাজের সভ্যরা বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক এবং সমাজ সংস্কার কর্ম্মে ব্রতী, সেইজন্য তাঁহাদের দ্বারা লিখিত সাহিত্য মধ্যে আমরা সামন্ততান্ত্রিক সংবাদ পাই না। তাঁহাদের প্রতিপাদ্য হইতেছে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার; কাজেই তৎকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক এই সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু এই সাহিত্যে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্পর্কীয় সংস্কারের তর্ক বিজড়িত থাকায় ইহাতে কেবল আদর্শবাদই প্রতিফলিত হইয়াছে। গণসমূহের অবস্থা বিষয়ে তাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় না এবং দেশের তৎকালীন অবস্থাও ইহাতে চিত্রিত হয় নাই: এই জন্য ইহাতে গঠনমূলক সমাজ পদ্ধতির সংবাদ নাই। এই শ্রেণীর সাহিত্যকে পুরাতন পদ্ধতিতে Idealist এবং সোরোকিনী প্রথায় mixed বলিয়া অভিহিত করা যায়।

এই যুগে নব বিবর্ত্তিত হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে আদর্শ ও পথ নিয়া আত্ম-কলহ হয়। ফলে, সংস্কার এবং সনাতনবাদীয় আখ্যার দলের তুমুল কলহ হয়। তজ্জন্য তৎসংক্রান্ত সাময়িক সাহিত্যও সৃষ্ট হয়। ব্রাহ্ম সাহিত্য এই এক পক্ষের সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু আজ উভয় দলেরই শিক্ষা ও দীক্ষা একীভূত হওয়ায় সে কলহ আর নাই।

ইহার পর একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি অনেক বিষয়েই কবিতা, গল্প ও নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখার প্রতিপাদ্য ছিল ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বদেশপ্রেমমূলক রাজনীতিক নাটকসমূহ। তাঁহার দীর্ঘ জীবনে নানা ভাব তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত লাগিয়াছিল তাই আমরা তাঁহার "বুদ্ধদেব রচিত", "চৈতন্যলীলা" "বিল্বমঙ্গল" "শঙ্করাচার্য্য" নামক

নাটকসমূহে ধর্ম্মভাব প্রণোদিত চিত্র পাই। অবশ্য অতীত যুগের সংবাদ ও মত নিয়া এই সব নাটক লিখিত হইয়াছিল, এইজন্য তাঁহার ধর্ম্মাত্মক সাহিত্যের মধ্যে আমরা প্রগতির আভাস পাই না। তৎপর, "বেল্লিকবাজার", "প্রফুল্ল" প্রভৃতি নাটক তাঁহার সমসাময়িক কলিকাতার একদল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহাতে তৎকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনস্তত্ত্ব অঙ্কিত হইয়াছে।

তাঁহার স্বদেশপ্রেমজাত নাটকসমূহে ভারতের পতনের কারণ, হিন্দু ও মুসলমানের এক লক্ষ্য বিষয়ে অনেক কথা আছে যাহা স্বদেশ প্রেমিকের শিক্ষণীয় বস্তু। তাঁহার 'চন্দ্রা' নামক গল্প, "সিপাহী বিদ্রোহ" অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। "বলিদান" নাটকে হিন্দু সমাজের "পণপ্রথার" নির্ম্মম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অবশ্য আমরা যাহাকে প্রগতি সাহিত্য বলি তাহা তাঁহার লেখার মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হয় নাই। ভবিষ্যতে ভারত সংগঠন কল্পে যে কর্ম্মপদ্ধতির প্রয়োজন তাহা তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই। তখনকার শিক্ষিত ভারত "স্বাধীনতা ও হিন্দু এবং মুসলমানের ঐক্য প্রয়োজন" এই ভাবটি ভাসাভাসারূপে ধারণ করিতে মাত্র শিখিয়াছে, এবং স্বাধীনতা উপলব্ধি কল্পে প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণাজন্য অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিত। গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যে তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তাঁহার বহুসংখ্যক পুস্তক সর্ব্বপ্রকারের লক্ষণ বহন করে। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়াংশে বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিকের দল উদয় হয়। তাঁহাদের সাহিত্য স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা কল্পে যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু প্রথমোক্ত লেখক "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" নামক পুস্তকে যে ঘটনামূলক চিত্র প্রদান করে তাহা বর্ণাশ্রমীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীয়; তজ্জন্য আজকালকার যুগে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া গণ্য হইবে। শেষোক্তদের সাহিত্য তৎকালীন শিক্ষিত ভারতবাসীর মনস্তত্ত্বের পরিচায়ক। বিদেশের সহিত স্বদেশের তুলনা করিয়া তাঁহারা "হায় মা ভারত" বলিয়া হা হুতাস করিয়া করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য একটা পথ নির্দ্দেশ করিয়া

দিয়া যান নি, এইজন্য তাঁহাদের সাহিত্যকে প্রগতিশীল বলা যায় না। এই সাহিত্যগুলিকে Ideational বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

এই সময়ে নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত "স্বদেশী মেলা", যাহাকে সাধারণতঃ "হিন্দু মহামেলা" বলা হইত, তাহার সংস্পর্শে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠে তাহা স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক ('পুরু বিক্রম নাটক,' 'বঙ্গাধীপ পরাজয়,' 'ভারত বিলাপ,' বিবিধ স্বদেশী সঙ্গীত প্রভৃতি) হইলেও কাল্পনিক আদর্শ প্রণোদিত ছিল, এইজন্য ইহা Idealist এবং নব ধারায় ইহা Ideational লক্ষণযুক্ত বলিয়া গণ্য হয়।

এই সব সাহিত্য আলোচনা করিয়া আমরা উপলব্ধি করি যে, একটা যথার্থ প্রগতিশীল সাহিত্য যাহা সমাজের গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে আর তৎকালীন সমাজের চিন্তাধারা ও তৎপ্রসূত প্রচেষ্টাকে প্রকট করিবে তাহা ইহাতে পাই না। ইহা সত্য বটে, উপরোক্ত অনেক সাহিত্যিক তাঁহাদের লেখার মধ্যে সমসাময়িক চিত্র প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু সমাজ মধ্যে কি কি শক্তি লীলা করিতেছে এবং সমাজের সম্পদ করায়ত্ত করিবার জন্য কোন শক্তি প্রয়াস পাইতেছে, ইহার আভাস বা বিশ্লেষণ আমরা এই সব সাহিত্যে পাই না। অনেকে মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকদের চিত্র বা মনোবিজ্ঞান নিজেদের লেখার মধ্যে ফুটাইয়াছেন। কিন্তু এই যুগের সাহিত্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহিত্য নহে। এই যুগের সাহিত্যিকেরা স্বদেশ প্রেমের বন্যা ছুটাইলেও তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল অতীতে এবং সর্ব্বত্র হাহুতাসের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই সাহিত্যগুলি হয় Ideational না হয় Mixed লক্ষণ ধারণ করে।

এই যুগের পর আসে, স্বদেশী যুগের বন্যা। এই যুগে সাহিত্যে একটি নূতন ভাবধারা প্রবেশ করে। নানা প্রকারের স্বদেশী সঙ্গীত ও কবিতা এই সময়ে রচিত হয়, অতীত ইতিহাস থেকে কাহিনী নিয়া গিরীশচন্দ্র, ক্ষীরোদচন্দ্র বিদ্যা-বিনোদ কতিপয় নাটক রচনা করেন। কিন্তু এইগুলি স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক হইলেও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু বহির্ভূত কাল্পনিক আদর্শ বিজড়িত বলিয়া Ideational লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু ইহার বিকল্পে, স্বাধীনতাকামী দল দ্বারা পরিচালিত 'যুগান্তর' পত্রিকায় অন্য সুর ধ্বনিত হইতে থাকে। এই দল

থেকে অনেক গান, কবিতা, রামায়ণের স্বদেশী ব্যাখ্যার পাঠ, ৺সখারাম গনেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' নামক অর্থনীতিক পুস্তক, এবং উপরোক্ত সংবাদপত্রে রাজনীতিক প্রবন্ধ সমূহ বাঙ্গলা ভাষায় নূতন স্রোত আনয়ন করে। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল, 'হাহুতাস' ও 'হায় মা ভারত' বলিয়া ক্রন্দনের রোল বন্ধ করিয়া ওজঃ ও আশার বাণী শ্রবণ করাইবেন। এই জন্যই 'যুগান্তর' পত্রিকায় তৎ-কালীন বাস্তব রাজনীতির আলোচনা হইত, এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের গঠন-মূলক কর্ম্মের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইত। অবশ্য ইহা চিন্তাক্ষেত্রে ভাব পরিবর্ত্তনকল্পেই আত্ম-নিয়োজিত করিত। এই সঙ্গে ৺দেবব্রত বসুর (পরের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ) স্বদেশী গানসমূহে ওজঃ এবং ভবিষ্যতের আশার কথাই ধ্বনিত হইত। প্রথম যুগের 'ভারত বিলাপ' ও পরের যুগের হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত' হইতে এই সব কবিতার ইহাই বৈশিষ্ট্য। দেবব্রত বসুর 'উঠিয়া দাঁড়াল জননী' নামক গানে জন্মভূমির ভবিষ্যতের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। আর একটি গানে—

'দে মা···অধঃবদনে কেন নীরবে বসি।
গাণ্ডীব রচে ছিলে যে হাতে মা অতীতে,
শৃঙ্খল, কিঙ্কিনীধ্বনি বাজে আজি সে হাতে।
সন্তানের শিরাতে একবিন্দু থাকিতে,
অধঃবদনে কেন নীরবে বসি।
তুল মা তুল মা আঁখি বিজলী ছুটিবে তায়,
কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য খড়্গে ঝলসিয়া যায়"

ইত্যাদি বলিয়াছেন। পুনঃ, আর একটি গানে, তিনি দেশের সকলকেই মাতৃ সেবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন ঃ

"কে আছ দাঁড়ায়ে নীরবে,
কে আছ মায়ের মুখপানে চেয়ে।
নিজেরে ভাবিয়ে অক্ষম দুর্ব্বল,
বাড়ায়েছ মার যাতনা কেবল,

দুইশত বার

(ওরে) মাতৃকণ্ঠে যার বাজিছে শৃঙ্খল,
দুর্ব্বল সবল সেও কি ভাবিবে !
কে আছ বিদেশী পরপদ সেবী,
গোপনে মাতৃভূমি সেবক সন্ধানে।
এস শীঘ্র এস বেলা বয়ে যায়
...এনেছে উষা এসিয়ায়।
মধ্যাহ্ন গরিমা স্বাধীন ভারত
আনিবে নিশ্চয়ই আনিবে”

(দুঃখের কথা তাহার কবিতাগুলি মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া, পরে বাজেয়াপ্ত করিয়া অনেকে নিজেদের নামে চালান)। এই সঙ্গে কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের, ও ৺কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তীর গান সমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার উপরোক্ত দলের যশোহর নিবাসী ৺ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের কবিতাসমূহ ওজঃপূর্ণ ছিল। একটি কবিতা পুস্তকে ইনি বলিতেছেন ঃ

“বাসন্তী চন্দ্রিমা পূর্ণ সারা ভূমণ্ডল,
আমাদের জীর্ণ গৃহে শুধু অন্ধকার
* * *
ফেলিয়াছি বীণা আর গাহিব না গান,
উচ্চে গাহিবার আজি এসেছে সময়।
* * *
রমণীর রূপগান ! হায় জগদীশ,
পুড়াইয়া দেহ রূপ ভারতবালার,
সাজে কি বুভুক্ষু মাঝে প্রেমাস্নিগ্ধ তান !”

তৎপর, আর একটি কবিতা পুস্তকে ইনি বাঙ্গলার পল্লীর বর্ত্তমান অবস্থা সতেজ ভাষায় বর্ণনা করেন।

এই সঙ্গে এই দল দ্বারা উপরোক্ত স্বদেশী রামায়ণে লিখিত গানসমূহ সাধারণের স্বদেশপ্রীতি উৎপাদন করিত।

একটা গান এই ঃ

"স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি রেখ রেখ হৃদে ধ্রুবজ্ঞান"

* * *

"চিরকর্ম্মক্ষেত্র তব মাতৃভূমি, একথা কেনরে হও বিস্মরণ"

আর একটি গান ঃ

"একবার এস ফিরে ফিরে এস গো,
একবার পূর্ব্বাকাশে মধুহাসি হাস গো।
এসেছিলে শুনি কানে কবে হায় কেবা জানে,
কখন কদাচ গানে ভাস গো।
বহুদিন হল প্রাণ, বঙ্গে শক্তি অবসান,
কখন হবে তোমার আহ্বান গান।
তথাপি শঙ্করী এস, ভগ্নহৃদয়ে বোসো,
তুমি যে শ্মশান ভালবাস গো।"

শক্তিদেবীকে লক্ষ্য করিয়া স্বদেশী রামায়ণে বিরচিত হয়, কিন্তু ইহা দুই অর্থবোধক।

এই সময়ে ৺কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে আজ" প্রভৃতি গান ; ৺অশ্বিনীকুমার দত্তের 'অগ্নিময়ী মাগো আজি ডাকি সকলে মা" প্রভৃতি গান বিরচিত হয় এবং সাধারণে গীত হয়। এই প্রকারে বাঙ্গলার হাওয়ায় নূতন সুর ভাসিতে থাকে।

এই যুগে কবি রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান রাজনীতিক ব্যবস্থা বর্ণনা করিয়া নানা প্রকারের প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেন। তিনি "স্বদেশী সমাজ" শীর্ষক বক্তৃতায় Parallel Government স্থাপন করিয়া স্বাধীনতার্জ্জন করার উপদেশ দেন এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার ফেডারেশন হল স্থাপন দিবস উপলক্ষ্যে "বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, পূণ্য হউক পূণ্য হউক" কবিতা বাঙ্গলার নূতন মনস্তত্ত্বের পরিচয় প্রদান করে।

এই সময়েই ১৯০৭ খৃঃ ফেডারেশন হলে জাতীয়তার প্রতীকস্বরূপ ত্রিবর্ণ রঞ্জিত "জাতীয় পতাকা" উড্ডীন করা হয়।

স্বদেশী যুগের এই যে ওজঃ পূর্ণ সাহিত্য এবং বিশেষতঃ যুগান্তর দলের উদ্দীপণা পূর্ণ সাহিত্য কোথা হইতে প্রেরণা পাইল? একই ভাষার সাহিত্য, কিন্তু রূপ ও রস বিভিন্ন হয়। সাহিত্য যে শ্রেণী লক্ষণ ধারণ করে এই যুগের সাহিত্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সময়ের বুর্জোয়া শ্রেণীর আদর্শও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই যুগের বুর্জোয়া শ্রেণী আর ভয়ে ভীত চকিত ভাবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে না। ইহা শিক্ষা, দীক্ষা ও কর্ম্মে নিজেকে ইংরেজ সমশ্রেণীর সমকক্ষ বলিয়া মনে করে। এইজন্য অনুপ্রেরণা জন্য ইহা আর বিদেশের দিকে তাকাইয়া নাই। কিন্তু যাঁহারা তখনও তদ্রূপ দৃষ্টি কোণ বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদেরই উপলক্ষ করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে বহে নতশির।" এইজন্য এই সময়ের একটি জন সভায় চিত্তরঞ্জন একটি ক্ষুদ্র কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন: "বাঙ্গালীর আছে ইতিহাস···বাঙ্গালীর আছে ভবিষ্যত" (কুমারটুলীতে ১৯০৫ খৃঃ একটি স্বদেশী সভায় ইহা তিনি পাঠ করেন)।

আজকাল যুগান্তর পত্রিকা সম্বন্ধে অনেকে অনেক অলীক কথা বাহির করিতেছেন; তাঁহারা বলিতে চান যে এই দলের সব গুপ্ত কথা সম্বন্ধে তাঁহারা ওয়াকিফ-হাল! এমন কি কেহ কেহ যুগান্তর পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াও নিজেকে জাহির করেন (১৯৩১ খৃঃ উত্তর কলিকাতার কংগ্রেস কার্য্যকরী সভার এক অধিবেশনে একজন ভদ্রলোক নিজেকে উকিল বলিয়া পরিচয় দিয়া লেখককে বলেন, "অমুকবাবু, আপনি আমায় চিনেন না আমি আপনাকে চিনি, আমি আর অমুক 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করি!" যাঁহার নাম এই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, তিনি তখন আঠারো বৎসরের তরুণ, যুগান্তর দলের সভ্য এবং পত্রিকা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কার্য্য করিতেন। ইনি এখনও জীবিত আছেন)।

এসব প্রতারণা পূর্ণ কথা অনভিজ্ঞকে বঞ্চনা করিতে পারে, কিন্তু আসল কথা এই 'যুগান্তর' পত্রিকা জনকতক যুবকের খামখেয়াল ছিল না। ইহার পশ্চাতে ছিল বিশাল বাঙ্গালার উচ্চস্তরের বুর্জ্জোয়া ও জমিদার শ্রেণী। মহারাজা

এবং জমিদার হইতে গ্রামের ক্ষুদ্র বুর্জ্জোয়া অর্থাৎ গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণী পর্য্যন্ত ইহার পৃষ্ঠপোষক ও সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল।

এই বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান পার্থক্য ছিল না, ঐতিহাসিক বারভূঁইয়াদের অন্যতম এক মুসলমান বংশীয় জমিদার লেখকের বন্ধুদের বলিতেন, "এই কাগজ ঠিক ঠিক লিখে"। পরে তিনি গোপনে লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ও জ্ঞাপন করেন। যুগান্তর দলের সাহিত্য ব্যক্তিগত বা ক্ষুদ্র দলগত মনস্তত্ত্বের দ্যোতক নহে।

ইহা তৎকালীন সদ্যজাগ্রত আক্রমণশীল উপরিস্তরের সামাজিক শ্রেণীর Militant মনস্তত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করিত। পূর্ব্বতন যুগের সাহিত্যাপেক্ষা ইহার সুর জাতীয়তায় অর্জ্জনের পথে অগ্রসর গতির নির্দ্দেশ দেয় বলিয়া ইহা পূর্ব্বের সাহিত্যাপেক্ষা প্রগতিশীল বলিতে হইবে। ইহা রাজনীতিক্ষেত্রে বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর মনস্তত্ত্বের পরিচায়ক হইলেও ইহাকে সম্পূর্ণ বুর্জ্জোয়া সাহিত্য বলা যায় না। এই সাহিত্য Impressionist এবং এই সাহিত্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তুলনামূলক বাস্তবিকতা ও আদর্শবাদ মিশ্রিত থাকায় ইহা Mixed বা Idealistic বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ইহার পরের যুগের অর্থাৎ প্রথম জগৎব্যাপী যুদ্ধের পরের বড় সাহিত্যিক হইতেছেন শরৎচন্দ্র। ইঁহার সাহিত্যে ক্ষুদ্র বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর মনস্তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে, নারী জাতির প্রতি সম্মান আছে অথচ সমাজে নারী জাতির প্রতি যে প্রাচীন সঙ্কুচিত মনোভাব তাহাও আছে। "পণ্ডিত মশায়" পুস্তকে 'জাত-বৈষ্ণব' নায়কের প্রথম স্ত্রীর স্বামী বাড়ী প্রত্যাগমন বিষয়ে যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিল, তাহাতেই ইহা প্রকাশ পায়। এই রমণী গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ কন্যাদের সঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, পরে স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়। জাত-বৈষ্ণব সমাজে 'মালসা ভোগ' দ্বারা বিবাহের প্রথা আছে এবং 'কণ্ঠীবদল' দ্বারা বিধবা বিবাহ ব্যবস্থাও আছে; বিবাহ বিচ্ছেদও আছে। কিন্তু আজ এই সমাজের বুর্জ্জোয়া শ্রেণী, তথাকথিত উচ্চ জাতিদের রীতি নীতি অবলম্বন করিতেছে। পণ্ডিত মশায়ে তাই দেখিতে পাই নায়িকা স্বামী

ঘরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনিচ্ছুক। সে কণ্ঠিবদল ক্রিয়া সম্পাদনে অস্বীকৃত হয়; কারণ তাহার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ঘরের সঙ্গিনীরা বলিবে, "বাগদী দুলের মত তাহার নিকে হয়ে গেল"! একবার যে বিবাহ ক্রিয়া হইয়াছিল, নায়ক তাহাই স্বীকার করিয়া নিক ইত্যাদি। এই স্থলে লেখক বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বাহিরে জাত-বষ্টুমের ঘরে উচ্চ শ্রেণীয় বর্ণাশ্রম পদ্ধতি আরোপ করিয়াছেন, তাই এই স্থলে সামাজিক বিসদৃশ্যতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এই স্থলে নায়িকার যে মনস্তত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা ক্ষুদ্র বুর্জোয়া মন প্রসূত বৃত্তি, তাহাই তথাকথিত নিম্ন স্তরের জাতি সমূহ মধ্যে বিশেষ ভাবে বিরাজ করিতেছে। "চরিত্রহীন" উপন্যাসে এই সঙ্কুচিত ভাব পুনঃ প্রকাশ পাইয়াছে। কিরণময়ী দিবাকরকে লুচি ভাজিতে ভাজিতে Oscar Wildeএর Dorian Grey নামক পুস্তকে ডাক্তার যে "মহাসুখবাদ" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। সুখের সন্ধানে কিরণময়ী দেশত্যাগী হইল, কিন্তু লেখক তাহার বিধবা বিবাহ দিয়া দিতে পারিলেন না, রাস্তার পাগলিনী করিয়া শেষে তাহাকে আখ্যায়িকা হইতে বিদায় দিলেন। কিন্তু "শ্রীকান্তে" অভয়ার মুখ দিয়া লেখক যে তথ্য বাহির করিয়াছেন তাহা এই দেশের অবস্থানুযায়ী আপেক্ষিক সমাজ-বৈপ্লবিক ভাব। অন্য পক্ষে "দত্তাতে" আমরা প্রতিক্রিয়াশীলতারই পরিচয় পাই। ইহার নূতনত্ব এই, ইহাতে ইউরোপীয় ধরনের Flirtation কিঞ্চিৎ ঢুকান হইয়াছে। কিন্তু শরৎ সাহিত্যে এই আপেক্ষিক প্রগতির জন্য আমরা ইহাকে "বুর্জ্জোয়া" সাহিত্য বলিতে পারি না, কারণ বুর্জ্জোয়া মনোবৃত্তি সুলভ বিপ্লবের ধারার সন্ধান এবং বুর্জোয়া স্বার্থ-প্রণোদিত গঠনমূলক কর্ম্মের নির্দ্দেশ আমরা এই সাহিত্যে পাই না। শরৎ-সাহিত্য ক্ষুদ্র-বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর মনস্তত্বের প্রতীক বলিয়াই পূর্ব্বতন যুগের সাহিত্যাপেক্ষা প্রগতি-শীল। শরৎ সাহিত্যকে আমরা পুরাতন প্রথায় Impressionist এবং নূতন সজ্ঞানুসারে Mixed অর্থাৎ Idealist বলিয়া গণ্য করি।

ইহার পর, বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশে উদয় হন কবি কাজী নজরুল-ইসলাম। ইহাঁর কবিতা দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যে একটা নূতন সুর বাজিয়া উঠে। পুরাতন সাহিত্যের সঙ্কোচন ও সনাতনী ভাব এই সুর একেবারেই বিদূরিত করে।

তিনি কবিতা ও প্রবন্ধ দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যে নূতন ভাবধারা ও ওজঃ আনয়ন করেন। তাঁহার সাহিত্যের তিনটি যুগ আছেঃ প্রথমটি জাতীয়তাপূর্ণ সাহিত্য; দ্বিতীয়, সাম্যবাদীয় সাহিত্য; তৃতীয়, তৎপরবর্ত্তীকালের সাহিত্য যাহা গজল প্রভৃতি গান প্রধান সাহিত্য। তাঁহার কবিতার যৌবন জাতীয়তা-বাদের কালেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং সাম্যবাদীয়-কালেই তাহা চরমে উঠে বলিয়াই বিবেচিত হয়। এই জন্য, এই দুই যুগই তাঁহার কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কবির জাতীয়তাবাদীয় সাহিত্যের পরিচয় আমরা 'ধূমকেতু' পত্রিকায় পাই। তিনি বলিতেছেন "মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে 'জয় প্রলয়ঙ্কর' ব'লে 'ধূমকেতু'কে রথ ক'রে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হ'ল। আমার কর্ণধার আমি। আমায় পথ দেখাবে আমার সত্য। আমার যাত্রা-শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি—নমস্কার করছি আমার সত্যকে।...এই যে নিজেকে চেনা আপনার সত্যকে আপনার গুরু, পথ প্রদর্শক কাণ্ডারী বলে জানা, এটা দম্ভ নয়, অহঙ্কার নয়। এটা আত্মকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি।" এই উক্তির মধ্যে কবির দার্শনিকতত্ত্ব নিহিত আছে, তাঁহার কাছে নিজের উপলব্ধ তথ্যই সত্য—"আত্মানং বিদ্ধি" এই হইতেছে কাজী নজরুলের মূল-মন্ত্র। পুনঃ, তিনি বলিতেছেন, এ দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে অস্থি-মজ্জায় যে পচন ধরেছে, তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হ'লে নতুন জাত গ'ড়ে উঠ্‌বে না।...দেশের যারা শত্রু, দেশের যা—কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামী, মেকী তা সব দূর ক'রতে 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জ্জনী! এতদ্বারা সমাজ-রাজনীতিক ক্ষেত্রে কবির অভিমত প্রকাশ পায়। আবার, তিনি বলিতেছেন, "ধূমকেতু কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ-ধর্ম্মই সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোন খানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। যার নিজের ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে যে নিজের ধর্ম্মের সত্যকে চিনেছে সে কখনো অন্য ধর্ম্মকে ঘৃণা করতে পারে না।" এই স্থলে কবির ধর্ম্মের ও সাম্প্রদায়িক মিলনের আদর্শ তাঁহার লেখনীমুখ হইতে পরিপুষ্ট হয়।

অন্যপক্ষে, "মোহর্‌রম" নামক প্রবন্ধে ভারতীয়-মুসলমানকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে উপরোক্ত মন্তব্যেরই জের চলিতেছে। তিনি মুসলমানকে বলিতেছেন, "আত্মানং বিদ্ধি"। তিনি বলিতেছেন, "ফিরে এসেছে আজ সেই মোহর্‌রম—সেই নিখিল মুসলিমের ক্রন্দন কাৎরাণীর দিন। কিন্তু সত্য করে আজ কে কেঁদেছে বলতে পার হে মুস্‌লিম, আজ তোমার চোখে অশ্রু নাই। আজ ক্রন্দন স্মৃতি তোমার উৎসবে পরিণত! তোমার অশ্রু আজ ভণ্ডামী, ক্রন্দন আজ কৃত্তিম কর্কশ চীৎকারে।... আজ কার্‌বালার হাহাকার ঐ নিখিল নিপীড়িত মুসলিমের বুকের সাহারায়, তোমার অপমান জর্জ্জরিত অশ্রু নদীর কূলে কূলে!" এই স্থলে, সত্য জানিয়া কর্ম্ম করিবার জন্য কবি মুসলমানকে আহ্বান করিতেছেন, তাই তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন: "তোমার গর্দ্দানে গোলামীর জিঞ্জির, যে শির আল্লার আরস ছাড়া আর কোথাও নত হয় না। সেই শিরকে জোর ক'রে সেজ্‌'দা করাচ্ছে অত্যাচারী শক্তি,—আর তুমি করছ আজ সেই শহীদদের ধর্ম্মের জন্য স্বাধীনতার জন্য শহীদদের 'মাতমে'র অভিনয়। আফ্‌সোস মুসলিম! আফ্‌সোস!!"

এই উভয় উক্তির মধ্য দিয়া কবিকে আমরা কিছু বুঝিতে পারি। তিনি গড্ডালিকাপ্রবাহের "জাতীয়তাবাদী নন।" এই আদর্শ বিষয়ে তাঁহার একটি বিশিষ্ট ধারণাও একসময়ে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "অনেকেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন, 'ধূমকেতুর পথ' কি?...নীচে মোটামুটি 'ধূমকেতুর' পথনির্দ্দেশ করছি।...সর্ব্বপ্রথম, 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝি না। কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হ'লে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়ম কানুন বাঁধন শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে। আর এই বিদ্রোহ করতে হ'লে—সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে"। এই স্থলে কবির জাতীয়তাবাদীর রূপের পার্শ্বে সামাজিক-বিপ্লববাদীর রূপ প্রকাশ পায়। আর সেই সঙ্গে সেই বাণী "আত্মানাং বিদ্ধি" ধ্বনিত হইতেছে। এই বাণী

অনুসরণ করিয়া তিনি পুনঃ বলিতেছেন,"অনেকেই লোভের বা নামের জন্য মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে নেমেছিলেন। কিন্তু আত্ম প্রবঞ্চনা নিয়ে নেমেছিলেন বলে অন্তর থেকে সত্যের জোর পেলেন্ না, আপনি সরে পড়লেন। রবীন্দ্র অরবিন্দ ভক্তদের মধ্যেও ঐ একই প্রবঞ্চনা ফাঁকি এসে পড়েছে। এরা অন্ধ ভক্ত, চোখ ওয়ালা ভক্ত নয়, বীর-ভক্ত নয়।···এ সব অন্ধ লোক দিয়ে কোনো কাজ হবে না।··বিদ্রোহ মানে কাউকে না মানা নয়, বিদ্রোহ মানে যেটা বুঝি না সেটাকে মাথা উঁচু ক'রে "বুঝি না" বলা।···'ধূমকেতু'র মত হচ্ছে এই যে, তোমার মন যা চায় তাই কর। ধর্ম্ম, সমাজ, রাজা, দেবতা কাউকে মেনো না।···সত্যকে জানাবার জন্য বিদ্রোহ চাই। নিজেকে শ্রদ্ধা প্রশংসার লোভ থেকে রেহাই দেওয়া চাই"। এই স্থলে, কবির রাজনীতিক—সামাজিক আদর্শ অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কবি পুরাতনের অন্ধ বিশ্বাসী নন, যাহা বুঝেন না তাহার ভক্ত নন, প্রচারও করেন না। তিনি নিজেকে বুঝিবার চেষ্টা করিবার কথা বলিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার মাপকাটি হইতেছে—যুক্তি। এতদ্বারা এই স্থলে আমরা তাঁহাকে "যুক্তিবাদী" বলিতে পারি।

এর পর আসে, সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে কবির মনোভাব। "মন্দির ও মসজিদ" প্রবন্ধে কবি বলিতেছেন, "আবার হিন্দু মুসলমানী কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে! প্রথমে কথা কাটাকাটি। তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্ত্তনাদ করিতেছে—"বাবাগো, মাগো"!—মাতৃ পরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্ম্মের শিশু যেমন করিয়া একস্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে! দেখিলাম, হত আহতদের ক্রন্দনে মস্‌জিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্ব্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চির-কলঙ্কিত হইয়া রহিল! ভূতে-পাওয়ার মত ইহাদের মন্দিরে পাইয়াছে। ইহাদের মসজিদে পাইয়াছে! ইহাদের বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।···মানুষের পশু প্রবৃত্তির সুবিধা লইয়া ধর্ম্মমদান্ধদের নাচাইয়া কত কাপুরুষ না আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল"!

পুনঃ, "হিন্দু-মুসলমান" প্রবন্ধে কবি বলিতেছেন, "একদিন গুরুদেব রবীন্দ্র-

নাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিলো আমার, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বল্‌লেন দেখ, যে ন্যাজ বাইরের তাকে কাটা যায়, কিন্তু, ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে? হিন্দু-মুসলমানের কথা মনে উঠলে আমার বারে বারে গুরুদেবের ঐ কথাটাই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও উদয় হয় মনে, যে, এ ন্যাজ গজাল কি ক'রে? এর আদি উদ্ভব কোথায়?...আমার মনে হয় টিকিতে ও দাড়িতে।...অবতার পয়গম্বর কেউ বলেন নি আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি। আমি ক্রিশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন আমরা মানুষের জন্য এসেছি আলোর মত সকলের জন্য।" এই প্রবন্ধে কবি সাম্প্রদায়িক অশান্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন যে পুরোহিতবাদ বা বাহ্য ক্রিয়া কলাপ দ্বারাই মানুষে মানুষে প্রভেদ উৎপাদন করায়। এই সব ব্যাপারই বনিয়াদি স্বার্থ হইয়া উঠে।

এই সব উক্তি দ্বারা আমরা কবি নজরুলের জাতীয়তা ভাবের ও তাঁহার আদর্শের পরিচয় পাই। ইহা দ্বারা আমরা অনুভব করি যে, সাধারণ-ভাবে যাহাকে "জাতীয়তাবাদ" বলে তাহা তাঁহার লক্ষ্য নয়। তাঁহার এই আদর্শ "ভারত ভারতবাসীর জন্য" এই বুলিতে পর্য্যবসিত হয় নাই। তাঁহার লক্ষ্য মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি। এই জন্য তিনি কেবল রাজনীতিক পরিবর্ত্তন চান নাই, সমাজকেও সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এই সমাজ-বিপ্লব যে অর্থনীতিক বিপ্লব সাপেক্ষ তাহা তিনি মানস চক্ষুতে দেখিতে পান নি।

তাঁহার জাতীয়তাবাদীয় সাহিত্যের মধ্যে আমরা একটু বাঙ্গলার পূর্ব্বেকার তথাকথিত বৈপ্লবিকদের কার্য্যের ইঙ্গিত পাই। অসহযোগ আন্দোলনের বন্যায় তিনিও ভাসিয়া যান। তজ্জন্য কারাবরণও করেন। "রাজ-বন্দীর চিঠি" তাহার প্রমাণ। এই সময়কার কাল ইঙ্গিত করিয়াই তিনি বলিয়াছেন, "এই স্বাবলম্বন, এই নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস ক'রতেই শিখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধীজি। কিন্তু আমরা তাঁর কথা বুঝলাম না, 'আমি আছি' এই কথা না বলে সবাই বলতে

লাগলাম, 'গান্ধীজি আছেন'! এই পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় ক'রে ফেললে। একেই বলে সব চেয়ে বড় দাসত্ব।...নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে অন্য এক-জন মহাপুরুষকে প্রাণপণে ভক্তি ক'রলেই যদি দেশ উদ্ধার হয়ে যেত, তা হ'লে এই তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ এতদিন পরাধীন থাকত না।"

এই উক্তি দ্বারা দৃষ্ট হয় যে, গান্ধীবাদীদের হইতে তিনি নিজেকে পৃথক করিয়া নিজের পথ বাছিয়া নিয়াছিলেন। ইহার পর, বোধ হয় তিনি কোন কোন ভূত-পূর্ব্ব বৈপ্লবিকের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহাদের অতীত কার্য্যের কাহিনী শ্রবণ করেন। এই সময়েই ৺শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "পথের দাবী" প্রকাশিত হয়। এই সময়েরই পুস্তক হইতেছে কবির "কুহেলিকা"। এই পুস্তক অতি উচ্চ দরের সাহিত্য। এই নভেলে লেখক তথাকথিত হিন্দু সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিকের সহিত মুসলমান যুবকেরও দেশপ্রেমজনিত ত্যাগের অতি উচ্চাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। "প্রমত্-দা"র নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার জন্য জমিদার-পুত্র জাহাঙ্গীর প্রাণ বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প ও শেষে দ্বীপান্তর গমন, এই বর্ণনা গঙ্গা ও যমুনার মিলন ন্যায় সুমহান হইয়াছে।

এই পুস্তকে কবি ভারতবর্ষ ও জাতীয়তাবাদের প্রচলিত অর্থের উর্দ্ধে উঠিয়াছেন। তাই তিনি বৈপ্লবিক নেতা প্রমথের মুখ দিয়া বলিতেছেন, "আমার ভারত ও মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে অনিম! আমার ভারতবর্ষ,—ভারতের এই মূক দরিদ্র নিরন্ন পর-পদদলিত তেত্রিশ কোটী মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন-তীর্থ; ওরে, এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মস্জিদের ভারতবর্ষ নয়—এ আমার মানুষের—মহামানুষের মহা-ভারত।" অন্যপক্ষে স্বদেশ-মন্ত্রে দীক্ষিত জমিদার-পুত্র জাহাঙ্গীর বলিতেছে, "ওগো ধরিত্রী মা, আজ হ'তে আমি তোমার ক্লেদাক্ত ধূলি-মাখা সন্তান—এই হোক আমার সব চেয়ে বড় পরিচয়"! পরে যখন প্রমথ মনঃদুখে সন্তপ্ত জাহাঙ্গীরকে সান্তনা দিবার জন্য বলিলেন, "আমাদের মন্ত্র তুমি ভুলে যাচ্ছ জাহাঙ্গীর। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী' আমাদের ইষ্ট মন্ত্র।" জাহাঙ্গীর তখনো চিত্র-ভারত বুকে

ধরিয়া উপুড় হইয়া কাঁদিতেছিল,—"শুধু তুমি, জন্মভূমি আমার, শুধু একা স্বর্গাদপি গরিয়সী,—আর কেউ নয়, আর কেউ নয়" !

ভারতবর্ষের এই ব্যাখ্যা, নিরন্ন পদ-দলিত, শোষিত লোকদেরই নিয়া যে ভারতবর্ষ, তাহা পরের যুগের কবির সাহিত্যে আরও পরিস্ফুট হয়। এই যুগে তিনি, জনকতক ভারতীয় কমুনিস্টের সংস্পর্শে আসেন। এই সময়ে কবিকে শোষিত সর্ব্বহারাদের প্রতিভূরূপে দেখিতে পাই। সেই সময়ে তাঁহার বীণায় নূতন ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়। তাই তিনি বলিতেছেন,

"সাম্যের গান গাই—

আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।" পুনঃ, এই রূপে তিনি "কৃষাণের গান", "ধীবরের গান", "শ্রমিকের গান", "সাম্যবাদের গান" "মানুষের গান", প্রভৃতি গান তখনকার নব প্রতিষ্ঠিত "লাঙল" পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। এই সব গানে তিনি গণ-শ্রেণীদের দুঃখের কথা, তাহাদের উপর উচ্চশ্রেণীদের শোষণের কথা ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব গানগুলি আজ সারা বাঙ্গলার সম্পত্তি হইয়াছে। এতৎব্যতীত, তিনি বুর্জোয়া সমাজের মাপকাঠি দ্বারা পাপপুণ্যের বিচার করাকে ঘৃণা করিয়াই বলিয়াছেন,

"যত পাপীতাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই…
অন্যের পাপ গণিবার আগে নিজেদের পাপ গোণো।"

এই তর্ক ধরিয়াই তিনি আবার চোর ডাকাতকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :

"কে তোমায় বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে ?
চারিদিকে বাজে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরি রাজ্য চলে।
ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছ বড়।
যারা যত বড় ডাকাত দস্যু, দাগাবাজ,
তারা তত বড় সন্ন্যাসী গুণী জাতি সঙ্ঘেতে আজ"।

এই সময়ে সাম্যের গান গাহিবার কালে তিনি গাহিয়াছেন :

"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহিয়ান
যাহারা আনিল গ্রন্থ কেতাব
সেই মানুষের মেরে পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।

মূর্খরা সব শোনো মানুষ এনেছে গ্রন্থ ;
গ্রন্থ আনে নি মানুষ কোনো।"

এই স্থলে সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গলা ভাষার বড় কবি চণ্ডীদাসের সেই অমর বাণী "শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই" তাহারই প্রতিধ্বনি পাই। চণ্ডীদাসের প্রায় ছয় শত বৎসর বাদে বাঙ্গলা সাহিত্যে আবার সেই ধ্বনি উত্থিত হয়। আর, আশ্চর্য্যের কথা, উভয় কবিই বীরভূমের মাটিতে উৎপন্ন! চণ্ডীদাসের সময়ের পর, বাঙ্গলা সাহিত্যের কত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে; কত ভাব বন্যার স্রোত তাহাতে আসিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানের গণসমূহের কবি নজরুল ইসলাম যে নূতন রূপ সাহিত্যে প্রদান করিয়াছেন তাহা অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয় থাকিবে। নব-শিক্ষিত বুর্জোয়া সমাজের কবি,

"বাজরে সিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন বিপুল ভবে
ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়"

বলিয়া শিক্ষিতদের মাতাইয়াছেন; কিন্তু এই "সব" অর্থে কেবল শিক্ষিত লোক নয় ইহার বেশীর ভাগ লোকই যে ধীবর, চাষী, মজুর, দরিদ্র শ্রেণী সমূহ তাহা কবি নজরুলের বীণার ঝঙ্কারেই প্রথমে লোকদের মনে চেতনা আনিয়া দেয়। সর্ব্বহারার দল, গণশ্রেণীর দল তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিবে যে তিনি তাঁহাদের মনোবেদনা সর্ব্বপ্রথমে বীণার সুরে সকলের কর্ণগোচর করিয়াছেন।

কিন্তু কবি নজরুলের কবিতার মর্ম্ম বুঝিতে গেলে তাঁহাকে তাঁহার জাতীয়তাবাদীয় বা সাম্যবাদীয় কবিতা সমূহ দিয়া বুঝিলে চলিবে না। তিনি নিজে একজন ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতাবাদী অর্থাৎ ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্রের কথায় তিনি একজন Intellectual Anarchist। "নিজেকে জান" এই ধ্বনিই তাঁহার সর্ব্বপ্রকারের কবিতা মধ্য দিয়া উত্থিত হইয়াছে। এই ধ্বনিই তিনি সর্ব্বস্থানে তূর্য্যনিনাদে ঘোষিত করিয়াছেন।

শেষের কথা, তিনি একজন আশাবাদী। ভবিষ্যতের প্রতি তিনি আশা-

ম্বিত। এই আশার বাণী তিনি স্পষ্ট রূপে ছাত্রদের উল্লেখ করিয়া "ছাত্রদল" নামক কবিতায় বজ্র নির্ঘোষে প্রচার করিয়াছেন :

"কবে সে খোয়ালী পাতসাহি
সেই অতীতে আজও চাহি

* * *

ফেলিস অশ্রুজল
আমরা ধুলায় গড়িব তাজমহল।"

আমরা পুনরায় গৌরবের সৌধ নির্ম্মাণ করিব, পূর্ব্বের গরিমার কথা স্মরণ করিয়া আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিব না, ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে আছে, তাহা আরও উজ্জলতর হইবে; এই কথাই তরুণ ছাত্রদের তিনি সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন। এতদ্বারা যাহা দার্শনিক ভাষায় optimist (আশাবাদী) বলে তিনি তাহাই।

কবি নজরুল ইসলাম বাঙ্গলা সাহিত্যে যে অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছেন, জানি না কয়জন তাহার মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। তিনি "হিন্দু কি মুসলমান", একথা কে জিজ্ঞাসা করে? তিনি নিজেই এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন :

"হিন্দু না ওরা মুসলমান"? ওই জিজ্ঞাসে কোনজন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র"!

কবি নজরুল ইসলাম নব বাঙ্গলার তথা সমগ্র নব ভারতের আশাপ্রদান-কারী কবি। তিনি অনাগতকালের কবি। তিনি শ্রেণীচ্যুত বুদ্ধিজীবি (de-classed intellectual) ভারতের স্বাধীনতাকামীদের প্রতীক!

এইজন্য তাঁহার সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক বা বুর্জোয়াতন্ত্রীয় ভাবধারা স্থান পায় নাই। তাঁহার সাহিত্যে প্রগতি বিশিষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তাঁহার সাহিত্য Neo-realist ও Sensate লক্ষণযুক্ত।

মৌলুবী আবদুল কাদির ও মৌলুবী রিজায়ুল করিম সম্পাদিত "কাব্যমালঞ্চ" নামক পুস্তকে একশত পনেরজন মুসলমান কবির কবিতা ও গজল সংগৃহীত করা

হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চদশ খৃঃ শতাব্দীথেকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত মুসলমান কবির বাঙ্গলায় লিখিত কবিতার উল্লেখ আছে।

এই মুসলমানীয় কবিদের মধ্যে ইহা দৃষ্ট হয় যে শেখ ফৈজুল্লাদের "গোরক্ষবিজয়" পুস্তক 'নাথধর্ম্ম' সংক্রান্ত। শেখ চাঁন্দের "রসুলবিজয়" বৈষ্ণব ভাবধারাবলম্বনে লিখিত। সৈয়দসুলতানের "জ্ঞানপ্রদীপ" যোগাচার সম্বন্ধে লিখিত। কাজী দৌলৎউজীর বাহরম খাঁর "লয়লামজনু" ফার্শী হইতে অনূদিত। কাজী দৌলতের "লোরচন্দ্রানী" এবং সৈয়দ আলাওলের "পদ্মাবতী" হিন্দীভাষা হইতে অনূদিত। তৎপর বহু মুসলমানকবি ব্রজবুলীতে বৈষ্ণবপদাবলী রচনা করিয়াছেন। ইহাঁদের কিঞ্চিৎ উল্লেখও এই পুস্তকে করা হইয়াছে। পুনঃ কারবেলার বিয়োগান্ত ঘটনা নিয়া মহম্মদ রাজা "মকতুল হোসেন" প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। আবার, সমসের গাজীর পুঁথীতে ধর্ম্মসমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের আরাধ্য দেবেরা স্থান পাইয়াছেন।

শেষে উনবিংশ শতাব্দীতে মীর মশারফ হোসেন "বিষাদ-সিন্ধু" রচনা করেন। ইহা কারবেলা সংক্রান্ত সাহিত্য। কবি কায়কোবাদও এই যুগে ছিলেন। শেষে উদয় হন কবি নজরুল ইসলাম। এই যুগে নানা মুসলমান কবি ও লেখক বর্ত্তমান আছেন।

এই সাহিত্যমধ্যে "গোরক্ষবিজয়" হইতে "বিষাদ-সিন্ধু" পর্য্যন্ত পুস্তকগুলি ধর্ম্মসংক্রান্ত। এই সাহিত্যে প্রগতির সংবাদ নাই। এই জন্য আমরা ইহাকে সামন্ততান্ত্রিক ও Ideational বলিয়া আখ্যাপ্রদান করি। নজরুলের সাহিত্যে উপনীত হইলে আমরা প্রগতির সন্ধান পাই।*

আজকালকার অনেক লেখক মধ্যবিত্তশ্রেণীয় নায়ক ও নায়িকাকে কেন্দ্র করিয়া নভেল নাটক লিখিয়াছেন। কিন্তু কেবল মধ্য-শ্রেণীয়, নায়ক নায়িকার গল্প নিয়া একটা বুর্জোয়া সাহিত্য গড়িয়া উঠে না। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী

* এই পুস্তকখানি প্রেস হইতে বহির্গত হইবার অগ্রমূহুর্ত্তে "কাব্য-মালঞ্চের" সন্ধান লেখকের কাছে আসে। এইজন্য বিশষভাবে আলোচনা করা এইস্থলে সম্ভব হইল না। এই হেতু সম্পাদক মহোদয়দের কাছে গ্রন্থকার মার্জ্জনা চাহিতেছেন।

ও আমেরিকার সাহিত্যকে যেমন আমরা সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া সাহিত্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি, সেই প্রকারে সামন্ততন্ত্রীয় যুগের প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ও তাঁহার কৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠে তাহাকেই বুর্জোয়া সাহিত্য বলে। রোঁমা রোলাঁর ও জোলার পুস্তক সমূহ, আমেরিকার এমারসন, হুইটিয়ার, লংফেলো, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রভৃতি এই সাহিত্যিক যুগের প্রতীক। সমাজ সম্পূর্ণরূপে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থোদ্দেশে চালিত হইলে সেই সমাজের সাহিত্যও নিজের নূতন খাত সৃষ্টি করে।

অবশ্য বাঙ্গালার সমাজ এখনও সম্পূর্ণ ভাবে "বুর্জোয়াত্ব" প্রাপ্ত হয় নাই, সেইজন্য আমরা একটা খাঁটি বুর্জোয়া সাহিত্য এখনও উদ্ভূত হইতে দেখি না ; কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাহিনী নিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহা এখনও প্রাচীনের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। বুর্জোয়া সাহিত্যে সাধারণতঃ আমরা আধুনিক লেখকের চরিত্র অঙ্কিত হইতে দেখি। তাহারা প্রাচীনের মোহ কাটাইয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশলে জগতের ধনসম্পদ ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত! এই জন্য তাহারা প্রাচীন আইন, বিধিনিষেধ, সমাজ বন্ধন ছেদ করিয়া সমাজকে নূতন ছাঁচে গড়িতে চায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরিকা, ফ্রান্স, কমালের তুর্কি প্রভৃতি। কিন্তু আমাদের হালের সাহিত্যে সামাজিক আবর্ত্তনের সেই সুর কোথায়?

তবে আধুনিক সময়ে এক প্রকার নূতন সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছিল যাহা একটা বুর্জোয়া সাহিত্যের দিকে যাইতেছিল বলিয়া অনুমিত হইত। কিন্তু তাহা কেবল "এডিপুস কমপ্লেক্সের" অনুসরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। কিন্তু এই যুগের সামাজিক ইতিহাস ইহাতে যথার্থভাবে চিত্রিত হইয়াছে কি? ইহা ১৯১৮ খৃঃ পরের ইউরোপের অবসাদের অবস্থার হুবহু নকল মাত্র!

রুশের ১৯০৫ খৃঃ বিপ্লব নিষ্ফল হওয়ায় তথাকার কর্ম্মীদের মধ্যে ভীষণ মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটে। তখন, নানা প্রকার যৌন সম্বন্ধীয় পুস্তক, ক্লাব প্রভৃতি তাহাদের মধ্য হইতে উদ্ভূত হয়। রাজনীতিক ও সামাজিক মুক্তি অপ্রাপ্য

হওয়ায়, হতাশ বৈপ্লবিকেরা যৌন সম্বন্ধীয় মুক্তির সন্ধানে বহির্গত হয় (Masaryk-এর Spirit of Russia দ্রষ্টব্য)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর খৃষ্টাব্দের রুশ যুবকগণ যথার্থ জীবন হইতে সম্পর্ক বিহীন হওয়ায় ব্যক্তিত্ববাদীর হতাশতার গম্ভীরতা ডস্টয়েভস্কি তাঁহার নায়কে মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকারের নায়কেরাই নিট্‌চের ব্যক্তিত্ববাদীয় দার্শনিক মতের লক্ষণ স্বীয় জীবনে প্রকাশ করে। রুশ সাভিনকফও এই বিফলতার প্রেরণায় বলিয়াছিলেন: "There is no morality, there is only beauty and beauty is the free development of personality, the unrestrained unfolding of all that lies within its soul" (নীতি বলিয়া কিছু নাই, কেবল সৌন্দর্য্যই আছে। আর, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশই হইতেছে সৌন্দর্য্য, যাহা হইতেছে নিজের আত্মার অভ্যন্তরের সমস্ত জিনিসের অবাধ বিকাশ)। এই বিষয়ে ম্যাক্সিম গর্কি উপহাস করিয়া বলিয়াছেন,—আমরা ভাল করিয়াই জানি বুর্জোয়া ব্যক্তিত্বের আত্মা কি পচাদ্রব্যে ভারাক্রান্ত হইয়া আছে (Problems of Soviet Literature দ্রষ্টব্য)।

এই প্রকারের অবসাদ প্রাপ্ত বৈপ্লবিক কর্ম্মীদের দূষিত চরিত্রের নমুনা অ্যালেক্সি টলষ্টয় তাঁহার Road to Calvary নামক নভেলে কিঞ্চিত চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন।

১৯১৮খৃঃ যুদ্ধে পরাজয়ের পর, জার্ম্মাণীরও এই প্রকারের নৈতিক দশা বিকাশ পায়। গুপ্তভাবে Pornological club (যৌন সম্বন্ধীয় ক্লাব), Frei Mensch (স্বাধীন মানব) নামক যৌনসম্বন্ধীয় পত্রিকা, রাত্রিকালীন উলঙ্গ নৃত্যের স্থান প্রভৃতির উদয় হয়। পুলিশ কিছুতেই তাহা প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। ইহারই প্রতিবাদে এবম্প্রকারের এক কাগজের সম্পাদক পুলিশের বড়কর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিল:—"অমুক অধ্যাপক, এই গতিতে আপনি বাধা দিবেন না; যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ যৌন সম্বন্ধের অবাধগতি এখন চলিতেছে।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভারতে কি রুশের ১৯০৫ খৃঃ এবং জার্ম্মাণীর ১৯১৮ খৃঃ ন্যায় রাজনীতিক অবসাদ আসিয়াছিল?

না ইহা বৈদেশিক অনুষ্ঠান ধার করিয়া এদেশের সাহিত্যে আরোপ করা হইয়াছিল ?

পরাধীন জাতির লোক সামাজিক একত্ববোধ হারায়, তাহার সামাজিক চেতনা লোপ পায়, সে কেবল "চাচা আপন বাঁচা" নামক নীতি উদ্ভূত করিয়া দায়িত্বহীন ব্যক্তিত্বই বিকাশ করিবার চেষ্টা করে। "দশ মানেই দেশ, এবং দশে মিলেই সমাজ" এবং এই সমাজের একজন লোক বলিয়া তৎপ্রতি তাহার কর্ত্তব্য আছে এবং তাহার প্রতি সমাজেরও দায়িত্ব আছে, এই মনোভাব পরাধীন জাতি হারায় বা তাহা বিবর্ত্তিত করিতে পারে না। এই জন্য নানাপ্রকার উদ্ভট মতবাদ দ্বারা জাতীয় দুর্গতি, দৈন্য ও দুর্দ্দশা ঢাকিবার চেষ্টা করা হয়। পরাধীন জাতির মধ্যেই ব্যক্তিত্ববাদের অবাধগতির কথা শুনা যায়। এই কারণবশতই এই দেশে "সমাজের নেতৃত্ব" ও "সমাজের দায়িত্ব" প্রভৃতি তথ্য বৈদেশিক বিপ্লববাদীর কথা বলিয়া অনেকের কানে প্রতীয়মান হয়!

এই সব কারণবশতঃ উপরোক্ত সাহিত্যকে পূর্ণভাবে বুর্জোয়া সাহিত্য বলা যায় না। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বর্ত্তমান ভারতীয় রাজনীতিক পরিস্থিতিতে চরখা, খদ্দর, অহিংসা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অভ্যুদয় হইয়াছে এবং এই সঙ্গে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন আন্দোলন ও সংযোজিত হইয়াছে। অবশ্য, অস্পৃশ্যদের নিয়া একটা নভেল রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সব আন্দোলন একটা বিশিষ্ট সাহিত্য উদ্ভব করিতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্যভূভাগে রাজনীতিক অবস্থা এবং নবোত্থিত পুঁজিবাদ তৎসঙ্গে মিলিত হওয়ায় যে রাষ্ট্রিক-অর্থনীতিক পরিস্থিতির উদয় হয়, তাহাতে শোষিত গণসমূহের হাহুতাসের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্নদেশে যে কুটির শিল্প ও অহিংসাবাদের আন্দোলন সৃষ্ট হয় তদ্রূপ, ভারতীয় এই আন্দোলনও পাশ্চাত্য রাসকিন, হেনরী জর্জ্জ ও টলষ্টয়ের ভাবধারা এই দেশে আনয়ন করিয়াছিল। হতাশতার প্রতীকরূপে এই আন্দোলন খৃঃ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে ভারতে আবির্ভূত হয়। সেইজন্য উল্লেখযোগ্য একটা প্রাণবন্ত সাহিত্য এই আন্দোলন সৃষ্ট করিতে পারে নাই।

একটা জাতির অধঃপতনের অবস্থায়ই কালব্যতিক্রম দ্বারা নানাপ্রকার উদ্ভট উপায় অনুষ্ঠিত হয়। এই মানসিক অবস্থায় একদল জাতির ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস হারায় এবং 'যাহা হবার তাহা হবে' বলিয়া হা-হুতাস করিয়া দিন কাটায় বা কেবল বিদেশকে স্বর্গরাজ্য বলিয়া তাহার গুণগাণ করিয়া বেড়ায়। এই জাতীয় অবসাদকে তাহারা "আন্তর্জ্জাতিকতা" বলিয়া ঢাকা দেয়। এই প্রকারে দেশের প্রতি বিশ্বাস হারান দ্বারা দেশেরই ক্ষতি সাধিত হয়। ফ্রান্সেও খৃঃ ১৮৭০ যুদ্ধের পরাজয়ের পর, এই প্রকারের অবসাদ আসে, কিন্তু কালে তাহার প্রতিক্রিয়ারও আভির্ভাব হয়, কারণ কোন জাতিই কেবল "নেতি নেতি" ভাব লইয়া চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। Neo-Realists নামক সাহিত্যিক দল উঠিয়া এই মানসিক অবসাদের অবসান ঘটায়। তাহারা যন্ত্র-তান্ত্রিক সভ্যতাপ্রসূত নূতন নগর, তাহার সজ্জ, তাহার কারখানা, রেলওয়ে ষ্টেসন প্রভৃতিতে বিংশশতাব্দীর ক্ষমতা ও শক্তির বিকাশ দেখিতে পায়। এক কথায় বর্ত্তমানের নূতন জীবনের সৃষ্টি শক্তি ও তাহার সৌন্দর্য্যের সন্ধান তাহারা পায়। এতদ্বারাই তাহারা ফ্রান্সকে পুনর্জ্জীবিত করিতে সক্ষম হয়। এক্ষণে দ্রষ্টব্য যে বাঙ্গলায় সভ্যতার বর্ত্তমান ঘাতপ্রতিঘাতে কি ভাবধারা সাহিত্য মধ্যে উদয় হইয়াছে।

বর্ত্তমান সাহিত্য মধ্যে নূতন ভাবধারার অন্বেষনার্থ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে দৃষ্ট হয় যে, ইহা ক্রমশঃ বিরাটাকার ধারণ করিতেছে। নানা ভাবধারা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তন্মধ্যে প্রধান সুর যাহা ইহাতে বাজিয়া উঠিতেছে তাহা বর্ত্তমানের নবীন সাহিত্যিকেরা বাস্তবকে রূপ প্রদান করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই বিশাল সাহিত্যের সম্পূর্ণ আলোচনা এই স্থলে সম্ভব নহে, কিন্তু দুএক কথায় বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি বিষয়ে আলোচনা এই স্থলে লিপিবদ্ধ হইল। প্রথমে ইহা প্রতীত হয় যে, নূতন সাহিত্যের বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত হইতে কায়িক শ্রমকারী শ্রেণী সমূহ পর্য্যন্তের জীবন যাত্রার চিত্র প্রকাশ করিয়াছে। এতদ্বারা স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে বাঙ্গলা সাহিত্যে একটা নূতন

হাওয়া বহিতেছে। এই সাহিত্য হয় 'জন' না হয় 'গণ' শ্রেণীর দৈনন্দিন জীবনের সন্ধানে নিযুক্ত আছে। এই বিষয়ে কেহ কেহ কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া প্রতীত হয়।

এই সাহিত্যের পর্য্যালোচনা করিলে, নিম্নলিখিত ভাবধারা প্রাপ্ত হওয়া যায়ঃ "ভূয়োদর্শন" প্রভৃতি পুস্তকে আমরা Impressionist এবং Ideational ভাব পাই। এই ধরনের সাহিত্য আদৌ প্রগতিশীল নহে।

"গড্ডালিকা" এবং "কজ্জলী" পুস্তকের গল্পগুলি Impressionist, এবং Ideational লক্ষণযুক্ত। ইহাতে প্রগতি নাই। Humour আছে কিন্তু 'গড্ডালিকা' ও 'বিরিঞ্চিবাবা' নামক গল্প দুইটি বাস্তব ঘটনার চিত্র দিয়াছে। এই দেশে প্রতিনিয়তই এই প্রকারের ধর্ম্মের নামে প্রবঞ্চনা চলিতেছে, এই গল্প দুইটি Realist এবং Sensate লক্ষণক্রান্ত। ১৯০৭ সালে কলিকাতায় এক আমেরিকান কোম্পানী ধর্ম্মের নামে বিরিঞ্চ বাবার ন্যায় জুয়াচুরীর দৃশ্য চালাইত। শেষে কয়েকজন যুবক তাহা ধরিয়া মারধর করিতে তাহারা পালায়।

"উপনিবেশ" পুস্তকে গঙ্গার 'ব' দ্বীপের পূর্ব্বস্থানে মগ ও ফিরিঙ্গিদের বর্ত্তমান বংশধরদের কলহ ও ভয়াবহ জীবন অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা Neo-realistic অর্থাৎ বাস্তবকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা চিত্রিত করা হইয়াছে, এবং Sensate লক্ষণ যুক্ত।

"কয়লা-কুঠি" সাঁওতাল শ্রমিকদের জীবনী প্রকাশ করিয়াছে। ইহা Impressionist এবং mixed লক্ষণযুক্ত। "পাঁক" পুস্তকে শ্রমজীবির বাস্তব জীবন চিত্রিত হইয়াছে। ইহা Neo-Realist এবং mixed লক্ষণযুক্ত।

"পদ্মানদীর মাঝি"তে আমরা ফরিদপুর জেলার উক্তশ্রেণীর লোকদের জীবন যাত্রার সন্ধান পাই। ইহা Realist এবং Sensate লক্ষণযুক্ত।

"নোঙরহীন নৌকায়" আমরা ভূমিশূন্য কৃষকের অবস্থা এবং হুগলীর কারখানার স্ত্রী ও পুরুষ শ্রমিকদের জীবনধারার কিঞ্চিৎ সংবাদ পাই। ইহা Neo-Realist এবং Sensate লক্ষণযুক্ত।

"একদা" জীবনের পরিবর্ত্তনের কিঞ্চিৎ বাস্তব ছাপ অঙ্কিত করেছে। ইহা Neo-realist ও mixed লক্ষণযুক্ত। "ডেটিনিউ" realist-impressionist এবং mixed লক্ষণযুক্ত !

"সহরতলী"তে একদল শ্রমজীবির জীবনের ধারা লোকচক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, ইহা Realist এবং mixed লক্ষণযুক্ত। "ফসিল" নানা ভঙ্গীর গল্পের সমাবেশ। "রাই কমল", "বিনোদিনী" প্রভৃতিতে জাতি বৈষ্ণবদের জীবনধারা শিক্ষিত শ্রেণীর সহিত পরিচিত করা হইয়াছে। এইগুলি impressionist এবং mixed লক্ষণযুক্ত। "বেদিনী"তে এই শ্রেণীর সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যপক্ষে, 'ধাতৃদেবতা,' 'গণদেবতা,' 'কালিন্দী, 'মরামাটি' প্রভৃতি নভেলে আমরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসের শেষাবস্থাই চিত্রিত হইতে দেখি। এইগুলিতে বাস্তবচিত্রের কিঞ্চিৎ ছাপ আছে, এইজন্য ইহা Neo-realist এবং mixed লক্ষণযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। পুনঃ, "আদর্শ হিন্দু হোটেল" পুস্তকে গরীব শ্রমজীবীর জীবন সংগ্রামের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা Expressionist এবং mixed লক্ষণযুক্ত।

এতদ্বারা দৃষ্ট হয় যে বাঙ্গলা সাহিত্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপস্থিত কালের গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই সৃষ্ট হইতেছে। যে শ্রেণী কার্য্যতঃ শ্রমজীবী শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে অথচ বংশ ও জাত্যাভিমান বশতঃ নিজের অর্থনীতিক পদ স্বীকার করিতে রাজী নয় সেই শ্রেণীরই জীবনের 'ট্র্যাজেডি' (বিয়োগান্তে নাটক) উদ্ঘাটনে বর্ত্তমানের সাহিত্যিকেরা রত। ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বভাববশতঃ সমাজে এই সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে এবং এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রেরণাতেই এই সাহিত্যের উদয় হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের ভাবধারা পরিত্যাগ করিয়া বাস্তব ও তুলনামূলক চিন্তাপ্রণোদিত হইয়া এই সাহিত্য নূতন পথের অনুসন্ধান করিতেছে। কিন্তু ইহা জনের সন্ধান দিতেছে বটে তথাপি পাশ্চাত্য মাপকাটির বুর্জোয়া সাহিত্য নহে। ইহার বেশীর ভাগ স্থলে বর্ত্তমানকালের ভাঙ্গনেরূ চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছে। "আদর্শ হিন্দু হোটেল" ব্যতীত আশাবাদ ইহাতে দৃষ্ট হয়

না। ইহা বাঙ্গলার Decadent যুগেরই আর একটী চিত্র প্রদর্শন করিয়াছে।

এই সাহিত্য পূর্ব্বের সনাতনী খাত হইতে বাহির হইতেছে বলিয়া ইহা আপেক্ষিক প্রগতিশীল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে।

শেষে আসে বর্ত্তমানের সাময়িক সাহিত্য। ভীষণ রাজনীতিক, অর্থনীতিক বিভীষিকা ও দুঃভিক্ষ বাঙ্গলায় যে "ঝটিকাও অশনিপাতের যুগ" সৃষ্ট করিয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ চিত্র আমরা নিম্নলিখিত সাহিত্যে পাই। বর্ত্তমান বাঙ্গলার গরীবের সমাজ কি প্রকারে এই ঝটিকা ও অশনিপাতের দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে এবং হইতেছে, "অঙ্গার", "মহামন্বন্তর" "পদচিহ্ন" তাহা চিত্রিত করিয়াছে। গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনী কি প্রকারে দারিদ্র্যের তাড়নায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং চরিত্র কলুষিত হইতেছে তাহা এই সকল পুস্তকে অঙ্কিত হইয়াছে। অবশ্য ইহা সমাজের ভাঙ্গনেরই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, ইহাতে জীবনের নিরাশাই পরিস্ফুট হইয়াছে। পাঠক হয়ত বলিবেন ইহা কি সত্য, কিন্তু আসল সত্য আরও ভীষণ। এই শ্রেণীর সাহিত্য Neo-realistic impre-ssionist এবং Sensate লক্ষণাক্রান্ত।

"দুর্ভিক্ষ" নামক পুস্তক কবিতা এবং গদ্যে লিখিত। ইহা Neo-realistic এবং mixed অর্থাৎ Idealistic লক্ষণ যুক্ত।

কিন্তু এই সব সাহিত্যের মধ্যে কোন কোন পুস্তক পারস্পরিক রাজনীতিক দলাদলির কটাক্ষপাত বিমুক্ত নহে। ইহাই দুঃখের কথা।

"মানুষ" পুস্তকে দুঃখী মানুষের গল্পই লিখিত হইয়াছে। ইহা Neo-realist এবং Sensate লক্ষণ যুক্ত।

"ভূখা-হুঁ" পুস্তকে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলে কি করিয়া গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীয় পরিবার শোচনীয়তার চরম সীমায় উপনীত হইল তাহার এক চিত্র প্রদত্ত আছে। ইহা Realistic-impressionist এবং Sensate লক্ষণ যুক্ত। ইহাতে বায়স্কোপ অভিনেতা অভিনেতৃদের জীবনীর সম্ভবপর চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহাতে প্রগতিশীল সাহিত্যের সন্ধান নাই।

"উদয়গড়" পুস্তকে সেবাব্রতী তরুণ ও তরুণী দ্বারা দুর্ভিক্ষ মধ্যে কর্ম্ম প্রচেষ্টা ও স্বার্থপর ব্যবসায়ীদের দ্বারা তাহা প্রতিহত করার গল্প বর্ণিত হইয়াছে। ইহা realist-impressionist এবং mixed লক্ষণযুক্ত।

"নবান্ন" পুস্তকে বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন কৃষকদের অন্নসমস্যার চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতেও পারস্পরিক রাজনীতিক দলাদলির ইঙ্গিত আছে। ইহা Neo-realist এবং mixed লক্ষণযুক্ত। ইহাতে প্রগতির চিহ্ন আছে।

"উদয়ের পথে" নামক পুস্তকে অনাগত কর্ম্মীর সম্বর্দ্ধনা হইয়াছে। ইহাতে বাস্তব ভিত্তিতে আদর্শবাদ বিজড়িত হইয়াছে। ইহা Neo-realist এবং mixed লক্ষণ যুক্ত। ইহাতে প্রগতিশীলতার স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে।

"নবীন যুবক" পুস্তকে শিক্ষিত নবীন যুবকের বেকার সমস্যা এবং তাহার মনস্তত্ত্ব অঙ্কিত হইয়াছে। এই বেকার অবস্থাতেও সে সমাজ সেবার চেষ্টা করিতেছে। অন্যদিকে ধনী শিক্ষিত যুবক অল্পায়াসেই কি প্রকারে সমাজে বরেণ্য হইতেছে এবং হাততালি পাইতেছে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে ফরাসী বিপ্লবের প্রাগসাহিত্য "ফিগারোর বিবাহ" নামক পুস্তক স্মৃতিপটে আসে। তথায়ও এই সমস্যা উদঘাটিত হইয়াছে। এই পুস্তক Neo-realist ও sensate ভাবযুক্ত। "প্রতিবিম্ব" নামক পুস্তকে লেখক নিজেই বলিয়াছেন, "মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত জাতীয়তাবাদী সাধারণ কর্ম্মী যুবকের মনে নবযুগের নতুন ভাবধারার প্রভাবে কি আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে; ভাবপ্রবণতা ও বাস্তব বোধের দ্বন্দ্ব কিরূপ নিয়াছে; সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কোন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করা উচিত এই নিয়ে যে দ্বিধা ও সংশয়ের ভারে সে ব্যাকুল হয়েছে···'প্রতিবিম্ব' তারই এক দিককে রূপ দেবার চেষ্টা"। এই পুস্তক Neo-realist ও sensate ভাবযুক্ত।

"নবীন যুবক" ও 'প্রতিবিম্ব' দেশের দুইটি বিভিন্ন কালের চিত্র আঁকিয়াছে।

একটী আর একটীর পরিপোষক সামাজিক চিত্র। শিক্ষিত নবীনযুবক 'ধর্ম্মাশ্রম' প্রভৃতির দ্বারা আর্ত্তের সেবা করিতে ব্যগ্র। সে নিজের কর্ম্মজীবনের গতি খুঁজিয়া পাইতেছে না। অন্য দিকে "প্রতিবিম্ব" পুস্তকে নবীন যুবক দলবদ্ধ হইয়া একটা নূতন কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতেছে। সে 'পার্টির' মধ্যে থাকিয়া 'ট্রেনড, ডিসিপ্লিন্‌ড' হইয়া একত্র 'কমুনে' বাস করিয়া কার্য্য করিতেছে। সে দেশের পরিচিত চাষী মজুরগুলোকে একবার চিনিয়া আসিতে হইবে, বলে। এই দুই পুস্তকে বাঙ্গালার তরুণের কর্ম্মের ক্রমবিকাশের পর্য্যায় চিত্রিত হইয়াছে। আজকের সমস্যা ও পরিস্থিতি কালকের নয়। সমাজের চাকা যে প্রতিনিয়তই ঘুরিতেছে, এই দুই পুস্তকেই তাহা চিত্রিত হইয়াছে। সত্যই লেখক বলিয়াছেন, কিছুকাল পরে, 'প্রতিবিম্ব' হয়ে যাবে 'পুরাণো ছবি'। এই সাহিত্য Symbolic এবং sensate লক্ষণযুক্ত।

এই প্রকারের নব-সাহিত্য বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। এই সাহিত্যে বাস্তবের ছাপ আছে এবং তাহা নূতন দৃষ্টি কোণ দ্বারা বর্ণিত হইতেছে বলিয়া, বর্ত্তমানের এই সাহিত্যকে এইস্থলে Neo-realist নাম প্রদত্ত হইল। পুনঃ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে তুলনামূলক বিচার দ্বারা গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ অযৌক্তিক ও ইন্দ্রিয়ের বহির্ভূত আদর্শের প্রচার ইহাতে নাই বলিয়া এই সাহিত্য Sensate বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু ইহা 'গণ-সাহিত্য' নয়। যেরূপ বুর্জোয়ার জীবনের বিবৃতিতে বুর্জোয়া সাহিত্য হয় না, তদ্রূপ গণশ্রেণীর জীবনসম্বন্ধে লিখিলেই তাহা 'গণ-সাহিত্য হয় না।

বাঙ্গলার সনাতনী অর্থাৎ অভিজাত-সাহিত্য এখন জমিদারের ও ধনীর ফটক পার হইতে পারে নাই, অবশ্য ইহাও একটা কাল-ব্যতিক্রম। পূর্ব্বেকার জন ও গণের জীবনী সম্বন্ধীয় নভেলগুলিতে জমিদার পুত্রই প্রজা বা গরীব গণশ্রেণীকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইতেছেন, আর কোন কোন স্থলে তাহার সহকারী হইতেছেন মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত! যেদিন গণশ্রেণীর লোক সাহিত্যে স্বীয় সমাজের চিত্র সাহিত্যে অঙ্কন করিবে, সেই দিন একটা জীবন্ত গণ-সাহিত্য উদ্ভূত হইবে।

সাহিত্যে প্রগতি

আজকাল দেশে প্রগতি-সাহিত্য বলিয়া রব উঠিয়াছে। ইহার মানে অনেকেই ধরিতে পারেন না। সাধারণ লোক বলিতেছেন, ইহা আবার কি? আর সনাতনী সাহিত্যিকরা বলিতেছেন, রস ও রূপ নিয়া সাহিত্য; সাহিত্যে পশ্চাদগমনশীলতাই বা কি আর প্রগতিই বা কি? সাহিত্যে একটা সনাতন ধারাই চলে, তাহা অখণ্ড এবং তাহা রস ও রূপের বিকাশই ব্যক্ত করে। অতএব সাহিত্যে এই কথার কোন মূল্য নাই।

এখন কথা এই, যাঁহার যা ধারণা তাহা তিনি নিজের হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন এবং লোক সমাজে প্রচার করিতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া সত্যের অপলাপ হয় না। এই স্থাণুবৎ নড়ন-চড়নশীলতা-বিহীন দেশে সকলেই জীবনের সব দিকেই সনাতন ও অখণ্ড ধারার প্রভাব দেখেন। যে দেশে সমাজ-ক্ষেত্রে, অর্থনীতিক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে, ভাষার ক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সনাতন ধারার আবিষ্কার করাই বাহাদুরী বলিয়া গণ্য হয়, সে দেশে সাহিত্যক্ষেত্রে সনাতন ও অখণ্ডভাব আবিষ্কার করা বিচিত্র নয়। এই চলমান শ্মশানরূপ ভারতীয় সমাজে সনাতন ধারার এবং আধ্যাত্মিকতার ও মাহাত্ম্যের যতই বাহাদুরী থাকুক না কেন তাহা বাস্তব নহে। সত্য এই যে, মানব সমাজ গতিশীল, স্থাণুবৎ স্থিতিশীল নহে। যে সমাজ স্থাণুবৎ জড়তাপ্রাপ্ত তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য এবং তাহা শ্মশানে পরিণত হয়। এই শ্মশানে সনাতন ধারার আবিষ্কার কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয় এবং তাহার অতীন্দ্রিয় (mystic) মাহাত্ম্যও কিছু নাই। বাস্তব কথা এই যে একটা জীবন্ত জাতির জীবনের সর্ব্ববিষয়ে পরিবর্ত্তনের যে অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় সাহিত্যে তাহা প্রতিফলিত হয়। এই জন্যই সাহিত্যের মধ্যে দিয়া একটা জাতির ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

সাহিত্যের এই অভিব্যক্তির অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় সাহিত্যকে যেমন বীর রসাত্মক, ধর্ম্মাত্মক প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা যায় আবার তেমনি অন্যান্য প্রকারেও বিভক্ত করা হয়।

ইহার মধ্যে একটী শ্রেণী বিভাগ হইতেছে নিম্নপ্রকারের :

প্রাচীন সাহিত্যগুলিতে আমরা নানা জনশ্রুতির মধ্যে কতকগুলি বীরের অমানুষিক বীরত্ব গাথার সংবাদ পাই, ইহাকে Heroic age বলা হয়। যথা Homer-এর Achilles, পারস্যের রোস্তম, ভারতের ভীষ্ম প্রভৃতির বীর গাথাকে Heroic age-এর অন্তর্গত বলা যায়। আবার Homer-এর Iliad, Virgil-এর Aenid, ফেরদৌসীর "শাহানামা" আর ভারতের রামায়ণ, মহাভারত classical age-এর পরিচয় প্রদান করে। তৎপরে আসে সামন্ততান্ত্রিক যুগের সাহিত্য। ইউরোপের এই যুগের সাহিত্যের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। ফরাসী চারণ রেঁালার Chansons (গীতি) এবং অন্যান্য চারণদের Geste-তে এই যুগের সমাজের চিত্র প্রকাশ করে। তৎপরে আসে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সমাজ। এই যুগে ইউরোপের সমাজতন্ত্র ধ্বংস করিয়া বুর্জ্জোয়া এবং ধনীতন্ত্রীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমাজ বলা হয়। ইউরোপের এই যুগের সাহিত্যে আমরা তাহার নিদর্শন পাই। ফ্রান্সের "ডুমা", "বালজাক" "ভিক্টর হুগো", "রেঁামা রেঁালা" প্রভৃতি সেই দেশের বুর্জ্জোয়া সমাজের চিত্র ও মনস্তত্ত্ব সাহিত্যে প্রকট করিয়াছেন। ইংলণ্ডে সেক্সপিয়রও সমাজের চিত্র তাঁহার নাটকসমূহে প্রকাশ করিয়াছেন। আর Dickens থেকে Galsworthy পর্য্যন্ত আধুনিক ইংরেজ লেখকেরা বুর্জ্জোয়া সমাজেরই প্রতিচ্ছবি তাঁহাদের লেখার মধ্যে পরিস্ফুট করিয়াছেন। রুশের সাহিত্যিকেরা সমাজের প্রত্যেক চিত্র লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছেন। রুশের গোগল থেকে টলষ্টয় পর্য্যন্ত সাহিত্যিকেরা নিজ নিজ যুগের প্রতিচ্ছবি দেখাইয়াছেন। রুশের বুর্জ্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার আগেই বিপ্লবের দ্বারা প্রলেটারিয়েট সমাজ সংগঠিত হয়। এই জন্য তথায় আমরা একটা যথার্থ বুর্জ্জোয়া সমাজের সন্ধান পাই না। আবার উনবিংশ শতাব্দী থেকে

আজ পর্য্যন্ত রুশ-বৈপ্লবিক সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে রুশীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্তরের সংবাদ আমরা পাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে December বিপ্লবের সাহিত্য ডষ্টয়েভস্কি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক রুশের প্রলেটারিয়ান সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে সমাজের এই স্তরের কার্য্যের সংবাদ আমরা পাই।

ভারতীয় সাহিত্যকে এই চাবিকাটীর দ্বারা উদ্ঘাটন করিলে আমরা তদ্রূপ ফলই প্রাপ্ত হই। ভারতীয় সাহিত্যে ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় না। এ বিষয়ে বিশদভাবে অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে Heroic যুগ থেকে সামন্ততন্ত্রীয় সমাজের নিদর্শন পাওয়া যায়। অবশ্য ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত একটা যথার্থ বুর্জ্জোয়া সমাজ এখনও অভিব্যক্ত হয় নাই। এই জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন নাই। তবে কথা আসে বাংলা সাহিত্যে কি পাই? বাংলার সমাজ যে ভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে সাহিত্যেও তাহার প্রতিচ্ছবি পড়িতেছে। বাংলা সাহিত্য কিছু আগে পর্য্যন্তও সংস্কৃত সাহিত্যের পোঁ ধরিয়া চলিয়াছিল; এই জন্যেই আমরা রবীবাবু পর্য্যন্ত সাহিত্যের মধ্যে রাজারাণী, জমিদার, বরকন্দাজ প্রভৃতির সংবাদ পাই। যদিচ খাস বাংলা সমাজে রাজারাণীর দরবার, সেপাই শান্ত্রী প্রভৃতির পাট অনেকদিন আগেই উঠিয়া গিয়াছে। বাংলার সমাজ আজ পর্য্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান আছে, এই জন্যেই পুরাতনের মোহ সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারে নি। কিন্তু উপস্থিত যুগের আলেখ্য হালের কোন কোন সাহিত্যিকের মধ্যে দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ একটা মধ্যবিত্তীয় সমাজ ভারতের সর্ব্বত্র গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই জন্যে তাহার আভাসও কোন কোন সাহিত্যিকের লেখার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। অন্যপক্ষে ভারতীয় সমাজশরীর মধ্যে একটী শ্রমিক শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য তাহারও কিঞ্চিৎ সংবাদ আমরা বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যে পাইতেছি।

সাহিত্যের এই যৎকিঞ্চিৎ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়া আমরা আমাদের প্রশ্নে আসি। আমাদের জ্ঞাতব্য এই যে, সাহিত্যে প্রগতি কাহাকে

বলে অর্থাৎ প্রগতিশীল সাহিত্য কথার মানে কি? আমরা উপরোক্ত সমাজ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা এই তথ্যে উপনীত হই যে, রাষ্ট্রে যে সামাজিক শ্রেণীর প্রভাব থাকে জাতীয় জীবনের সংস্কৃতির সর্ব্ব বিষয়ে যেমন সেই শ্রেণীর ছাপ অঙ্কিত হয়, সাহিত্যেও তেমন তাহা পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ যে শ্রেণী সমাজে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে সাহিত্যে সেই শ্রেণীরই দৃষ্টি ভঙ্গীর (World view) পরিচয় পাওয়া যায়। যে শ্রেণী রাষ্ট্রশক্তি পরিচালিত করে সেই শ্রেণী নিজের দৃষ্টি ভঙ্গী অনুযায়ী সমাজকে পরিচালিত করে। সেই জন্য তাহারই পরিচয় সেই শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে দিয়া পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। সামন্ততান্ত্রিক যুগের সাহিত্যের মধ্যে যেমন আমরা রাজারাণীর ব্যাপার, ব্যারণদের বীরত্বের খবর ও তাহাদের প্রেমের সংবাদ পাই, বুর্জ্জোয়া সমাজের সাহিত্যিকদের মধ্যে তদ্রূপ সেই শ্রেণীর মনস্তত্ব ও জীবনের কার্য্যের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। যেমন ফ্রান্সের চারণ রোঁলা তৎকালীন রাজনৈতিক আদর্শের বিষয় বলিয়াছেন প্রজার কর্ত্তব্য হইতেছে তার ভূস্বামীর জন্যে লড়াই করা। আর এই কথার প্রতিধ্বনি আমরা গীতা থেকে আরম্ভ করিয়া রাজপুতনার চারণদের মুখ থেকে "স্বামিধর্ম্ম" আদর্শের কথায় পাই। কিন্তু আবার ইউরোপীয় আধুনিক বুর্জ্জোয়া সমাজে democracy আদর্শের কথা শুনি এবং ভারতে যে বুর্জ্জোয়া সমাজ উদ্ভূত হইতেছে তাহার মুখে সেই democracy প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিতে পাইতেছি।

আজ ভারতীয় সমাজে, গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের আদর্শ বা হলদিঘাটের "ঝালা স্বামিধর্ম্ম ভোলে না" এই উক্তির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে আজ ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ বলিতেছে "ডেমোক্রেসি চাই, কনষ্টি-টুয়েন্ট এসেম্বলী চাই।" আবার পাশ্চাত্য দেশীয় proletariat শ্রেণী যেমন সাম্যের উপর সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে ভারতের প্রলেটারীয় শ্রেণী তেমনি গণতন্ত্র চাই, সাম্য চাই বলিয়া ধ্বনি তুলিয়াছে। ইহার অর্থ প্রত্যেক শ্রেণী নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে জগতকে দেখে এবং জগতকে তদনুযাদী গঠিত করিতে চায়। এই কারণ বশতঃ এই সমাজতাত্ত্বিক

বিশ্লেষণকারীগণ বলিল যেমন সমাজ ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতেছে তেমনি তাহার সাহিত্যও ধাপে ধাপে প্রগতিশীল হইতেছে। যেমন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে বুর্জোয়া সমাজ অধিকতর সভ্যতাসম্পন্ন তজ্জন্য অগ্রগমনশীল, তদ্রূপ সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্য থেকে বুর্জোয়া সাহিত্য অধিকতর প্রগতিশীল। আবার ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া সমাজ থেকে গণতান্ত্রিক সাম্যবাদীয় সমাজকে অধিকতর অগ্রগমনশীল বলা হয়, তদ্রূপ শেষোক্ত সমাজের সাহিত্যকে অধিকতর প্রগতিশীল বলা হয়। প্রগতি একটী আপেক্ষিক জিনিস। যেমন বর্ব্বর অপেক্ষা সামন্ততান্ত্রিক যুগ অধিকতর সভ্যতাসম্পন্ন তদ্রূপ তাহার সাহিত্যকেও অধিকতর প্রগতিশীল বলা যায়। আবার যে সাহিত্যের মধ্যে সভ্যতার পূর্ব্বাবস্থা থেকে অধিকতর অগ্রগমনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তুলনা দ্বারা তাহাকে আপেক্ষিক প্রগতিশীল মনোভাবের বলা হয়; এই জন্যই যে সাহিত্যে সভ্যতার ও প্রগতির নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাকেই আপেক্ষিক ভাবে "প্রগতিশীল" বলা যায়। এই কারণ বশতঃ যে সাহিত্যমধ্যে সমাজের অগ্রগমনশীলতার দ্যোতনা অর্থাৎ অধিকতর উন্নত অবস্থার দিকে গমনের আকাঙ্খা বা স্পৃহার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকেই প্রগতিশীল সাহিত্য বলিয়া ধার্য্য করা হয়। যে সাহিত্য সমাজের অচলায়তন ভাঙ্গিয়া উন্নত অবস্থার দিকে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয় সেই চেষ্টাকেই প্রগতি সাহিত্য বলা হয়।

এক্ষণে শেষকথা এই, সনাতনীরা যে বলেন রস ও রূপ নিয়াই সাহিত্য এই জন্যে তাহা একটি অখণ্ড বস্তু, কিন্তু উপরে আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি যে সমাজে যেমন যেমন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর আধিপত্যের ছাপ অঙ্কিত হইতে দেখা যায়, সংস্কৃতিতেও সেই ছাপ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্য রস ও রূপ বিভিন্ন যুগে আপেক্ষিকভাবে প্রকাশ পায়। ইহার অর্থ, প্রত্যেক যুগের সাহিত্যই রস ও রূপ নিয়া সংগঠিত হয় বটে, কিন্তু সেই রস ও রূপ বিভিন্ন শ্রেণীর ছাপ বহন করে। যাঁহারা Art for Art's sake বলেন তাঁহারা একটা অসঙ্গত ও অবৈজ্ঞানিক কথার উল্লেখ করেন। এমন কি প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিক সোরোকিন বিশদভাবে দেখাইয়াছেন যে ইহা একটী

অর্থশূন্য উক্তিমাত্র। রস ও রূপ অর্থাৎ Art প্রত্যেক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির সহিত বিজড়িত। যেমন মধ্যযুগীয় বা সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্যের মধ্যে যে রস ও রূপ পাওয়া যায় তাহা বুর্জোয়া সাহিত্যের রস ও রূপ হইতে পৃথক। যেমন ফ্রান্সের সামন্ততান্ত্রীয় ত্রুবাদুরদের সাহিত্যের রস ও রূপ থেকে আনাতোল ফ্রান্সের লিখিত সাহিত্যের রস ও রূপ সম্পূর্ণ পৃথক, যেমন বৈদিক যুগের সাহিত্যের, তৎপরে ক্লাসিকাল যুগের এবং বর্ত্তমানের ভারতীয়দের মধ্যে রূপ ও রসের ধারণাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পুনঃ, শ্রেণীসমূহেরও রূপ এবং রস বোধ বিভিন্ন প্রকারের।

প্রলেটারীয় সাহিত্যের স্বরূপ

এইবার আমরা 'গণ' বা 'প্রোলেটারীয়' সাহিত্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই কথাটির প্রথম উৎপত্তি হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষকালে জার্ম্মানীর স্তোসালিষ্টদের মধ্যে। ধনী শ্রেণীদের আদর্শ বিজড়িত কৃষ্টির বিকল্পে অর্থাৎ তাহা হইতে পৃথকভাবে জার্ম্মানীর প্রলেটারিয়েট শ্রেণী নিজের কৃষ্টি বা সংস্কৃতি উদ্ভব করিবার চেষ্টা করে। স্বীয় শ্রেণীর আদর্শানুযায়ী কৃষ্টি ও তাহার বাহন সাহিত্য, রঙ্গমঞ্চ, খেলাধূলা প্রভৃতির বিবর্ত্তনকে "প্রলেটারীয় কৃষ্টি" বলিয়া তাঁহারা নামকরণ করেন। এতদ্বারা গণ শ্রেণীসমূহের নিজের দৃষ্টিকোণ্ থেকে স্বীয় আদর্শানুযায়ী (কৃষ্টির) সৃষ্টিকরাকে "গণ সংস্কৃতি" (proletarian culture) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এই ভাবধারাই স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা এদেশে 'শূদ্রের জাগরণ' এবং গণসমূহ দ্বারা উদ্ভূত সভ্যতার কথা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যখন তিনি বলিয়াছেন "বেরুক নূতন সভ্যতা ভূজুরির উনান থেকে, চাষীর লাঙ্গল থেকে, জেলের চুবড়ী থেকে" ইত্যাদি, তখন তিনি অনাগত প্রোলেটারীয় কৃষ্টিরই কথা বলিয়াছেন।

আজ সোভিয়েট সংঘের রাষ্ট্রসমূহ ব্যতীত জগতের অন্যত্র এই কৃষ্টি অনাগত বটে, কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রসমূহে এই কৃষ্টি ও তাহার বাহন—সাহিত্য আজ বিশেষভাবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। আজ সেই সব রাষ্ট্রে কোন লেখক প্রাসাদস্থিত রাজকুমারীর বিরহ বেদনার কথা বিনাইয়া বিনাইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করে না, আজ তথায় রাজকুমারের মৃগয়াকালে এক সুন্দরীর সহিত আকস্মিক সাক্ষাৎ ও প্রেমালাপ ইত্যাদির রূপকথা আর কেহ লেখেন না; কিংবা ধনী যুবক ও যুবতীর মহানগরী পারীর বুলেভারে আমোদোৎসবের বর্ণনা করিয়া নিরন্ন ও

কুটিরবাসী গরীবের ছেলেদের মন ভুলাইয়া রাখে না। আজ, তথায় গরীব "গণ" নিজেকে চিনিতে পারিয়াছে। আজ তথায় শোষিত ও পদদলিত শূদ্র তাহার স্বাধীকার পাইয়াছে, তাহার "আত্মদর্শন" হইয়াছে। এই জন্য তাহার সভ্যতাও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমূহ তাহার দৃষ্টিকোণ, দ্বারা দৃষ্ট ভাবধারা দ্বারা বিবর্ত্তিত হইতেছে। এই কৃষ্টিকে এক কথায় সে আজ "প্রলেট-কুল্ট" নামে অভিহিত করিতেছে।

প্রলেটারীয় রাষ্ট্র না হইলে প্রলেটারীয় কৃষ্টির উদ্ভব হয় না ইহা ঠিক। ইহার কারণ, প্রলেটারীয় রাষ্ট্র, সামন্ততান্ত্রিক বা জমিদার-সাহী রাষ্ট্রও নয় অথবা বুর্জ্জোয়া-তন্ত্র বা ধনিক-সাহী রাষ্ট্র নয়। এই রাষ্ট্র সম্পুর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক বা স্যোসালিষ্ট রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে শ্রেণীভেদ নেই, বর্ণভেদ নেই; আছে কেবল মানুষ এবং তাহার সমুচিত মূল্য প্রদান। কাজেই অতীতের দিকে চাহিয়া "হা হতোস্মি" করার লোক এই সভ্যতার অন্তর্গত রাষ্ট্রে নাই, এইজন্য অতীতের সুখের গল্পের (রোমান্স) স্থান এই সাহিত্যে নাই।

প্রলেটারীয় সাহিত্যের ভিত্তি বাস্তব বস্তুতান্ত্রিক জগতের ঘটনাবলীর উপর স্থাপিত। এই কারণবশতঃ ইহা প্রধানতঃ বাস্তববাদী (Realist) সাহিত্য।

ইহার প্রথম কথা যে ইহা পুঁজীবাদী প্রকাশক ও সেই শ্রেণীর কবল বিমুক্ত। এই সাহিত্য অর্থোপার্জ্জনোদ্দেশ্যে বাবুদের খোস মেজাজ চরিতার্থ করিবার জন্য লিখিত হয় না। ইহা সমাজসেবা কর্ম্মেই আত্মনিয়োজন করে। ইহার কর্ত্তব্য হইতেছে সমাজের অবস্থা ব্যক্ত করা এবং অগ্রগমনশীলতার পথ নির্দ্দেশ করা। "বহুতম লোকের প্রচুরতম উপকার" করাই এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। ফ্রয়েডের মত যে, যৌন সম্পর্ক (Edipus complex) উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া মানব সভ্যতা ও তাহার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদি গড়িয়া উঠিয়াছে (Totem aad Taboo দ্রষ্টব্য)। এই মত প্রলেটারীয় সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। এই সব কারণ জন্য প্রলেটারীয় সাহিত্যিকের দায়ীত্বই অধিক!

পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত কৃষ্টি (cultural heritage) যেমন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়, তদ্রূপ বর্ত্তমানও তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়। অতীত কৃষ্টির অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান-

সমূহ কতটা বর্ত্তমানের 'ধোপে টিঁকিবে' ইহা আবিষ্কার করা যেমন তাহার দরকার, তেমনি বর্ত্তমানের পরিস্থিতি কতটা তাহার পক্ষে কার্য্যকরী ইহাও নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। অতীতের স্মৃতির মোহে অন্ধ হইয়া 'নিত্য', "সনাতন", "জাতীয়তা," প্রভৃতি ছেঁদো বুলি আবৃত্তি করিলেই একটা নেশন উন্নতিশীল হইতে পারে না। আজকাল, এই দেশের এই মনোবৃত্তির লোকদের মুখ থেকে "আমাদের কৃষ্টি" বলিয়া একটা গাল ভরা কথা প্রতিনিয়ত শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই কৃষ্টি কয় জনের ছিল? আজও অতি উচ্চ শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-বংশীয় ভারতীয় পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, "হিন্দুর কৃষ্টি" কেবল জন কতক পুরোহিত শ্রেণীয় লোক দ্বারাই উদ্ভূত হইয়াছে। তাহা হইলে সমাজের বেশীর ভাগ লোক কী সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কেবল ভারবাহী পশু হইয়াছিল? ব্রাহ্মণ্যবাদীয় শাস্ত্রসমূহের প্রত্যেক পত্রে ধর্ম্মাচার, ব্যবহার, সামাজিকপদ প্রভৃতিতে বর্ণগত পার্থক্যের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে; আজও তাহা অনুসৃত হয়। এইজন্য "আমাদের কৃষ্টি" বলিয়া কোন কথা থাকিতে পারে না। এই বিষয়েই ইঙ্গিত করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, "You talk of your philosophy, that is class philosophy" (তুমি তোমার দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে অহঙ্কার কর, তাহা একটা শ্রেণীগত দর্শন)!

পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণের যে কৃষ্টি, শূদ্রের কি সেই কৃষ্টি? প্রত্যেক বিষয়ে কি তাহাদের পার্থক্য নাই? অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীত হবে যে "আমাদের" বলিয়া গোঁড়ামী করা সঙ্কীর্ণতা ও অজ্ঞতারই পরিচায়ক। ভারতের ইতিহাসের প্রত্যেক পত্রেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, 'সভ্যতা' শাসকশ্রেণী দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া গঠিত হইয়াছে। পুনঃ, অর্থনীতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামাজিক বিবর্ত্তন এবং তজ্জন্য রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তন হয়। ভারতের ইতিহাসে এই সব বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান হয় নাই বলিয়াই তাহা 'এই দেশে হয় নাই' বলা অজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করা হয়। এই বিষয়ে কার্ল মার্ক্স যাহা বলিয়াছেন তাহা ধ্রুব সত্যঃ "জড়জগতে বেঁচে থাকিবার জন্য 'উৎপাদন পদ্ধতি', সামাজিক, রাজনীতিক এবং চিন্তাজগতের জীবনের

সমগ্র গতিই নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের জ্ঞান তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে না, বরং তাহার সামাজিক অস্তিত্ব তাহার জ্ঞান নিরূপণ করে। এই ক্রমোন্নতির একটা অবস্থায় সমাজের উৎপাদনের বস্তুতান্ত্রিক শক্তিসমূহ, উৎপাদনের তৎকালীন অবস্থিত সম্বন্ধ সমূহের অর্থাৎ আইনের ভাষায় সেই সময়কার বৈষয়িক সম্বন্ধের সহিত সংঘর্ষ হয়। এই অবস্থা থেকেই সামাজিক বিপ্লব আরম্ভ হয়। সমাজের অর্থনীতিক ভিত্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে উপরের সৌধ কমবেশী শীঘ্রই রূপান্তরিত হয়"। যখনই এই অর্থনীতিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, তখনই সমাজ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজকের ভারতের সামাজিকাবস্থা ইংরেজ শাসন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বের অবস্থায় অবস্থিত নাই। অনুসন্ধান করিলেই তাহা প্রতীত হইবে। পূর্ব্বেকার দাস প্রথার ভিত্তিতে স্থাপিত সমাজ আর নাই, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তযুক্ত জমিদারী প্রথাও অল্পদিনের। আজ ভারতে, সর্ব্ব ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক শ্রেণী উদ্ভূত করিতেছে। আজ ব্রাহ্মণ শ্রমিক হইতেছে এবং অসংশূদ্রও তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' রাষ্ট্রে অতিউচ্চ পদ পাইতেছে। আজ পুরাতন অভিজাত বংশীয় লোক শ্রমজীবী হইতেছে (ইহা চাক্ষুস উপলব্ধি করা ব্যাপার) এবং কৃষকের সন্তান "মাননীয় মন্ত্রী" হইতেছে। উৎপাদন প্রণালী এই দেশে যত দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে, সমাজবিপ্লবও তত শীঘ্র সংসাধিত হইতেছে। উট পক্ষীয় নীতি অবলম্বন করিয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা করিলে মনে শান্তি আসে বটে কিন্তু তাহা বাস্তবকে অস্বীকার করা হয়।

এই সব কারণেই মার্ক্স বলিয়াছেন, একজন বুদ্ধিজীবীর উপর বস্তুতান্ত্রিক জীবন পদ্ধতি তাহার প্রভাব বিস্তার করে। মানবের মনে এই পরিবর্ত্তন জন্য অহর্নিশি দ্বন্দ্ব বিরাজ করে, অতীতের পিছটান ও বর্ত্তমানাবস্থা তাহার মধ্যে সংগ্রাম করিয়া তাহাকে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন করে। এই মানসিক দ্বন্দ্ব আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের মনে আজ চলিতেছে, বর্ত্তমানের চিন্তাধারা এবং সাহিত্যে নানাপ্রকারের সুর ও ভাবই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতীয় সর্ব্ব ভাষার প্রগতিশীল সাহিত্যে এই দ্বন্দ্বের সুর প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

উপস্থিত সময়ের রাজনীতিক-অর্থনীতিক দ্বন্দ্বভাব (Dialectic) চিন্তাক্ষেত্রের এই বেসুরো ভাবের জন্য দায়ী।

এই গোলমেলে সুরের মধ্য থেকে এইটুকু বেশ বোধগম্য হয় যে, ভারতে বুর্জ্জোয়া সমাজ আজও স্বীয় শ্রেণীগত লীলা প্রকট করিতেছে না, অর্থাৎ এই দেশের বুর্জ্জোয়াশ্রেণী অতীতের সামন্ততন্ত্রীয় সভ্যতা ও সমাজের বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। অতীত, ভারতের বুকে জগদ্দল পাথরের ন্যায় চাপিয়া আছে। এইজন্য বুর্জ্জোয়া ক্রমবিকাশ দ্বারা নির্দ্ধারিত আবর্ত্তন আজ অনাগত আছে। অন্য পক্ষে দৃষ্ট হয় যে, শ্রমশিল্প দ্বারা একটা সর্ব্বহারা প্রলেটারিয়েট শ্রেণী সর্ব্বত্র উত্থিত হইতেছে। পাশ্চাত্যদেশ সমূহের ন্যায় নির্ধন বা ভূমিশূন্য কৃষক সন্তান দ্বারাই এই শ্রেণী গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। তাহারাও রাজনীতিতে আসিয়া নিজের দাবী পেশ করিতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, হয় রুশ না হয় চীন সর্ব্বপ্রথম প্রলেটারীয় রাষ্ট্র সংগঠন করিবে, কারণ তথায় একটি নিপীড়িত ও শোষিত বিশাল কৃষক শ্রেণী আছে। তাঁহার ভবিষ্যত বাণী রুশদেশে সফল হইয়াছে, চীনের কিয়দংশে হইয়াছে কিন্তু ভারতেও সেই সমস্যা আছে। পুনঃ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দাবী করেন যে, ইহা কৃষক ও শ্রমিকের রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। এইজন্য যাহা আজ অনাগত এবং চক্ষুর অগোচর, ভবিষ্যতে তাহার রূপ পরিগ্রহণ করা আশ্চর্য্যের কথা নয়।

ভারতে বুর্জ্জোয়া শ্রেণী তাহার শ্রেণীগত চেতনা প্রাপ্ত হইয়া রাষ্ট্রে ও সমাজে স্বীয় ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ধারা প্রকট করিতে পারিতেছে না বলিয়া এবং একটা বুর্জ্জোয়া শ্রেণীগত বৈপ্লবিক সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া, সর্ব্বহারা শ্রেণী নীরব হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের ঐতিহাসিক কর্ম্ম রাষ্ট্রে ও সমাজে তাহারা প্রকট করিয়া যাইবে। প্রলেটারীয় কৃষ্টির কথা জার্ম্মানীতে বিগত শতাব্দীতেই উত্থিত হইয়াছিল, এবং রুশে চেকফের সমসাময়িক কালেই গুর্কী ও ব্লকের উদয় হয়। প্রলেটারীয় শ্রেণী উত্থিত হইলে, এবং সংঘবদ্ধভাবে নিজের অস্তিত্ব প্রকট করিলে, তাহার মনস্তত্ত্বানুযায়ী

সাহিত্যও প্রকাশ হইবে। প্রলেটারিয়েটের অভাব ও অভিযোগ, তাহার অধিকার ও দাবী, তাহার মনঃস্তত্ত্বও যে দৃষ্টিকোন্ দ্বারা সে সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিরীক্ষণ করে তাহা অবশ্য প্রথম যুগে বিবর্ত্তিত হইবে। যখন রাজনীতির আসরে প্রলেটারিয়েট শ্রেণী আবির্ভূত হইবে তখন তাহার আশা ও অবস্থার প্রতিপাদ্য সাহিত্যও নিশ্চয়ই সৃষ্ট হইবে। ইহাই গণ-সাহিত্যের প্রথম যুগ।

এই সাহিত্য কে লিখিবে তাহার কোন নির্দ্দেশ ইতিহাস দেয় নাই। তবে ইহা ঠিক যে, যিনি প্রলেটারিয়েটের প্রাণের কথা, তাহার আকাঙ্ক্ষা ও আশার কথা সম্যকভাবে ব্যক্ত করিতে পারিবেন তিনিই এই সাহিত্যের একজন স্রষ্টা হইবেন। প্রলেটারিয়েট সাহিত্যের প্রথম যুগের লেখকদের স্বীয় শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণভাবে কক্ষচ্যুত হইতে হইবে, তাঁহাদের প্রলেটারিয়েট মনোভাবাপন্ন হওয়া চাই। এইখানেই হয় আশঙ্কা, ইতিহাসে তাহার নজীরও আছে। রুশে বিপ্লবের কবি ব্লক, অক্টোবরের প্রলেটারিয়েট বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া বোলশেভিষ্টরা অনুযোগ করিয়াছেন (Trotsky—Revolution and Literature দ্রষ্টব্য)। তিনি The 12 (১৯১৮) নামক কবিতায় রূপকভাবে বিপ্লবের গতি বর্ণনা করেন। তিনি বিপ্লবকে, নগরের অতি গরীব লোকদের বিশৃঙ্খলভাবে উত্থান বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "শ্বেত গোলাপের জ্যোতির্ম্মণ্ডল" দ্বারা পরিবেষ্টিত "রক্তাক্ত পতাকা" হস্তে খৃষ্টের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার দৃশ্য তাহাদের চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল। পুনঃ, এ, বেলী নামক একটী দার্শনিক কবিতা দ্বারা এই বিপ্লবকে সম্বর্দ্ধনা করেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, মানবের আত্মা যাহা পুরাতন সমাজ ধ্বংসে নিহত করিয়াছিল, তাহারই পুনরুত্থান এই বিপ্লব দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে (U.S.S.R. Handbook, p 445)। এতদ্দারা উদারনীতিক বুর্জ্জোয়া মনস্তত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে!

সনাতনী সাহিত্যিকের ইতিহাসে এক একটা সামাজিক শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট লীলা (Role) বুঝিতে পারে না, এবং পারিপার্শ্বিক অসামঞ্জস্যকে ঢাকিবার জন্য

নানাপ্রকারের ধর্ম্মের ব্যাখ্যা, অতীন্দ্রিয়বাদ, কর্ম্মফল, অদৃষ্ট প্রভৃতি দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। ইহার অর্থ, লেখকের শ্রেণী চেতনানুসারে জ্ঞাত ভাবে বা অজ্ঞাতভাবে তিনি পারিপার্শ্বিক অনুষ্ঠান সমূহের অর্থ না বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্মের আবরণে তাহা ঢাকা দিবার চেষ্টা করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে জার্ম্মানীর শতছিন্ন অবস্থার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া শ্রমজীবী (মুচি) শ্রেণীয় বোয়েম নামে এক ব্যক্তি অতীন্দ্রিয়বাদের উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন। তিনি বলিলেন, "লোক, আকাশ, তারা, প্রকৃতি, স্বর্গ, নরক, দেবদূত সকলের উপর ধ্যান নিয়োজিত করিবে।" এত দ্বারা তদানীন্তন শাসকশ্রেণী তাঁহার উপর বড় খুসী হয় এবং তিনিও একজন মহাপুরুষ (mystic) বলিয়া ইতিহাসে গণ্য হইলেন। এই প্রকারে ভারতেও বৈষ্ণব পদাবলী সমূহ সৃষ্ট হইয়া লোককে ঘুম পাড়াইতে লাগিল। এই প্রকারের কারণবশতঃ ১৯১৮ খৃঃ জার্ম্মান বিপ্লবের পর, একদল লোক ধর্ম্ম নিয়া হৈচৈ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবেই তাহাদের পতন হইয়াছে! তাঁহারা এই বিপ্লবের পশ্চাতের ঐতিহাসিক কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করিলেন না; আর ইহাঁদের মুরুব্বী রাজনীতিকেরা "Stab behind the back" (পশ্চাৎদিক হইতে ছুরিকাঘাত) মত প্রচার দ্বারা পরাজয়ের গ্লানি ও বিপ্লবের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে, একটা অনুষ্ঠানের (phenomenon) ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার প্রকৃত কারণ নিরূপন করিবার অনিচ্ছা বা অস্বীকৃতি, বা 'যেমন আছি তাহা বেশ আছি' বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা দ্বারা চিন্তাশক্তিরই দৈন্য প্রকাশ পায়। এই প্রকারেই প্রাচীন কালের জৈন, বৌদ্ধ ও মধ্যযুগের বৈষ্ণব ও সন্ত আন্দোলনগুলির ব্যাখ্যা আমাদের দেশের অতীতের পণ্ডিতেরা করেন নাই। ইহা তাঁহারা বরাবর বেদ-বিদ্বেষী স্বার্থপরদের কুচক্র (খৃষ্টীয় সাহিত্যের Anti-Christ রূপ অনুষ্ঠানের ন্যায় বর্ণাশ্রম বিরোধী অনুষ্ঠানগুলিকে ভারতীয় সনাতনীরা এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন); আর মধ্যযুগে তুলসীদাস বলিলেন, 'কেহ বর্ণাশ্রম মানে না। শূদ্র বলে আমি ব্রাহ্মণ থেকে কিসে ছোট।' এইজন্যই তিনি তাড়াতাড়ি

'রামচরিত মানস' রচনা করিয়া রাম রাজত্বের পরিকল্পনা করিলেন। আর, বিংশ শতাব্দীতে এই 'ফ্যাসীবাদ' একদলের আদর্শ হইয়াছে। এই সব ব্যাপারের উপরের আবরণ একটু আঁচড়াইলেই ধনী শ্রেণীর বনিয়াদী স্বার্থ বাহির হইয়া পড়ে!

ভারতের গণ-শ্রেণীকে চিরকালই অন্ধকারে রাখা হইয়াছে। সে বেদ পাঠ করিলে তাহার কানে তপ্ত তৈল বা সীসা ঢালিয়া দিবার, ব্রাহ্মণের আসনে বসিলে তাহার পশ্চাৎভাগের চামড়া ছাড়াইয়া লইবার, ব্রাহ্মণী হরণ করিলে তাহাকে মাদুরে জড়াইয়া পুড়াইবার ব্যবস্থা এই দেশের ধর্ম্ম ও অর্থ শাস্ত্রসমূহে আছে। কিন্তু উপরের স্তরের লোক নিম্ন স্তরের লোকদের প্রতি এইরূপ দোষ করিলে তাহার অতি লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই "বৈর-দেয়" হিন্দুর আইনে বরাবরই আছে। অথচ বলা হয়, শূদ্র নিম্নস্তরের জীব এবং জ্ঞানার্জ্জনের অনুপযুক্ত। বিগত জন্মের কর্ম্ম সে ইহজগতে ভোগ করিতেছে আর এই জন্মে দেবদ্বিজে ভক্তি করিলে পরজন্মে সুখভোগ করিবে। এই প্রকারে শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহকে চিরকালই বঞ্চিত ও দাবাইয়া রাখা হইয়াছে। অবশ্য ইহার ভীষণ প্রতিক্রিয়াও ইতিহাসে সংঘটিত হইয়াছে; ভারত পরাধীন হইয়াছে!

আজও যখন গণ-শ্রেণীসমূহ মস্তকোত্তলন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন নানা দার্শনিক তত্ত্ব, নানা প্রকারের রাজনীতিক চালবাজী, রামরাজত্ব, রাজনীতিক জাতীয়তাবাদীয় সাহিত্য প্রভৃতি সৃষ্ট হইতেছে। রুশে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব বৈপ্লবিক পল ষ্ট্রুভেও এই প্রকারে গণ-শ্রেণীকে পুঁজীবাদীদের সহিত মিলিতে উপদেশ প্রদান করেন। এই কারণবশতঃই আজ 'জাতীয়তাবাদী সাহিত্যে'র নাম শ্রবণ করা যাইতেছে, যেন শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহ জাতির এবং জাতীয়তাবাদের বাহিরে! তাহা হইলে "জাতীয়তাবাদ" অর্থে কি কেবল জমিদার, পুঁজীবাদী, কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ী দোকানদারদের স্বার্থ? অবশ্য ভাড়াটিয়া রূপে ক্ষুদ্র বুর্জোয়া এই সঙ্গে আছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর মনস্তত্ত্বানুযায়ী লোকেরা সর্ব্বদলেই ছোটাছোটি করে, সর্ব্বস্থানেই তাহাদের প্রাপ্ত হওয়া যায়। আসল কথা এই, ভারতের গণশ্রেণীর শক্তির

প্রকাশ যেখানে যে সময়ই হইয়াছে তাহার রূপ দেখিয়া আমাদের পুঁজীবাদী জাতীয়তাবাদ ভয় পাইয়াছে, তাই এই শক্তিকে চাপ দিবার নানা প্রকারে তুকতাক, ঝাড়ন ফোড়নের চেষ্টা চলিতেছে, ভূতকে হাঁড়ি চাপা দিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু ইঁহারা ইতিহাসের গতির সহিত পরিচিত নহে, ভারতের ইতিহাসে যুগানুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীর লীলার অনিবার্য্যতার মর্ম্ম ইঁহারা হৃদয়ঙ্গম করেন না। তৎপরিবর্ত্তে নানা অবাস্তব ব্যাপার দ্বারা সাহিত্য ভরপুর করিয়া রাখেন। এই কারণবশতঃ ফ্রয়েডের প্রতি ইঁহাদের এত প্রীতি। এই সব সাহিত্যকে আমরা Decadent periodএর (হ্রাস বা ক্ষয়ের যুগ) সাহিত্য বলিয়া নামকরণ করি।

চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এই সত্য স্বীকার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে যে, গণ-শ্রেণীদের পরিশ্রমই কৃষ্টির মূল উপাদান সমূহ সৃষ্ট করে এবং তদ্বারা নানা ভাব তরঙ্গের উদয় হয়! এই সত্য সোভিয়েট রুশে সম্যকরূপে বোধগম্য হইয়াছে বলিয়াই আজ অর্দ্ধশিক্ষিত শ্রমিক ও অশিক্ষিত এবং সভ্যতার পশ্চাদভাগে অবস্থিত কৃষক স্বীয় সমাজের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে, এবং একটা বিশাল অজেয় রাষ্ট্র গঠন করিতেছে। এই রাষ্ট্রের লোকদের মধ্যে আর শ্রেণী ও বর্ণ বিভেদ নাই। সকলেই শ্রমজীবী বা শ্রমিক অর্থাৎ সকলকে শ্রম করিরা খাইতে হয়।

এ হেন প্রলেটারীয় রাষ্ট্রে যে সাহিত্য সৃষ্ট হইতেছে তাহাতে নূতন সুরই উত্থিত হইতেছে। ইহার ভিত্তি হইতেছে বাস্তবিকতা (Realism)। ইহাতে নিরাশা, অতীন্দ্রিয়বাদ, হাহুতাস নাই, আছে শ্রমের কথা, আছে সংগঠনেব কথা, আছে আশার কথা, আছে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির আস্বাদনের কথা, আছে আনন্দের কথা। সৎ-চিৎ-আনন্দ এই সমাজই ভোগ করিতে পায়। এই প্রলেটারিয়েট সাহিত্যের নায়ক হইবেন একজন "শ্রমিক" যিনি শ্রম শিল্পের সমস্ত তথ্য করায়ত্ত্ব করিয়া নিজের সঙ্ঘবদ্ধাবস্থায় আছেন এবং অপরকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া শ্রমকে শিল্পের স্তরে উন্নীত করেন। শ্রমকে এই সাহিত্য 'সৃষ্টি' বলিয়া বুঝিবেন (Gorky—Problems of Soviet Literature)।

যখন শ্রমজীবী বুঝিতে পারিবেন যে তিনি নিজের জন্যই পরিশ্রম করিতেছেন, অপরকে স্বীয় শ্রম বিক্রয় করিতেছেন না, তাঁহার শ্রমের বিনিময়ে সমাজ তাঁহার অব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহ প্রদান করিতেছে; যখন শ্রমজীবী বুঝিতে পারিবেন যে তিনি সমাজের একটি শোষণ বিহীন অঙ্গ; যখন তিনি তাঁহার সম্যকভাবে আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন, তখন তাহার রচিত সাহিত্য ও অন্য রূপ ও রস প্রকাশ করিবে। তখন চণ্ডীদাসের বাণী ঃ

"শুনহে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই,"

সফল হইয়া সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যপ্রকার হইবে। এইটি হইবে প্রলেটারীয় সাহিত্যের দ্বিতীয়াবস্থা। তখন প্রলেটারিয়েট সাহিত্য আশার বাণী উচ্চারণ করিতেছে, জগতকে নূতনভাবে গড়িবার আকাঙ্খা করিতেছে, সমাজে সকল লোকের সাধ্যমত পূর্ণ বিকাশের সুযোগ প্রাপ্তির গান গাহিতেছে। তখন সমাজে Decadent (ক্ষয়শীল) যুগ অন্তর্হিত হইয়াছে, সাহিত্যে অতীন্দ্রিয় ধোঁয়াটে কথাতেই লোককে ভুলাইবার জন্য তখন "বিরিঞ্চি বাবা"র ভৌতিক ক্রিয়া অতীতের গল্প হইয়া গিয়াছে, আছে জগতের Stern Reality (কঠোর বাস্তব ঘটনা)। তখন এই শ্রেণীশূন্য সমাজের সাহিত্য, প্রকৃতিকে স্বীয় কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য উপায় নির্দ্দেশ করিতেছে। তখন এই প্রলেটারিয়েট সাহিত্য নূতন সাম্যবাদী সমাজ ও তাহার সংস্কৃতির সৃষ্টির কথা বলিবে। প্রলেটারিয়েট সাহিত্য সুস্থ ও সবল জাতির চিহ্ন বহন করিবে। এইজন্যই লেনিন কম্যুনিস্ট তরুণদের ফ্রয়েডের বই পড়িয়া ভাব সংগ্রহ করিবার বিশেষ বিপক্ষে ছিলেন। (Klara Zetkin-এর Reminiscences of Lenin দ্রষ্টব্য)।

এই প্রলেটারীয় সাহিত্যের প্রথমাবস্থার বাস্তবরূপ কি, তাহা প্রদর্শনজন্য এসিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্রসমূহে নবোত্থিত সাহিত্য হইতে কিঞ্চিৎ উদাহরণ এই স্থলে প্রদত্ত হইল (এই কবিতাগুলি Joshua Kunitz দ্বারা লিখিত "Dawn

over Samarkand" নামক পুস্তকে ইংরেজীতে ভাষান্তরিত করা হইয়াছে) :—"আমরা তাজিকেরা যাহা দেখি সেই বিষয়ে গান করি···যাহারা প্রায় তিন যুগ আগে গত হইয়াছে, ফুল ও সুন্দর নারীর কথা বলিত। কিন্তু তাহারা আর নারী ও ফুলের বিষয় গান করে না। তাহারা আমাদের নূতন মুক্তির কথার গান করে, তাহারা উড়ো জাহাজের বিষয় গান করে, তাহারা ভবিষ্যতের সুন্দর দিনের বিষয়ে গান করে।"

তাজিক কবি সুখাএলি বলিতেছেন: "একটি বরের ন্যায় উজ্জ্বল সজ্জাকৃত একটি নূতন সহর দেখিবে, তুমি বরের সুখী গান শুনিবে, শুন! একটা যন্ত্র (Propeller) গুণ গুণ করিতেছে, রাস্তায় তাড়াতাড়ি একটা অটোমোবিল যাইতেছে, ধোঁয়া ও ধুলায় মেঘাচ্ছন্ন করিয়া একটা লৌহ রেলগাড়ী যাইতেছে।"

পুনঃ, ইনি গাহিতেছেন: "সূর্য্য অস্ত যাবার আগে, একটি কৃষকের কুঁড়েঘরে প্রবেশ কর, সে যে গান গাহিতেছে তাহা শুন, তাহার তাম্বুরিণের নৃত্যের ছায়া লক্ষ্য কর। দেখ, আকাশে মুক্তির সূর্য্য উদয় হইয়াছে। ঝরণার জলমুক্ত হয়ে আমাদের উপত্যকাসমূহ দিয়া গর্জ্জন করে প্রবাহিত হইতেছে। এবং আমাদের সোভিয়েট লোকেরা সর্ব্বত্র গান করিতেছে।"

মানসার নসো নামক একজন কবি বলিতেছেন:—"পূর্ব্বে তিনি ডাণ্ডাদ্বারা প্রহৃত হতেন···অন্ধকার গর্ত্তে তাহাকে ফেলে রাখা হত...চব্বিশ দিন বিনা আহারে তাহাকে রাখা হয়েছিল...কিন্তু অতীতকে স্মরণ করে লাভ কি?···

আমার হৃদয় নূতন যুগের কথা গাহে! তাজিকভূমি। অবশেষে তোমার দিন এসেছে! নিষ্ঠুর যুগ অবসান হয়েছে, তোমার সময় অবশেষে এসেছে! মেসিন যাহা আমাদের মাঠে জমি চষে, তোমার সময় অবশেষে এসেছে! ও সোভিয়েট তোমার দিন এসেছে অবশেষে!"

আবার, তাজিক কবি লাখুটি তাঁহার কবিতাতে কল্পনা প্রসূত পুরাতন অলঙ্কার না ব্যবহার করিয়া আজকালকার সোভিয়েট সভ্যতাগত ভাষার শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার কবিতাতে তিনি 'কারখানার সাইরেন বংশী',

'কারখানার ধূম,' 'স্টালিনগ্রাড ট্রাক্টর', 'এখনও গরম ইস্পাত', 'ভারী হাতুড়ী', 'প্রত্যেক কলহজে (সমবায়ে কৃষিক্ষেত্র) শস্যের শীর্ষ', ইত্যাদি তাঁহার কবিতায় অলঙ্কার রূপে প্রয়োগ করিতেছেন। "প্রাভদা" পত্রিকায় রিপোর্ট করিয়া একটী কবিতার শেষে তিনি বলিতেছেন—"Our unions call for brigades. Shock work in our shops and our schools" (আমাদের সংঘগুলি পলটন চায়। আমাদের দোকানে এবং স্কুলে ধাক্কা দেওয়ার কার্য্যের জন্য)।
পুনঃ, কলহজের একটি তাজিক কৃষক গাহিতেছেন—"যখন আমি দেখি আমাদের শুষ্ক মাঠে ফুল ফুটে, যখন তুলার জমিতে জল বহে যায়, যখন একটা বাঁধা বান্দ দেখি, তখন আমার নিশ্বাস মুক্ত ও গরম হয়।...যখন আমি দেখি আমার পুত্র মাঠে মেসিন চালাইতেছে, যখন আমি দেখি শস্য জমিতে শিকড় গাড়িতেছে, তখন আমি উচ্চৈস্বরে বলি, যাহারা পরিশ্রম করে তাহারা জয়যুক্ত হউক!"
অবশ্য ভারতের গণশ্রেণীর পারিপার্শ্বিকাবস্থা এখনও এই প্রকার গড়িয়া উঠে নাই, সেই জন্য তাহার গানের উচ্ছ্বাস আমরা আশা করিতে পারি না। কিন্তু তাহার নিজের মর্ম্ম বেদনার উচ্ছ্বাসের পরিচয় আমরা কোথায় পাইতেছি? জন ও গণের সম্বন্ধে যাহা আজ সাহিত্যাকারে প্রকাশিত হইতেছে তাহা উপরের স্তরের শিক্ষিত লোকদের দ্বারা লিখিত হইতেছে। এতদ্বারা আমরা সমাজে Liberal bourgeois (উদারহৃদয় বুর্জ্জোয়া) শ্রেণীয় লোকদের মনোভাবই পরিলক্ষিত করি। ইহা গণের নিজস্ব সাহিত্য নয়; বরং বর্ত্তমান ভারতীয় সাহিত্যের ধারা দেখিয়া ইহাই প্রতীত হয় যে ভারতে Decadant Feudal (ভগ্নমান সামন্ততান্ত্রিক) যুগের পরই গণ শ্রেণীয় যুগ আসিবার চেষ্টা হইতেছে।
এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে প্রলেটারিয়েট সাহিত্যে কেবল বাস্তব ঘটনার চিত্র থাকিবে না। Art for Art's sake বলিয়া একটা কথার মূল্য নাই, "আর্ট কিছুর জন্য" (Art for something's sake) ইহাই হইতেছে বৈজ্ঞানিক সত্য। এইজন্য প্রলেটারিয়েট সাহিত্য যখন নূতন জীবনের কথা

বলিবে, তখন নূতন শিল্পের রস ও রূপ থাকিবে, রোমান্স ইত্যাদিও থাকিবে, কিন্তু সকল দ্রব্যেরই নূতন মূল্য প্রদত্ত হইবে।

এই দেশের Decadent সাহিত্যকে পরিহার করা আশু প্রয়োজন। গোলামী ও পরাজিত মনোবৃত্তি প্রসূত এই সাহিত্য মনস্তত্ত্বকে অস্বীকার করিয়াই চলিতেছে। মানব মনস্তত্ত্ব, সামাজিক মনস্তত্ত্ব, যৌন-মনস্তত্ত্ব কিছুরই বালাই নাই এই সাহিত্যে। ইহাতে স্ত্রীলোককে তাহার সম্মান প্রদান করা হয় না। "মহাসুখবাদ"ই এই ভোগেচ্ছু সাহিত্যের লক্ষ্য। শিক্ষিতা মহিলা কিরণময়ী থেকে দুঃর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দুঃস্থা নারী পর্য্যন্ত সকলেই যেন ইন্দ্রিয়ের দাস। স্ত্রীলোক যেন কেবলমাত্র পুরুষের ভোগার্থ সৃষ্ট! তাহার স্বভাব ও শিক্ষাজাত Inhibition (সঙ্কোচন শক্তি বা সরম) এবং মনস্তত্ত্ব এই সাহিত্যে অস্বীকৃত হয়। এই সাহিত্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের দৌর্ব্বল্যই কেবল অঙ্কিত হয়। নায়ক-নায়িকার প্রেমই এই সাহিত্যের প্রতিপাদ্য। ইহাতে সামাজিক মনস্তত্ত্বের কোন সংবাদ নাই। এই স্থলেই এই ক্ষয়শীল যুগের সাহিত্যের সহিত সোভিয়েট সাহিত্যের প্রভেদ! তথায় প্রত্যেক সাহিত্যিক স্বীয় সময়ের সামাজিক চিত্র স্বীয় নভেল মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন। তথাকার সাহিত্যে কালোপযোগী সামাজিক তথ্যেরই পরিবেশ হয়। আর এই দেশে যথায় "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু", "ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালী" প্রভৃতির আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে, যথায় লোকে বহু দিন ধরিয়া পরাধীনতায় আত্মবিস্মৃত হইয়া আছে, তথায় অযৌক্তিক ও মনস্তত্ত্ব বিরুদ্ধ যৌন সম্পর্কীয় গল্প তরুণ ও বিকারগ্রস্থ মনে প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু তাহা সুস্থ ও সবল সাহিত্য নয়। এই Decadent সাহিত্য দ্বারা নিরাশা ও পরাজিত মনোবৃত্তিই প্রকাশ পায়। যে সাহিত্যে জাতির মন ক্ষুণ্ণতা এবং হতাশাকে ঢাকিবার জন্য যৌন সম্বন্ধের অস্বাভাবিক গল্প, বুর্জোয়া রোমান্সের চাঞ্চল্যকর প্রেম কাহিনী ও জাতীয়তাবাদের ছদ্মবেশে শ্রেণী স্বার্থের কথা ভরপুর হইয়া আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দেশের শোষিত ও পদদলিত লোকদের আশার কথা, নূতন সমাজ সংগঠনের কথা, ভবিষ্যতের সোনার ভারত এবং সোনার বাঙ্গলা গঠনের উপায়ের পথ নির্দ্দেশক সাহিত্যের

সৃষ্টির প্রয়োজন। এই দেশের গণসমূহ যুগ যুগান্ত ধরিয়া অন্ধতার তিমিরে পড়িয়া আছে এবং পদদলিত হইয়াছে বলিয়া তাহার শ্রেণী চৈতন্য এখনও জাগ্রত হইতেছে না। তাহাকে জাগ্রত রাখিবার জন্যই তাহার মনস্তত্ত্বানুযায়ী সাহিত্য চাই। এই দেশের গণ সাহিত্যের প্রথম স্তরের ইহাই কার্য্য। উপরের স্তরের উদারনীতিক লেখকদের দ্বারা লিখিত "গণ" সম্বন্ধীয় পুস্তকের গরীবের উপর দয়ার ভাবে পিঠ চাপড়ানী আজকাল ফ্যাসান হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা "গণ সাহিত্য" নহে। এবম্প্রকারের সাহিত্যে, পুঁজীবাদী মালিকের দুঃখী শ্রমিকের প্রতি এবং কৃষকের প্রতি জমিদার পুত্রের 'দরদ' দেখাইয়া গণের আত্ম-চেতনা বিনষ্ট করিবারই চেষ্টা আছে। এই প্রকারের সাহিত্যে গণকে তাহার যথার্থ মূল্য দেওয়া হয় না। যে সাহিত্য গণকে তাহার যথার্থ মূল্য প্রদান করিবে, সেই অনাগত সাহিত্যের অপেক্ষায় আমরা বসিয়া আছি। কিন্তু, ইতিহাসের দ্বন্দ্বজনিত গতি সেই অনাগতকে একদিন লোকচক্ষে সমূর্ত্ত করিবে। সেই জন্যই বৈদিক ঋষির কথা প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলি—আগে চল। আগে চল।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
উননব্বই	৭	মঘাইয়া	মগহিয়া
,,	,,	খড়ি	খড়ী
,,	৮	বঙ্গেডু	বাঙ্গডু
,,	,,	বাগেলখণ্ডী	বাঘেলখণ্ডী
,,	ফুটনোট	হিন্দুবী	হিন্দ্‌বী
নব্বই	৫	ঠেঁট	ঠেঠ্‌
চুরানব্বই	১৮	সহুলিয়া	সহেলিয়া
ছিয়ানব্বই	ফুটনোট ৪	বর্ম্মী	বর্ম্মা
সাতানব্বই	৮	রাঠোরোঁকী খ্যাত	রাঠোরোঁকী খ্যাতি,
একশত তিন	১৩	সাত	চার
একশত আট	৩	মিশ্‌কীন	মিসকীন
,,	,,	দুয়ারে	দুরায়ে
,,	৪	কোজোন	কো জো মৈঁ ন
,,	,,	অধেঁরে	অধেঁরী
,,	৬	পেয়ারী	পিয়ারী
,,	৭	কী	কো
,,	,,	কুত্তাকিও	কুত্তাকী ও
একশত পনেরো	১৩	কীনহা	কীন্‌হা
,, সতেরো	১৩	বেদ পথলগ	বেদ পথলাগ
,, আঠারো	১০	রহিম	রহীম
,, ,,	১১	সব কৈ পহিচানি	সব পহিচানি
,, ,,	২৬	মূল পতার	মূর পতাল
,, উনিশ	৩ ,,	নাগরী	নাগরি
,, ,,	১৩	সেহল্যা	সহেলঁ্যা
,, ,,	ফুটনোট ১	মীরাবাইকা	মীরাবাইকী

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
„ কুড়ী	১৩	তুনোকো…বুরৈ পরী	তুনো কৈ…ফুরৈ পরী
„ „	২৩	সোব	সোবৈ।
„ একুশ	১৩-১৯	"কাশীকা…প্রকাশ।"	"কাশী কী কলা জাতী, মথুরা মসীদ হোতী শিবাজী ন হোতে, তো স্থন্নত হোতে সব কী।"
„ „	১৯	বিজৈপুর	বিজাপুর
„ „	২২	ছাতি	ছাতী
একশত বাইশ	১২	ফিরঙ্গীন	ফিরঙ্গিন
„ তেইশ	১৫	১৮৯৪	১৭৯৪
„ „	২৩	"বনারস আথবর"	বনারস অথবার"
„ সাতাশ	৬	বাবু-গুলার রায়	বাবু গুলাব রায়
„ „	১৩	অজ্ঞাতশক্র	অজাতশত্রু
„ আঠাশ ফুটনোট ২		হিন্দী বা ভাষা	হিন্দী ভাষা
„ উনচল্লিশ	১২	ময়ন ‥তোকৈসি…।	মৈঁ…তো কৈসৈ…
„ „	১৩	করেবম	ফরেরম।
„ তেতাল্লিশ	২৪	ওয়ালী…খুদন্নাইকা।	ওয়লী…জব সে… তরীকা…।
„ চুয়াল্লিশ	১০	বিস	বীস।
„ „	১১	নাজী…সরাবে	নজীর…সরাবেঁ।
„ „	১২	নহীতো	নহীঁ তো।
„ ছচল্লিশ	২২	চমসমে	চমনমে।
„ আটচল্লিশ	১২	মাশকে	মাশুকে।
„ „	১৬	পয়ম্বর	পয়গম্বর।

পৃষ্ঠা		পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
„	„	২২	বুদপরস্তীকা তোই	বুতপরস্তীকা কোই
„	ঊনপঞ্চাশ	২	গমথার	গমখার।
„	„	১৬	আস্থক	আসিক
„	পঞ্চাশ	৩	দো	দী।
„	একান্ন	১১	গিরাহ	গিরহ।
„	বাহান্ন	১১	নিকাল	নিকল।
„	„	১১	তনসৈ	তনসে
„	„	১২	হাওয়া বাতলাএগী	হাওয়া বতলাএগী
„	তিপান্ন	১৫	নাজীর	নজীর।
„	„	১৮	কালন্দার	কলন্দর।
„	চুয়ান্ন	২৩	গালী	গালীব।
„	পঞ্চান্ন	৮	তূঝকে	তুঝকো
„	„	৯	তেরে	তেরী।
„	„	১৬	দাঘ	দাগ
„	„	২৫	দাঘ	দাগ
„	ছাপান্ন	১	দাঘ	দাগ
„	„	১	নেহী	নহী
„	„	২	নেহী	নহী
„	„	৬	আল্গা	আল্লা
„	„	৮	দাঘ	দাগ
„	„	১০	দাঘ	দাগ
„	আঠান্ন	৬	উম	উস
„	„	১২	খৈব	খৈর
„	„	২০	কাবালিয়ত	কাবলিয়ত
„	ঊনষাট	১২	সলতানতকি	সলতনতকি

পৃষ্ঠা		পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
একশত	অঠান্ন	২৬	নেহিজো	নহিজো
”	”	২৬	আপনে	অপনে
”	একষট্টি	১৩	দহনে	দহানে
”	”	২১	আয়	অয়
”	”	২২	আয়	অয়
”	চৌষট্টি	৪	ভিরী	ফিরী
”	”	৫	আগর	অগর
”	”	৬	ওয়াতন	ওয়তন
”	পঁয়ষট্টি	৫	ওয়াতন	ওয়তন
”	”	”	”	”
”	”	৬	”	”
”	”	৮	মাদার	মাদর
”	”	১৫	জুটসী	জুৎসী
”	”	১৬	আদাব	অদব
”	”	২২	আবুল কালাম	অবুল কলাম
”	”	”	আল হিলাল	অল হিলাল
”	”	২৪	”	”
”	”	২৫	পাঙ্ক	পঙ্ক
”	”	২৬	সজ্জদ	সজ্জাদ
”	সাতষট্টি	৪	হমওয়াতন	হমওয়তন
”	”	১৫	মসরূপ	মসরূক
”	উনসত্তর	৫	সারে…হামারা	সারে জহাঁসে অচ্ছা… হমারা
”	”	৮	জবরা কারবাঁ	জব কারবাঁ
”	”	৯	নাহি	নহি

পৃষ্ঠা		পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
একশত	উনসত্তর	১০	ওয়াতন	ওয়তন
„	„	১১	জগাঁ	জহাঁ
„	„	১২	আবতক	অবতক
„	„	১৭	আপনা…মে	অপনা…মেঁ
„	„	১৮	কেয়া	কয়া
„	„	১৩	ওয়াতনমে	ওয়তনমেঁ—
„	সত্তর	২	পরোনা…বখেরে	পিরানো…বিখোর
„	„	৪	আগর	অগর
„	„	৬	আগেঁসে	আগোঁসে
„	„	২০	রাখ না	রখনা
„	একাত্তর	২	পাথর	পাথর
„	„	৩	ওয়াতনকা	ওয়তনকা
„	„	৫	দিলকা	দিলকী
„	„	৬	(শুনেছি অনেক… বহিয়াছে)	(অনেক…মনের বস্তী শূন্য…রহিয়াছে)
„	„	৮	আঃ	আর
„	„	১৩	কিসমতমে	কিসমতমেঁ
„	„	১৪	আউর	ঔর
„	তিয়াত্তর	১৩	দিয়ারে…হ্যায়	দিয়ারে…কে…রহনে ওয়ালোঁ…দুকাঁ নহি হ্যায়
„	„	১৫	আপনে	অপনে
„	„	১৫	খোদকুসি	খোদখুসি
„	পঁচাত্তর	৮	চাকবস্ত	চকবস্ত
„	সাতাত্তর	১০	আল্লাহ	অল্লাহ
		৪	লহরে	লহরেঁ

একশত সাতাত্তর	৬	বংশীমে	বংশীমেঁ
” ”	২২	বাচ্চা	বচ্চা
” আঠাত্তর	১৭	নারগীস	নরগীস
” উনআশী	৫	গুলসানের	গুলসনের